ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

সমকালীন দর্শন ও অধিবিদ্যা

গবেষক ঃ আবদুল কুদ্দুস

রেজিঃ নং-৩০২

সেশন- ২০০৯-২০১০

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক ঃ ড. আনিসুজ্জামান

অধ্যাপক

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **জনাব আবদুল কুদ্দুস**, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে **"সমকালীন দর্শন ও অধিবিদ্যা"** শীর্ষক এম. ফিল. গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করেছেন। ইতঃপূর্বে এই গবেষণা কর্মটি যথা নিয়মে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে উপস্থাপন করা হয়েছিল; কিন্তু থিসিসের পরীক্ষা কমিটি এর বিভিন্ন ত্রুটি নির্দেশ করে সেগুলো সংশোধনপূর্বক পুনরায় তা দাখিল করতে বলেন। সংশোধিত পাণ্ডুলিপিটি আমি দেখেছি। এখন আমি এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে পুনরায় থিসিসটি উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

469995

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Professor
Department of Philosophy
University of Dhaka

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "সমকালীন দর্শন ও অধিবিদ্যা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং সহযোগিতায় তৈরি আমার নিজস্ব গবেষণার ফসল। এই গবেষাণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন উদ্ধৃতি তথ্য নির্দেশে উল্লেখ করেছি। আমি এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোনো অংশ-বিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতিরেকে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির জন্য কিংবা কোনো সাময়িকী বা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পেশ করি নি।

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান Professor
দর্শন বিভাগ Department of Philosophy
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। University of Dhaka

গবেষক

আবদুল কুদ্দুস
রেজিঃ নং-৩০২
সেশন- ২০০৯-২০১০
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গবেষণা কর্মের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. **আনিসুজ্জামান** এর কাছে সর্বান্তকরণে ঋণ স্বীকার করছি। তিনি সানন্দে এ কাজটি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর সুদক্ষ, আন্তরিক ও যত্নশীল তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁর কাছে আমার অপরিশোধ্য ঋণের কথা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি।

গবেষণাকালীন সময় আমার অনেক শিক্ষক, বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী আমাকে প্রেরণা দিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

তারিখঃ ০৬.১২.২০১৫ ইং

আব্দুল কুদ্দুস
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নম্বর
১ম অধ্যায়	ঃ অধিবিদ্যার পরিচয়	০১-২৮
২য় অধ্যায়	ঃ এরিস্টটল, একুইনাস, ব্রাডলি ও এইচ ডি লিউইস এর অবদান বিবেচনা	২৯-৭৮
	ক. এরিস্টটল	২৯-৪০
	খ. একুইনাস	৪১-৫৪
	গ. ব্রাডলি	৫৫-৬৬
	ঘ. এইচ ডি লিউইস	৬৭-৭৫
৩য় অধ্যায়	ঃ অধিবিদ্যা সম্পর্কে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের অবস্থান বিচার	৭৯-৯৪
৪র্থ অধ্যায়	ঃ বর্তমান সময়ে অধিবিদ্যার প্রাসঙ্গিকতা	৯৫-১১৬
৫ম অধ্যায়	ঃ উপসংহার	১১৭-১২৯
গ্রন্থপঞ্জি	ঃ	১৩০-১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে দর্শনের নাম অতি পরিচিত। বিশ্বজগৎ ও বিশ্বমানবের সবচেয়ে জটিল প্রশ্নগুলোর আলোচনা-পর্যালোচনার বৃহত্তর স্থান হলো দর্শন। প্রশ্ন থেকে শুরু হয় জানা। কিন্তু সত্যিকার জানা ও ভ্রান্ত জানার মধ্যে স্বভাবতই পার্থক্য বিদ্যমান। দর্শন চায় সত্যিকার জ্ঞানার্জনের পথ দেখাতে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে মানব জাতিকে দর্শন সভ্যতার গোড়া থেকেই সেই পথ দেখিয়ে আসছে। এন্থনি কুইন্টন সহজ কথায় দর্শনের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে, দর্শন আমাদেরকে পরমসত্তার জ্ঞান,মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এবং বাস্তব জীবনপদ্ধতির দিকনির্দেশ করে। অর্থাৎ তিনি দর্শনের তিনটি মৌলিক শাখা তথা অধিবিদ্যা জ্ঞানবিদ্যা ও মূল্যবিদ্যার প্রতি এখানে ইঙ্গিত করেন। বিজ্ঞানের মত পরীক্ষণ-নির্ভর নিশ্চিত জ্ঞান কিংবা ধর্মের মত বিশ্বাস-নির্ভর নিশ্চিত জ্ঞান দর্শনে নেই। বার্ট্রান্ড রাসেল এজন্য দর্শনকে বলেছেন বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যবর্তী প্রদেশ। আর এর উৎপত্তির পেছনে দাবি করেছেন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধর্মীয় ও নৈতিক ধারণা এবং একধরনের অনুসন্ধানকে। আর এই অনুসন্ধান হচ্ছে জগৎ ও জীবনের তাত্ত্বিক সমস্যাসমূহের সবিচার পর্যালোচনা।

অধিবিদ্যা দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম প্রধান একটি শাখা। অধিবিদ্যা এমন একটি বিষয় যার পক্ষে ও বিপক্ষে একই সময়ে কিছু লোক অত্যন্ত আগ্রহী এবং কিছু লোক অত্যন্ত বিতৃষ্ণ। এই গ্রহণ বা বর্জনের বিদ্যাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা কঠিন কাজ। অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়েছিল প্লেটো-এরিস্টটলের যুগ থেকেই। এই লড়াইয়ে টিকে ছিল অধিবিদ্যা, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। বর্তমান বিজ্ঞান প্রভাবিত দর্শনে অধিবিদ্যাকে বর্জনের সীমাহীন যে প্রচেষ্টা চলমান তার বিপরীত স্রোতে থেকে অধিবিদ্যাও তার পক্ষের অনুসারী তৈরি করে চলছে অবিরত। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের পর্যালোচনা ও সমালোচনা নিয়ে গবেষণা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আমি অধিবিদ্যার পরিচয়, ইতিহাস, সমকালীন প্রেক্ষাপট ইত্যাদি তুলে ধরেছি। এরিস্টটল, একুইনাস, ব্রাডলি, এইচ.ডি. লিউইস এর আলোচনায় আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি, অধিবিদ্যা কীভাবে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করছে। বিরুদ্ধবাদীদের সম্মান ও মর্যাদার দিকে লক্ষ রেখে তাঁদের ত্রুটিগুলোকে যুক্তিবিদ্যার মাপকাঠিতে মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। যুক্তিবিদ্যার আকারগত কাঠামোর প্রতি সবার শ্রদ্ধা আছে। এরিস্টটল যুক্তিবিদ্যার মূলনীতি অধিবিদ্যায় প্রয়োগ করে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রমাণ করেছেন। একুইনাস এরিস্টটলকে অনুসরণ করে অধিবিদ্যার ব্যাখ্যা করেন। ব্রাডলি হেগেলকে অনুসরণ করে বাস্তব সত্তার ব্যাখ্যা করেন। আর এইচ.ডি.

Dhaka University Institutional Repository

লিউইস অতীতের ও বর্তমানের বিখ্যাত দার্শনিকদের ক্রটি-বিচ্যুতি উদঘাটন করে অধিবিদ্যার যুগোপযোগী আলোচনা করেন। আর প্রত্যক্ষবাদের সমালোচনা অনেকেই করেছেন। তবে লিউইস, ভেনবার্গ, জোয়াড, কার্ল পপার, ম্যাক ইন্টায়ার, পাসমোর প্রমুখের সমালোচনাগুলো অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও আবেগমুক্ত। আমি তা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। সমকালীন অন্যান্য আধিবিদ্যক ও অধিবিদ্যা বিরোধী মতামত সংক্ষেপে আলোচনা করেছি।

তবে মূল কথা হলো, অধিবিদ্যা দর্শনের অপরিহার্য অংশ। যত দিন নৈতিকতার মূল্য থাকবে তত দিন অধিবিদ্যাও থাকবে।

আব্দুল কুদ্দুস

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

১ম অধ্যায়

অধিবিদ্যার পরিচয়

সহজ কথায় অধিবিদ্যার পরিচয় দেওয়া সহজ নয় । প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এর আলোচ্য বিষয়ে যেমন পরিবর্তন এসেছে তেমনি আলোচনার পদ্ধতিতেও এসেছে পরিবর্তন । তবে যে মৌলিক চিন্তা থেকে দর্শনের প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ এই শাখাটির গোড়াপত্তন হয়েছে তাতে কোনো পরিবর্তন হয় নি । এরিস্টটল জগৎ ও জীবনের সবচেয়ে আদিকারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই শাস্ত্র বা বিষয়ের সূচনা করেন । অভিন্দর্ভের প্রথম এই অধ্যায়টিতে আমি অধিবিদ্যার উৎপত্তি,সংজ্ঞা,আলোচ্য বিষয়,আলোচনার পদ্ধতি,সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, এর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি এবং জ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে এর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব ।

ক. অধিবিদ্যার উৎপত্তি

প্লেটো এবং এরিস্টটল উভয়ই মনে করতেন আমাদের নিজের সম্পর্কে এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে বিস্ময় ও জানার আগ্রহ থেকেই অধিবিদ্যার উৎপত্তি । D.A. Drennen সে কারণেই বলেন,

> অধিবিদ্যার মধ্যে দু'টি বিষয় রয়েছে- বিস্ময় ও রহস্য । বিস্ময়ের কারণে অধিবিদ্যা আর রহস্যের কারণে বিস্ময় । রহস্য হচ্ছে বিশ্বের অসমাপ্ত কাজ, তাই এটা চলতেই থাকবে । সে কারণে বিস্ময়ও থাকবে । এভাবে অধিবিদ্যা রহস্যের অংশ বিশেষ । রহস্যের অনুপস্থিতিতে অধিবিদ্যা থাকতে পারে না ।[১]

অর্থাৎ যা স্পষ্টতই দৃশ্যমান নয় অথচ আমাদের চিন্তার রাজ্যে প্রশ্ন সৃষ্টি করে যেমন,আত্মা,জগতের উৎপত্তিতে কোন উপাদান ছিল এবং কীভাবে সে উপাদান তৈরি হলো,আমাদের ইচ্ছার কি কোনো স্বাধীনতা আছে-ইত্যাদি আমাদের কাছে রহস্য, আর সেই রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা থেকে শুরু হয় অধিবিদ্যা । পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক পারমেনাইডিস থেকে শুবু হয় অধিবিদ্যার আদি স্তর । কিন্তু এরিস্টটলই এটাকে একটা বিশেষ শাস্ত্র বা বিজ্ঞান হিসেবে এর আকারগত রূপ দান করেন । অধিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Metaphysics এরিস্টটলের গ্রন্থের নাম হলেও তিনি এই নামকরণ করেন নি । তাঁর মৃত্যুর প্রায় এক হাজার বছর পর রডসের এন্ড্রনিকাস নামক একজন ব্যক্তি

এরিস্টটলের বিভিন্ন রচনার সম্পাদনা করতে গিয়ে পদার্থবিদ্যার পরের চৌদ্দটি পুস্তিকার নাম অজ্ঞাতসারেই অধিবিদ্যা নামকরণ করেন। অধিবিদ্যার ইতিহাসে এ কথাটিই ব্যাপকভাবে পরিচিত।[২] গ্রিক Ta meta ta phusika শব্দ থেকে অধিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Metaphysics শব্দটি এসেছে যার বিভাজন করলে দাঁড়ায় meta (beyond/after/above)+physics অর্থাৎ পদার্থবিদ্যার পরের আলোচনা। যেহেতু এখানে পদার্থিক বা বস্তুজগতের বাইরের বিষয় আলোচিত হয় তাই এই নামে এটি পরিচিতি লাভ করেছে। এরিস্টটল তাঁর এই গ্রন্থের কয়েকটি নাম উল্লেখ করেন, যেমন *First Philosophy, Theology, First Science, Wisdom.* এগুলো মূলত গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের ভিত্তিতে দেওয়া নাম।

খ. অধিবিদ্যার সংজ্ঞা

সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি, যেখানে বাহ্যিক জগতের বাইরে অতীন্দ্রিয় জগৎ এবং দৃশ্যমান এই জগতের পেছনে যে কারণ রয়েছে তার আলোচনা হয় তাকেই অধিবিদ্যা বলে। অধিবিদ্যার পরিচয় প্রসঙ্গে এরিস্টটল বলেন, "একটি বিশেষ বিজ্ঞান রয়েছে যা সত্তার স্বরূপ এবং প্রয়োজনীয় উপাদান সম্বন্ধে অনুসন্ধান পরিচালনা করে।"[৩] এখানে তিনি সত্তা বলতে অচালিত চালক বা ঈশ্বরকেই বুঝিয়েছেন। তবে তাঁর সত্তার আলোচনা অনেক ব্যাপক যা আলোচনার ধারাবাহিকতায় সামনে আসবে। আর অধিবিদ্যাকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ এটা কোনো আর্ট বা কলা নয়। এর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। তা ছাড়া এটা একটা অনুসন্ধান; এর মানে এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে কিছু পাওয়া যাবে। অন্যত্র তিনি বলেন, অধিবিদ্যা তার অনুসারীদের মধ্যে এক অনন্য অনুধাবন ক্ষমতা ও উপলব্ধির আগ্রহ সৃষ্টি করে। তাঁর মতে,এই বিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে পৃথক। কারণ অন্যান্য বিজ্ঞান সত্তার কোনো একটি দিক নিয়ে আলোচনা করে। যেমন গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি। কিন্তু অধিবিদ্যা মূল সত্তা বা সত্তার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে। তাঁর ভাষায়,"অধিবিদ্যা সব বিজ্ঞানের সেরা বিজ্ঞন; কারণ, এটা অন্যান্য সব বিজ্ঞানকে পরিচালনা করে।"[৪] এর মানে অন্যান্য সব বিজ্ঞান যেহেতু প্রকৃতির একএকটি বিশেষ উপাদান নিয়ে কাজ করে তাই সেগুলোর আলোচনার পরিধি সীমিত। কিন্তু অধিবিদ্যা এমন একটি বিজ্ঞান যেখানে সব বিজ্ঞানের সব উপাদানের যে মৌলিক কারণ তা নিয়ে আলোচনা করে, তাই এরিস্টটল এটাকে অন্যান্য সব বিজ্ঞানের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিজ্ঞান বলে মনে করেন। আর সেই আদিকারণ থেকেই যেহেতু সব কিছুর গতি সৃষ্টি হয়েছে, তাই সে আদিকারণই সমস্ত জগৎকে ও সমস্ত বিজ্ঞানকে পরিচালিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগের বিখ্যাত দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ টমাস একুইনাস (১২২৪-৭৪) অধিবিদ্যাকে খ্রিস্ট ধর্মের সাথে সমন্বয় করেন। তাঁর মতে, বাইবেলের আলোকে যত প্রকার জ্ঞান অর্জন করা যায় তার সর্বোচ্চ আকার হলো অধিবিদ্যা। এরিস্টটলকে অনুসরণ করে তিনি বলেন,

> অধিকতর মৌলিক একটি বিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। যে বিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের নীতিমালা অনুসরণ করে না বরং নিজস্ব নীতিমালা অনুসরণ করে তাই সর্বোচ্চ বিজ্ঞান। এটা হবে আত্মবিচার্য (self justifying) এবং অন্য বিজ্ঞানকে নির্দেশকারী (regulative) উভয়ই।[৫]

একুইনাস এরিস্টটলকে অনুসরণ করেই অধিবিদ্যা প্রসঙ্গে এই পরিচয় উপস্থাপন করেন। তিনি অধিবিদ্যাকে সর্বোচ্চ বিজ্ঞান বলার সাথে সাথে এটাকে আত্মবিচার্য বলেন,অর্থাৎ অন্য বিজ্ঞানের সহযোগিতা ছাড়াই এই বিজ্ঞান কাজ করে এবং অন্য কোনো মানদণ্ডের ভিত্তিতে এর সত্যতা বা সঠিকতার যাচাই করা যায় না। তবে এর পরিধির ব্যাপকতার কারণেই এটা সহজেই অন্যান্য সব বিজ্ঞানকে নির্দেশনা দিতে পারে।

আধুনিক যুগের দার্শনিক ডেকার্ট, লাইবনিজ ও কান্টের মতে, অধিবিদ্যা এমন একটি প্রধান সার্বিক জ্ঞান যা বিশেষ বিজ্ঞানসমূহের পূর্ব ধারণার সাথে জড়িত একটি স্থায়ী অপরিবর্তনীয় ধারণা।[৬] অর্থাৎ তাঁরা বলতে চান এটা পদার্থবিদ্যা,গণিত,রসায়নসহ বিচ্ছিন্ন ও পৃথক বিজ্ঞানসমূহের উৎপত্তিতে ও ব্যাখ্যা দানের জন্য আবশ্যক। অন্য বিজ্ঞানে নিজস্ব বিষয়বস্তু ও আলোচনার পরিধির সীমাবদ্ধতার কারণে মাঝে মাঝে বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা গেলেও অধিবিদ্যার জ্ঞানে কোনো পরিবর্তন নেই। তবে কেউ কেউ আছেন যারা কান্ট কিংবা ডেকার্টের বিরোধিতা করেন; তাঁরা এটাকে বিজ্ঞানের পূর্ব ধারণা বা ভিত্তি বলতে রাজি নন। এরিস্টটলের সাথে মিল রেখে তাঁরা এটাকে একটি সমন্বিত, সার্বিক ও চূড়ান্ত জ্ঞান বলে বিশ্বাস করেন। এঁদের মধ্যে ব্রাডলি অন্যতম। তিনি বলেন,

> সম্ভবত আমরা একমত হতে পারি,অধিবিদ্যা বলতে আমরা বুঝব কেবল অবভাসের বিপরীতে বাস্তব সত্তাকে জানার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে অথবা অদি নীতিমালা বা চূড়ান্ত সত্যের অধ্যয়ন কিংবা বিশ্ব জগৎকে কেবল আংশিকভাবে বা খণ্ড খণ্ড ভাবে না বুঝে বরং সামগ্রিক ভাবে বোঝার চেষ্টাকে।[৭]

অর্থাৎ দৃশ্যমান এই জগতের উর্ধ্বে এমন এক কারণ রয়েছে যা সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছে। সেই আদি কারণকে জানার প্রচেষ্টাই অধিবিদ্যার কাজ। এই বিজ্ঞান পরম বাস্তব সত্তার বিজ্ঞান,যেখানে সব জ্ঞানের তথা সমগ্র বিশ্ব জগতের সব কিছুর মিলন ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

গ. অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়

এরিস্টটল থেকে শুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত অধিবিদ্যা মূলত দু'টি বিষয় নিয়েই সীমাবদ্ধ ছিল- সত্তার বিজ্ঞান ও আদিকারণ। ১৭ ও ১৮ শতকের বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ এর পরিধি আরো বৃদ্ধি করেন। দেহ ও মনের সম্পর্ক, আত্মার অমরতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতাকে এই সময় অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৮] নিম্নে অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

(১)সত্তার বিজ্ঞান

মৌল সত্তার বিজ্ঞানই হচ্ছে অধিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয়। সহজ কথায় এই মৌল সত্তা হচ্ছেন ঈশ্বর। ঈশ্বরের ধারণা অধিবিদ্যায় যুক্তির সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়। ধর্মের ঈশ্বর হলেন বিশ্বাসের, আর অধিবিদ্যার ঈশ্বর যুক্তির। ঈশ্বরকে এখানে বলা হয় পরম সত্তা, অচালিত চালক, পরম ধারণা, পরম আকার ইত্যাদি। এই সত্তা অপরিবর্তনশীল ও অনিবার্য সত্তা । প্লেটো অবভাস ও বাস্তব সত্তার পার্থক্যকরণের মাধ্যমে পরম আকারকে আবিষ্কার করেন। তাঁর মতে,পৃথিবীতে যত বিড়াল আছে তা বিশেষ বিড়াল; এর বাইরে এক আদর্শ বিড়াল আছে, তাই বাস্তব। বিশেষ বিড়াল আদর্শ বিড়ালের অবভাস। এভাবে আমরা যা কিছু দেখি সবকিছুর উর্ধ্বে একটি আদর্শ বাস্তব জগৎ রয়েছে। প্লেটো সেটাকে ধারণার জগৎ বা প্রত্যয়ের জগৎ বলেন। প্লেটোর অধিবিদ্যায় চূড়ান্ত বিশ্লেষণে শুধু একজনই ঈশ্বর আছেন যা পরম শুভ। আর প্রত্যয় বা ধারণাসমূহ হচ্ছে ঈশ্বর বা পরম শুভের বিশেষণ।[৯]

এরিস্টটলের মতে, ঈশ্বর সব পরিবর্তনের উর্ধ্বে এক বিশুদ্ধ আকার বা রূপ। ঈশ্বর জগতের নিয়ামক ও সব কিছুর পরিচালক। ঈশ্বর সম্পর্কে এরিস্টটলের ধারণাগুলো অনেকটা ধর্মের ঈশ্বরের চেয়ে ভিন্ন। কারণ এরিস্টটলের ঈশ্বরের কাজ শুধু চিন্তন, তা আবার নিজের সম্পর্কে। হেগেলের মতে ঈশ্বর পরমাত্মা বা পরম ধারণা, অসীম অনন্ত আত্ম-চেতনা। এভাবে সমস্ত অধিবিদ পরমসত্তা সম্পর্কে যুক্তি প্রদান করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

(২) আদি কারণ

এরিস্টটলের অধিবিদ্যা শুরু হয়েছে কারণের বিশ্লেষণ দিয়ে। তিনি দেখলেন সব কিছুর একটি কারণ আছে। এভাবে কারণের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গেল সব কিছুর পেছনে আবার এমন একটি কারণ বিদ্যমান যার আর কোনো কারণ নেই বা থাকতে পারে না। সেই কারণকে তিনি আদি কারণ বলে

নামকরণ করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে কারণের ব্যাখ্যা সব অধিবিদের আলোচনায় কম বেশি দেখা যায়। এজন্যই আদি কারণ অন্বেষণ অধিবিদ্যার অন্যতম একটি আলোচ্য বিষয়।

(৩) আত্মার অমরতা

আত্মা সম্পর্কে জড়বাদী ও ভাববাদী দু'ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। গ্রিক দার্শনিক এনাক্সিমিনিসের মতে আত্মা হচ্ছে বস্তু, হিরাক্লিটাসের মতে আত্মা উষ্ণ বাষ্প, ডেমোক্রিটাসের মতে সব জাগতিক বস্তুই জড় থেকে উৎপন্ন, তাই আত্মাও পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত একটি জড় দ্রব্য। প্লেটো আত্মাকে আধ্যাত্মিক দ্রব্য বলেন, জন্মের আগেই আত্মার সৃষ্টি এবং মৃত্যুর পরও তার ধ্বংস নেই। এরিস্টটলও প্লেটোর প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেন। আবার হিউমের মতে আত্মা হচ্ছে বিভিন্ন প্রত্যক্ষণের সমষ্টি, এটা কোনো আধ্যাত্মিক দ্রব্য নয়, এবং এখানে অমর বা অবিনশ্বর বলতে কিছু নেই। জড়বাদীগণ আত্মার জড়ীয় ব্যাখ্যা দেন। তাঁদের মতে দেহের ধ্বংসের সাথে সাথে আত্মারও মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে ভাববাদীগণ আত্মার অমরতার পক্ষে যুক্তি দেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যেসব যুক্তি রয়েছে আত্মার অমরতার পক্ষেও তাঁরা সেসব যুক্তি উপস্থাপন করেন। পরমসত্তা যেহেতু পরমশুভ সেহেতু তিনি ভালকাজের প্রতিদান না দিয়ে পারেন না। সুতরাং আত্মাকে তিনি ধ্বংস করতে পারেন না। আত্মার অমরতার বিষয়টি মানুষের নৈতিকতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

(৪) দেহ ও মনের সম্পর্ক

দেহ ও মনের সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা অধিবিদ্যার নতুন আলোচ্য বিষয়। তবে এ সম্পর্কিত আলোচনা গ্রিক দর্শন থেকেই কম বেশি চলে আসছে। জড়বাদীগণ মনে করেন আত্মা বা মনের পৃথক কোনো ব্যাখ্যা নেই বরং তা দেহের গুণকে প্রকাশ করে। চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা এগুলো ভৌত বস্তুতে সংঘটিত ভৌত ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের তত্ত্বই এ ধরনের জড়বাদী তত্ত্বের সূচনা করে।[১০] এই জড়বাদের আধুনিক সংস্করণ দেখা যায় অভিন্নতা তত্ত্ব, আচরণবাদ প্রভৃতিতে।

অন্যদিকে ভাববাদীগণ বলেন, মন বা আত্মার পৃথক অস্তিত্ব রয়েছে। প্লেটো- এরিস্টটলের আলোচনায় দেখা যায় তাঁরা দেহ ও মনকে দু'টি ভিন্ন জিনিস মনে করতেন। ডেকার্ট, স্পিনোজা, লাইবনিজের বুদ্ধিবাদে এ প্রসঙ্গে আলোচনা এসেছে। ডেকার্টের মতে, মন হচ্ছে অমর এবং দেহের মৃত্যুর পরে অশরীরী অবস্থায় মনের অস্তিত্ব বজায় থাকতে পারে। দেহ ও মন পরস্পর নিরপেক্ষ সত্তা হওয়ায় পিনিয়াল গ্রন্থির মাধ্যমে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটে। এ জন্য একে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ (interactionism) বলা হয়। স্পিনোজা ডেকার্টের সমালোচনা করে দ্বিমুখী তত্ত্ব (double aspect

Dhaka University Institutional Repository

theory) অবতারণা করেন। এই মতের মূল কথা হলো, একটি তরঙ্গায়িত রেখা (an undulating line) এক বিশেষ মুহূর্তে এক দৃষ্টিকোণ থেকে অবতল অন্য দিক থেকে উত্তল বলে গণ্য হতে পারে। তথাপি এ কথা ঠিক নয় যে, অবতল ও উত্তল বলে এখানে দু'টি জিনিস রয়েছে। বরং একটি জিনিসকেই দুটি পরিস্থিতিতে ভিন্ন দেখায়। তদ্রুপ মানুষের চিন্তাশীল বস্তু ও শরীরী বস্তু- উভয়টি মিলেই মানুষ। দু'টি জিনিস ভিন্ন নয়। স্পিনোজা এক পর্যায়ে বলেন, প্রতিটি বস্তুর জড় ও চেতনা দুটি দিক রয়েছে তা যত ক্ষুদ্রই হোক। আবার লাইবনিজ বলেন, সৃষ্টির সময় ঈশ্বর একবার দেহ ও মনের মধ্যে শৃঙ্খলা বা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। তাই কোনো প্রকার দৈহিক বা মানসিক ঘটনার পরিবর্তন হলে একই সময় দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে।[১১] এই বিষয়টা অধিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ, মন বা আত্মার পৃথক ধারণা ছাড়া অমরতার ধারণা নিরর্থক।

(৫) ইচ্ছার স্বাধীনতা

ইচ্ছার স্বাধীনতার বিষয়টি মানুষের নৈতিকতার সাথে জড়িত। প্রাকৃতিক জগতের সব কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। মানুষ তার ব্যতিক্রম। একাধিক বিপরীত বিষয়ের মধ্য থেকে একটি বিষয় বাছাই করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার রয়েছে। তবে কারো কারো মতে মানুষ প্রকৃতির নিয়মের অধীন, তার স্বাধীন ইচ্ছা নেই। যদি এটা মেনে নেওয়া হয় তাহলে নৈতিকতার সব বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। ইমানুয়েল কান্ট তাঁর নীতিতত্ত্বের আলোচনা যে কথাটি দিয়ে শুরু করেছেন তা হচ্ছে, একমাত্র সৎ ইচ্ছাই সবচেয়ে মূল্যবান যাকে বিনা শর্তে মেনে নেওয়া যায়। সৎ ইচ্ছার বিপরীত অসৎ ইচ্ছা যা সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

ঘ.অধিবিদ্যার আলোচনা পদ্ধতি

অধিবিদ্যার আলোচনা কোন্ পদ্ধতিতে হবে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আমরা জানি, এরিস্টটলের মত অনুযায়ী আমাদের সমস্ত অনুমান বা যুক্তি আমরা আরোহ বা অবরোহ পদ্ধতিতে করে থাকি। তিনি তাঁর যুক্তিবিদ্যায় প্রথম এ নিয়ে স্পষ্ট আলোচনা করেন। তাঁর অধিবিদ্যায় এজন্য আমরা আরোহ ও অবরোহ দু'টি পদ্ধতির উপস্থিতি লক্ষ করেছি। তবে এ প্রসঙ্গে টেইলর বলেন,

> অধিবিদ্যার আলোচনা অবশ্য বিশ্লেষণমূলক, সমালোচনামূলক, অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ এবং অ-আরোহী পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ এবং বিশ্ব প্রকৃতির বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধিবিদ্যা তার আলোচনা করে থাকে।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ অধিবিদ্যায় বাস্তব অভিজ্ঞতার বিষয় নেই কিন্তু অভিজ্ঞতার জগতের মাধ্যমেই সে তার গন্তব্যে পৌছতে চায়। তাঁর মতে,বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ অধিবিদ্যার প্রমাণের জন্য কঠোরভাবে অবরোহী পদ্ধতি অনুসরণ করেন। ডেকার্ট, স্পিনোজা, লাইবনিজসহ সব বুদ্ধিবাদী দার্শনিক এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। কিন্তু হ্যাম্পশায়ারের মতে, অধিবিদ্যার আলোচনা আরোহ এবং অবরোহ উভয় প্রক্রিয়াতেই হতে পারে যদিও উভয় প্রক্রিয়াতেই কিছু ত্রুটি আছে আর কান্টের সমালোচনা থেকে কোনো পদ্ধতিই মুক্তি পায় নি। ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর প্রচলিত কার্যকারণের যুক্তি,উদ্দেশ্যবাদী যুক্তি,সাদৃশ্যমূলক যুক্তি মূলত আরোহভিত্তিক যুক্তি। আর আরোহ যতই বিজ্ঞানসম্মত হোক না কেন তাতে সংশয় থেকেই যায়। আবার বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তিতে আছে অবরোহের নীতি। হ্যাম্পশায়ার মনে করেন,পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের ধারণা আমাদের কারোরই নেই। তাই অবরোহ যে স্বত:সিদ্ধ থেকে নিঃসৃত হয় তাতেও নিশ্চিত সত্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।[১৩] তিনিও তাই কান্টের মত নৈতিক যুক্তিকেই অধিবিদ্যার আলোচনার জন্য অপেক্ষাকৃত উত্তম পদ্ধতি মনে করেন।[১৪]

ঙ. অধিবিদ্যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অধিবিদ্যার প্রথম ইতিহাস এরিস্টটল-ই রচনা করেন। তাঁর অমর গ্রন্থ '*অধিবিদ্যা*'য় প্লেটো-পূর্ব দর্শনের সমালোচনা অধ্যায়ে প্রকৃতিবাদী ও অতিপ্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের তিনি সমালোচনা করেন। তাঁর মতে থেলিস, এনাক্সিম্যান্ডার, এনাক্সিমিনিস প্রমুখ ছিলেন প্রকৃতিবাদী দার্শনিক। এছাড়া এনাক্সাগোরাস, এম্পিডক্লিস এর আলোচনায় দেখা যায় তাঁরা আদি কারণের সংখ্যা একাধিক বলে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে লিউসিপাস ডেমোক্রিটাস- এঁরা প্রাকৃতিক ঘটনাবলির মধ্যে চূড়ান্ত কারণ অনুসন্ধান করেন।[১৫] ইতালির ইলিয়াটিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে অধিবিদ্যার সূচনা ঘটে। জেনোফেনিস সর্ব প্রথম একত্বকেন্দ্রিক মতবাদের অবতারণা করেন। এরিস্টটলের মতে জেনো কোনো কিছু স্পষ্ট করে বলেন নি তবে তাঁর ছাত্র পারমেনাইডিস (খ্রি.পূ. ৫৪০-৪৭০) এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।[১৬] বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন,

> পারমেনাইডিস একধরনের আধিবিদ্যক যুক্তি আবিষ্কার করেন যা তাঁকে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। এ ধরনের আধিবিদ্যক যুক্তি কোনো না কোনো আকারে হেগেলসহ পরবর্তী অধিকাংশ অধিবিদদের মধ্যে লক্ষ করা যায়।[১৭]

পারমেনাইডিসের বক্তব্য ছিল ইন্দ্রিয়বোধের এই জগৎ প্রকৃত জগৎ নয়, বরং অধ্যাস। তাঁর মতে একমাত্র সত্য সত্তা হচ্ছে এক অনন্ত অবিভাজ্য সত্তা যা অপরিবর্তনশীল ও বিশ্বজনীন সত্তা।

Dhaka University Institutional Repository

সক্রেটিসের বক্তব্যে ঈশ্বরের ধারণা ছিল কম। তাঁর আগ্রহ ছিল সত্য ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে। প্লেটোর *Apology* এবং জেনোফোনের *Memorabilia* গ্রন্থদ্বয়ের মাধ্যমে আমরা সক্রেটিস সম্পর্কে জানতে পারি। সক্রেটিস এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন বলে মত প্রকাশ করেন অনেকে।[১৮] আত্মার অমরতার ব্যাপারে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে ঈশ্বরই ভাল জানেন।

সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রি.পূ.) অধিবিদ্যার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখেন। রাসেলের মতে, প্লেটোর অধিবিদ্যার বিস্তৃত রূপই ছিল এরিস্টটলের অধিবিদ্যা, যদিও এরিস্টটল প্লেটোর মতবাদের সমালোচনা করেন। প্লেটো তাঁর কল্পিত গুহার রূপকের মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় আকারের জগতের বর্ণনা দেন। বাস্তব সত্তা ও অবভাসের পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে তাঁর এই মতবাদ গড়ে উঠে। পরবর্তী অধিবিদদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় কেউ প্লেটোপন্থী আর কেউ এরিস্টটল-অনুসারী। সুতরাং তাঁর প্রভাব কত গভীর সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।

প্লেটো পরবর্তী তাঁরই ছাত্র এরিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূর্ব) ছিলেন অধিবিদ্যার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। জ্ঞানের প্রায় প্রতিটি বিষয়ে তিনি কলম ধরেন। তাঁর পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, রাজনীতি বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যাসহ অন্যান্য বিষয়ের গুরুত্ব বর্তমানে কমে গেলেও অধিবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার গুরুত্ব কোনো অংশেই কমে নি। তাঁর *'অধিবিদ্যা'* গ্রন্থের সূচনাতেই ৪টি কারণের (উপাদান কারণ, রূপগত কারণ, নিমিত্ত কারণ ও পরিণতি কারণ) ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি আদি কারণের অনুসন্ধান করেন। সেখানে তিনি পরম সত্তার সন্ধান পান। এটা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর অধিবিদ্যার মূল লক্ষ্য।[১৯] পরবর্তীতে ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, একুইনাস সহ অসংখ্য দার্শনিক তাঁর চিন্তা ধারায় প্রভাবিত হন। এরিস্টটলের মৃত্যুর মাধ্যমে গ্রিক দর্শনের মোটামুটি সমাপ্তি ঘটে। সেন্ট আগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০ খ্রি.) ছিলেন এরিস্টটল পরবর্তী অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য দার্শনিক,ধর্মতত্ত্ববিদ ও অধিবিদ। তিনি প্লেটোর অধিবিদ্যার অনুসারী ছিলেন। তাঁর *Confession* এবং *The City of God* গ্রন্থে দর্শনের আলোচনা এসেছে। অন্যসব দার্শনিকের উপর তিনি প্লেটোকে স্থান দেন। ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর মত ছিল, রাসেলের ভাষায়, "তিনি মনে করেন ঈশ্বর কোনো দেহধারী বস্তু নন, কিন্তু সব বস্তুই ঈশ্বর এবং অপরিবর্তনীয় কোনো কিছু থেকে সত্তা প্রাপ্ত হয়।"[২০]অবশ্য এ কথা একুইনাস ও অন্যান্য খ্রিষ্টীয় দার্শনিকগণও স্বীকার করেন। তবে পার্থক্য হলো তিনি খ্রিস্টধর্মকে সমন্বয়ের চেষ্টা করেন প্লেটোর দর্শনের সাথে।

অন্যদিকে টমাস একুইনাস (১২২৪-১২৭৪ খ্রিঃ) এরিস্টটলের অধিবিদ্যার অনুসরণ করে সেটাকে আরো সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করেন। এরিস্টটলের গ্রন্থের টীকা লিখে তিনি অধিবিদ্যা পাঠ সহজতর করেন। তিনি অধিবিদ্যায় সত্তার ভূমিকা আরো সুস্পষ্ট করেন। পল হরিগন

Dhaka University Institutional Repository

বলেন,"এরিস্টটল যেখানে form বা আকারকে প্রাধান্য দেন একুইনাস সেখানে সব জিনিসের চূড়ান্ত আধিবিদ্যক ভিত্তি বা সত্তা কর্মকে জোর দেন।"[২১] ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর তাঁর যুক্তিগুলো উল্লেখযোগ্য যদিও এগুলোতে এরিস্টটলের অনুসৃতি রয়েছে।

দর্শনের আধুনিক যুগে অধিবিদ্যার আধুনিকায়ন ঘটে। ডেকার্টের মাধ্যমে আধুনিক দর্শনের যে ধারা সূচিত হয় তা ছিল বুদ্ধিবাদী ধারা। ফ্রান্সিস বেকন এরিস্টটলের সমালোচনার মাধ্যমে এর ভিত্তি রচনা করেন, ডেকার্ট তার পূর্ণতা দেন। বিজ্ঞানমনস্ক দার্শনিক ডেকার্ট (১৫৯৬- ১৬৫০ খ্রি.) সংশয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত সত্যে উপনীত হন নিজের অস্তিত্বে এবং পরে ঈশ্বরের অস্তিত্বে। তিনি বলেন,

> আমি সব কিছুকেই সন্দেহ করতে পারি, কিন্তু সন্দেহ ক্রিয়াকে সন্দেহ করতে পারি না, এভাবে আমার মনের অস্তিত্বকে সন্দেহ করতে পারি না এবং আমার অস্তিত্বের পেছনে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ঈশ্বরই কেবল ক্রিয়াশীল।[২২]

মধ্যযুগের ধর্মতত্ত্ববিদ সেন্ট আনসেল্‌ম-এর অনুসরণ করে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি দেন। বুদ্ধিবাদী এই ধারা থেকেই metaphysics এর প্রতিশব্দ হিসেবে ontology শব্দের প্রচলন শুরু হয়।[২৩] স্পিনোজা জগতের কারণ রূপে ঈশ্বরকে অভিহিত করেন। লাইবনিজ (১৬৪৬-১৭১৬) ছিলেন আধুনিক কালের প্রথম জার্মান দার্শনিক যিনি একটা আধিবিদ্যক সিস্টেম দাঁড়া করানোর চেষ্টা করেন। ক্রিশ্চিয়ান ভলফ (১৬৭৯-১৭০৪) মনে করেন, তিনটি মৌলিক সহজাত ধারণা থেকে বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে সব রকম জ্ঞান সম্ভব। এই তিনটি ধারণা হলো ঈশ্বর, আত্মা ও জগৎ সম্পর্কিত ধারণা। সহজাত ধারণা আত্মা থেকে আমরা মন সম্পর্কে সব রকমের জ্ঞান পাই এবং সেই জ্ঞানকে তিনি নাম দেন যৌক্তিক মনোবিজ্ঞান (rational psychology)। সহজাত ধারণা ঈশ্বর থেকে যে জ্ঞানসম্ভার আমরা পাই তার নাম যৌক্তিক ধর্মবিজ্ঞান (rational theology) এবং সহজাত ধারণা জগৎ থেকে পাই যৌক্তিক বিশ্বতত্ত্ব (rational cosmology)।[২৪]

আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের অগ্রণী ছিলেন জন লক (১৬৩২-১৭০৪)। তিনি বুদ্ধিবাদের সমালোচনা করে বলেন, সহজাত ধারণা বা বুদ্ধির সাহায্যে ঈশ্বরের প্রমাণ করা যায় না। তবে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়ে যুক্তি না খুঁজে বিশ্বাসকেই প্রাধান্য দেন। একই কথা আত্মার অমরতার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন। অভিজ্ঞতাবাদী ধারার দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি বিশপ বার্কলি (১৬৮৫-১৭৫৩) জড়বাদ খণ্ডন করেন। তাঁর মতে,

Dhaka University Institutional Repository

> জড়দ্রব্য ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষণ নির্ভর ধারণার অবভাস। জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব অপ্রমাণের পর যা থাকে তা হলো আত্মা, পরমাত্মার ধারণা। এভাবে বিশ্বজগতের পেছনে একমাত্র ঈশ্বর এবং তার নিয়মকানুনই অস্তিত্বশীল থাকতে পারে।[২৫]

ড. আব্দুল মতীন এভাবে বার্কলির মতামতকে নিজের ভাষায় প্রকাশ করেন। এখানে বার্কলির অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়ার আরোহমূলক যুক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কান্ট(১৭২৪-১৮০৪) ও হেগেল(১৭৭০-১৮৩১) অধিবিদ্যার ইতিহাসে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ নাম। কান্ট একদিকে অধিবিদ্যাকে হত্যা করেন অন্যদিকে, বাস্তব প্রয়োজনে আবার জীবিত করেন। বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা যুক্তির সাহায্যে তিনি অধিবিদ্যাকে খণ্ডন করেন।হেগেল কান্টের মত দু'ধরনের কথা না বললেও তাঁর দর্শন দুর্বোধ্য। তাঁর মতে আমরা যাকে বিশ্ব প্রক্রিয়া বলি তাতে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিরন্তর একটি পরিকল্পনার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটছে। এই পরিকল্পনাই হচ্ছে পরম ধারণা (Absolute Idea)। প্লেটোর ধারণার জগতের সাথে এক্ষেত্রে হেগেলের পরম ধারণার কিছু মিল রয়েছে। হেগেলের চিন্তাকে ড. আমিনুল ইসলাম এভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন,

> পরম সত্তাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় এমন একটি ধারণা বা কল্পনা হিসেবে যা তার নিজ সম্পর্কে সচেতন। অন্য কথায়, পরম সত্তাকে অভিহিত করা চলে এমন একটি চিদাত্মা বা বিশ্ব আত্মা বলে যা চিন্তা করে এবং যাকে ধর্ম রূপক অর্থে ঈশ্বর বলে চিত্রিত করে।'[২৬]

হেগেল আরো বলেন, "ঈশ্বর জগতের সজীব গতিশীল প্রজ্ঞা; তিনি নিজেকে জগতে, প্রকৃতিতে এবং ইতিহাসে প্রকাশ করে থাকেন।"[২৭]হেগেলের মৃত্যুর পর হেগেলের দর্শন দু'ভাগ হয়ে যায়- হেগেলিয় ডান ও হেগেলিয় বাম। হেগেলিয় বাম হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে জড়বাদী রূপ ধারণ করে। কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস, লেলিন হেগেলের মতের জড়বাদী ব্যাখ্যা দেন। তাঁরা ঈশ্বর, ধর্ম, নৈতিকতা, অধিবিদ্যাকে বর্জন করেন। তাঁরা সব কিছুকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে দেখেন। অন্য দিকে হেগেলিয় ডানপন্থীগণ হেগেলের ভাববাদকে গ্রহণ করেন মনে প্রাণে। যদিও এই চিন্তা ধারার বিকাশে কিছুটা বিলম্ব হয় তবুও তা জার্মানির বাইরে বিশেষত বৃটেনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এই ধারার নেতৃস্থানীয়গণ ছিলেন টমাস হিল গ্রীন (১৮৩৬-১৮৮২), এডওয়ার্ড কেয়ার্ড (১৮৩৫-১৯০৮) এবং মার্কিন দার্শনিক যোসিয়া রয়েস (১৮৫৫-১৯১৬) প্রমুখ। তাঁরা সবাই একই মতের অনুসারী না হলেও এক আধ্যাত্মিক পরমাত্মা বা পরমসত্তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন জগতের মূল কেন্দ্র হিসেবে।

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতকে পাশ্চাত্য দর্শনে অধিবিদ্যাবিরোধী বিভিন্ন ধারা বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে। নব্যবাস্তববাদ, যৌক্তিক দৃষ্টবাদ, বিবর্তনবাদ, বিশ্লেষণী দর্শন, অস্তিত্ববাদ প্রমুখ অধিবিদ্যার বিপক্ষে অত্যন্ত ব্যাপক জোরালো ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এর বিপরীতে অধিবিদ্যার পক্ষেও তৈরি হয় শক্তিশালী ধারা। ফ্রান্স,বৃটেন,জার্মানি,ইতালি,আমেরিকা প্রভৃতি দেশে দেখা যায় তাঁদের ভূমিকা। যেমন, ফ্রান্সের হেনরি বার্গসোঁ (১৮৫৯-১৯৪১), ইতালির ক্রোচে(১৮৬৬-১৯৫২), আমেরিকার উইলডন কার (১৮৫৭-১৯৩১), জার্মানির রুডলফ ইউকেন (১৮৪৬-১৯২৬), বৃটেনের প্রিংগল প্যাটিসন (১৮৫৬-১৯৩১) প্রমুখ বিখ্যাত। বিংশ শতকের শেষ দিক থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টি নতুন করে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। বিশেষত বিজ্ঞানের নানান আবিষ্কার এতে বড় ভূমিকা রাখে। বৃটেনের আই.টি.রামজে (১৯১৫-১৯৭২), এইচ.ডি.লিউইস (১৯১০-১৯৯২), এন্থনি কুইন্টন (১৯২৫-২০১০), আমেরিকার পিটার ভান ইনওয়াগান (১৯৪২-) প্রমুখ অধিবিদ্যার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

চ. অধিবিদ্যার সাথে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক

অধিবিদ্যা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা নেওয়ার জন্য জ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের সাথে এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আমি এখানে বিজ্ঞান, ইতিহাস, নীতিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বের সাথে অধিবিদ্যার সম্পর্ক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

(১) অধিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা

অধিবিদ্যার সাথে নীতিবিদ্যার একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তবে যাঁরা অধিবিদ্যাকে অপ্রয়োজনীয় ও অনাবশ্যক মনে করেন তাঁদের কাছে নীতিবিদ্যার সাথে অধিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। উইলিয়াম লিলি নীতিবিদ্যার সংজ্ঞায় বলেন, "সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ সম্পর্কীয় এমন একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, যা সেই আচরণের ন্যায়ত্ব বা অন্যায়ত্ব কিংবা ভালবা মন্দত্বকে একটি আদর্শের আলোকে বিচার করে।"[২৮] অন্যদিকে অধিবিদ্যার কাজ বাস্তব সত্তার অনুসন্ধান। নীতিবিদ্যায় যে আদর্শের আলোকে ভালো-মন্দের বিচার করা হয় সেই আদর্শ বা মানদণ্ড নীতিবিদ্যাকে অধিবিদ্যার কাছে নিয়ে আসে। যদি সর্বোচ্চ কোনো মানদণ্ড না থাকে তাহলে যথার্থ বিচার সম্ভব নয়। কিন্তু যাঁরা অধিবিদ্যাকে অস্বীকার করেন তাঁরা বলবেন নীতিবিদ্যা একটি স্বাধীন বিভাগ। নীতিবিদ্যার দীর্ঘ ইতিহাসের আলোকে আমি একটু আলোকপাত করতে চাই।

সক্রেটিস-প্লেটোর দর্শনে নৈতিকতার বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সক্রেটিস নৈতিক সততার জন্যই জীবনোৎসর্গ করেন। তবে সক্রেটিস ও প্লেটো নৈতিকতাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রূপে

Dhaka University Institutional Repository

গণ্য করতেন।[২৯] এরিস্টটল *অধিবিদ্যা* রচনার পর নীতিবিদ্যায় হাত দেন। অধিবিদ্যার সাথে তিনি নীতিবিদ্যার সংযোগ সাধন করেন। বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন, "তাঁর আধিবিদ্যক মতবাদ সমূহ নৈতিক আশাবাদের অভিব্যক্তি। তবে সম্পূর্ণভাবে তাঁর নৈতিক মতবাদ অধিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল না হলেও অধিবিদ্যার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়।"[৩০]

জে.হ্যারি সম্পাদিত *Ethics, Contemporary Readings*[৩১] গ্রন্থে নীতিবিদ্যার যে ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে সেখান থেকে কয়েকটি তথ্য তুলে ধরছি। এখানে,এপিকিউরাসকে (৩৪১-২৭০ খ্রি.পূ.) বলা হয়েছে সুখবাদের প্রথম উপস্থাপক। তবে স্টোয়িকবাদের প্রধান অনুসারী জেনো (৩৩৬-২৬৪ খ্রি. পূ.) মনে করতেন নৈতিকতা ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত হয়। এপিকটেটাস (৫০-১৩০ খ্রি.) বলেন, মানুষ তার প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির মাধ্যমে নৈতিকভাবে কাজ করতে সক্ষম। এজন্যই তাঁকে কান্টের পূর্বসূরী বলা হয়। সেন্ট অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩৩ খ্রি.) খ্রিস্টধর্মের আলোকে নৈতিকতার ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে পূণ্যবানগণ মৃত্যুর পর *The City of God* এ অবস্থান করবেন। সেন্ট একুইনাস অগাস্টিনের মত খ্রিষ্টীয় নৈতিকতাকেই নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন; তবে এরিস্টটলের নীতিবিদ্যার মূলনীতিগুলোকে তিনি অনুসরণ করেন। তাঁর মতে সুখই হচ্ছে কামনার যোগ্য চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। কিন্তু পার্থিব জীবনে প্রকৃত সুখ উপলব্ধি করা যায় না, এই সুখের উপলব্ধি ঈশ্বরের উপলব্ধিতে পাওয়া যায়। ডানস স্কটাস (১২৬৫-১৩০৮) মনে করতেন ঈশ্বরের ইচ্ছাই নৈতিকতার চূড়ান্ত ভিত্তি। আধুনিক যুগে টমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯) প্রথম নৈতিকতার আধিবিদ্যক মত ত্যাগ করেন। *Laviathan* গ্রন্থে তিনি নৈতিকতাকে ব্যাখ্যা করেন পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁকে অনুসরণ করেন হিউম (১৭১১-৭৬), তবে হবসের মত সার্বভৌম রাজার ধারণা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে, নৈতিকতার উৎস আমাদের অনুভূতি (Sentiments)। আমাদের আচরণ, অনুভূতিই নৈতিকতাকে নির্দেশ করে। আমার পরিবারের একজনের প্রতি দায়িত্ব অন্যদের চেয়ে আমারই বেশি। এভাবে সম্পূর্ণ ধর্ম-নিরপেক্ষ নৈতিকতার ধারণা তিনি দেন। অন্যদিকে কান্ট হিউমের মত প্রত্যাখ্যান করে বলেন, অনুভূতি নৈতিকতার উৎস নয়, বরং ন্যায় অন্যায় উপলব্ধির জন্য প্রতিবন্ধক। তাঁর মতে নৈতিক অবধারণ অভিজ্ঞতা-পূর্ব। বেনথাম, মিলের উপযোগবাদ আধুনিক বৃটিশ নীতিবিদ্যায় বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। তবে উপযোগবাদ বা সুখবাদ গোড়া থেকেই অধিবিদ্যার প্রভাব মুক্ত।[৩২]

সমকালীন নীতিবিদ্যায় ম্যূরের (১৮৭৩-১৯৫৮)নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভালোর সংজ্ঞার জন্য তিনি *Principia Ethica* গ্রন্থখানি রচনা করেন। কিন্তু ভালোর কোনো সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়-এটাই তিনি এখানে প্রমাণ করেন। ম্যূর একজন নব্যবাস্তববাদী ও বিশ্লেষণী দার্শনিক। প্রচলিত

Dhaka University Institutional Repository

নীতিবিদ্যা আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা নামে পরিচিত। কিন্তু মূর নীতিবিদ্যায় আদর্শনিষ্ঠ ভাবধারার পরিবর্তে বিশ্লেষণী ভাবধারা প্রয়োগ করেন। এই ভাব ধারা বর্তমানে Meta ethics বা পরানীতিবিদ্যা নামে পরিচিত। হাসনা বেগমের[৩৩] বিশ্লেষণে ম্যূর নৈতিকতাকে প্রাকৃতিক ও প্রাকৃতিক নয়- দু'ভাগ করেন, আবার 'প্রাকৃতিক নয়' কে অপ্রাকৃতিক ও অতীন্দ্রিয় নামে আরো দু'ভাগ করেন। ম্যূরের মতে অপ্রাকৃতিক মতবাদই যথার্থ। আবার আধিবিদ্যক মতবাদকে অতীন্দ্রিয় বলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে, মিল, বেনথাম, হবস প্রমুখ ভালোকে প্রাকৃতিক বা অভিজ্ঞতামূলক শব্দের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করে ভুল করেছেন। এজন্য এই ভুলকে তিনি প্রাকৃতিকীয় অনুপপত্তি নামকরণ করেন। তিনি মনে করেন, ভালোকে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয় যেমন, হলুদ রং এর সংজ্ঞা প্রদান অসম্ভব কাজ। হলুদকে তখনই আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি যখন তা অন্য একটি বস্তুতে যুক্ত হয়, পৃথক হলুদের কোনো ব্যাখ্যা দান সম্ভব নয়। একইভাবে ভালোর সংজ্ঞায়নও সম্ভব নয়, তবে কোন জিনিস ভালতা আমরা বলতে পারি। ম্যূর নীতিবিদ্যাকে অধিবিদ্যার প্রভাবমুক্ত মনে করেন। তাঁর ভাষায়,

> 'একটি আধিবিদ্যক নীতিবিদ্যা' এ তথ্য দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত যে, এ নীতিবিদ্যা দাবি করে : যা সম্পূর্ণ রূপে ভালতা হলো এমন জিনিস যা অস্তিত্বশীল, কিন্তু প্রাকৃতিক নয়; অর্থাৎ একটি অতীন্দ্রিয় সত্তা যে সব বৈশিষ্ট্য ধারণ করে সে সব বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে বিদ্যমান।[৩৪]

তিনি আরো বলেন,

> আমি স্বীকার করি যে, অধিবিদ্যার পক্ষে উচিত এরকম অতীন্দ্রিয় সত্তাকে বিশ্বাস করার পক্ষে কী যুক্তি থাকতে পারে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। কারণ, আমি মনে করি যেসব জিনিস প্রাকৃতিক নয় সেগুলোর সত্যতাই অধিবিদ্যার বিশেষ বিচরণ ক্ষেত্র।[৩৫]

ম্যূর অপ্রাকৃতিক গুণ দ্বারা অতীন্দ্রিয় গুণকে বুঝান নি, যদিও ভিটগেনস্টাইন মনে করতেন অপ্রাকৃতিক গুণ মানেই আধিবিদ্যক বা অতিপ্রাকৃতিক গুণ, যেখানে তৃতীয় প্রকারের আর কোনো গুণ নেই। তবে E.D. Klemke ভিটগেনস্টাইনের এই ধারণাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করেন।[৩৬] হাসনা বেগম বলেন,

> ম্যূরের মতে কালের মধ্যে অস্তিত্বশীল নয় জ্ঞানের এমন বিষয়বস্তুকে সনাক্ত করে অধিবিদগণ সত্যের পথে নিশ্চিত ভাবেই খানিকটা এগিয়ে গেছেন। কিন্তু একটি বস্তু যদি প্রকৃতিতে অস্তিত্বশীল না হয় তবে তা অবশ্যই অতীন্দ্রিয় জগতে অস্তিত্বশীল রয়েছে এই ভুল অনুমানের কারণে ছদ্মবস্তুকে জ্ঞানের যথার্থ বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে তাঁরা ভুল করেছেন। তাঁদের এ মত ভ্রান্ত। কারণ অস্তিত্ব কেবল প্রকৃতিতেই সম্ভব, কোনো অতীন্দ্রিয় জগতে সম্ভব নয়।[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

ম্যূর অতীন্দ্রিয় সত্তা ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে গভীর সংশয় প্রকাশ করেন। তাঁর *Ethics* গ্রন্থে এসেছে,

> ... এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির (কোনো অ-মানবীয় সত্তা আছে যেমন, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা ইত্যাদি যা আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে) বিরুদ্ধে প্রবলতম আপত্তি হলো, খুব কম করে বললেও এরূপ কোনো সত্তা আছে কি না তা চরমভাবে সন্দেহপূর্ণ- যে সত্তা সব সময় যা সঠিক তাই ইচ্ছা করে কিন্তু সঠিক নয় এমন কোনো ইচ্ছা কখনোই পোষণ করে না; এবং আমি নিজে মনে করি যে, এরূপ কোনো সত্তা থাকার কোনোই সম্ভাবনা নাই- সম্ভবত কোনো ঈশ্বর নাই অথবা এমন কোনো সত্তা নাই- যাকে দার্শনিকগণ আমি যে সব নামের কথা উল্লেখ করেছি সে সব নামে অভিহিত করেন।[৩৮]

ম্যূর ছিলেন নব্য বাস্তববাদের একজন প্রতিষ্ঠাতা। নব্য বাস্তববাদ অধিবিদ্যার উপর প্রবল আপত্তি জানায়। হিউম তাঁর "ডিজাইন আর্গুমেন্টে" ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে যে কথাগুলো বলেছেন এখানে তাই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এফ এইচ ব্রাডলির মতে নীতিবিদ্যা ও অধিবিদ্যার গন্তব্যস্থল এক ও অভিন্ন। ড.আমিনুল ইসলাম ব্রাডলির ধারণাকে এভাবে তুলে ধরেন,

> যে অনুত্তরকে (absolute) ব্রাডলি তাঁর অধিবিদ্যায় জ্ঞান ও সত্যের পূর্ব ধারণা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁর নীতি দর্শনের নৈতিক আদর্শ হিসেবে গৃহীত। অনন্ত সমগ্রে, নিজেকে একটি আত্মসচেতন সদস্য হিসেবে আবিষ্কার ও উপলব্ধি করাই নৈতিকতার লক্ষ্য। [৩৯]

আইরিস মারডক "Metaphysics and Ethics" [৪০] প্রবন্ধে সমকালীন নীতি দার্শনিকদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেন, নীতিবিদ্যা নৈতিক ভাষার অধীনে কোনো শাস্ত্র নয়, এর বিচরণ ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক। যাঁরা ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নৈতিকতাকে ব্যাখ্যা করতে চান তাঁরা আসলে নৈতিকতার উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে যান। সাধারণ মানুষ ও ধর্মানুরাগীগণ তা কখনো কামনা করেন না। তাঁর মতে,ম্যূর 'ভালো'র সংজ্ঞায়নের যে প্রচেষ্টা চালান তাও ছিল এক ধরনের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। তিনি বলেন, "আমরা যখন নৈতিকতার কেন্দ্র হিসেবে ভালোকে অনুমান করতে শুরু করলাম তখন আসলে শব্দ দ্বারাই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। কিন্তু আমরা সত্য, সাহস, স্বাধীনতা, আন্তরিকতা প্রভৃতি নৈতিক শব্দকে অবহেলা করেছি। ভালোত্ব একটি সমৃদ্ধ ও সমস্যাপূর্ণ ধারণা, কিন্তু সত্য আমাদেরকে আধুনিক জগতের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দান করে।"[৪১] তিনি মনে করেন, আধুনিক দর্শন অধিবিদ্যা বিরোধী। কিন্তু এই বিরোধিতার কোনো গভীর ভিত্তি নেই, আছে ভিটগেনস্টাইনের শিক্ষা যেখানে একটি একক সূত্রের আলোকে নৈতিকতার ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। মারডক বলেন, নীতিবিদ্যার উন্নতির জন্য আমাদের এ ধরনের একক নিয়মের লোভ পরিহার করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

সমকালীন একজন বিখ্যাত নীতিবিদ পিটার সিঙ্গার মনে করেন নৈতিকতার সাথে ঈশ্বর, ধর্ম বা অধিবিদ্যার কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর প্রশ্ন, "ঈশ্বরকেই যদি ভালো-মন্দের মানদণ্ড বানানো হয় তাহলে ঈশ্বর কি ঈশ্বর দ্বারাই অনুমোদিত?" [৪২] তাঁর এই মন্তব্য সেই পুরাতন প্রশ্নকেই স্মরণ করিয়ে দেয়, ঈশ্বর যদি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা হন তাহলে ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করেছেন? প্রকৃতপক্ষে আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে দেশ কালের ব্যাখ্যা যেমন অসম্ভব তেমনি এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরও সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে ড. আনিসুজ্জামানের একটি উক্তি প্রনিধান যোগ্য। নৈতিকভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে কি না এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> আসলে এরূপ কোনো আধ্যাত্মিক সত্তা আছে কি নেই এ বিতর্কে আমাদের প্রবেশের প্রয়োজন নেই। কেউ এ ধরনের সত্তায় বিশ্বাস না করলেও ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের কল্পনার স্ফূর্তির জন্য এ ধরনের সত্তার অস্তিত্ব ধরে নিতে পারি। আর এরূপ অবস্থায় এ ধরনের সত্তার কল্পনা কোনো যুক্তিবিরোধী বা অবোধগম্য কিছু নয়।[৪৩]

অর্থাৎ তিনি বলতে চান নৈতিকভাবে কাজ করার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস অযৌক্তিক কোনো কল্পনা নয় এবং কেউ এক্ষেত্রে ঈশ্বরকে মেনে নিলে তাকে বুদ্ধি বিবেকহীনও বলা যাবে না। এতক্ষণের আলোচনায় দেখা যায় অধিবিদ্যা-বিরেধী নৈতিক ধারণার পাশাপাশি আধিবিদ্যক নৈতিকতাও ব্যাপকভাবে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে অদিবিদ্যার সাথে নীতিবিদ্যার একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

(২) অধিবিদ্যা ও ইতিহাস

সহজ কথায় ইতিহাস হচ্ছে অতীত কালের ঘটনাবলি ও তার বিশ্লেষণ। বিখ্যাত সমাজ দার্শনিক ইবনে খালদুন বলেন,

> ইতিহাস এক অতীব উচ্চমানের জ্ঞান। তার কল্যাণ বিপুল, অত্যন্ত শুভফল উৎপাদক। প্রাচীন জাতি ও জনগোষ্ঠী সমূহের নৈতিক অবস্থা, নবীদের জীবনালেখ্য, শাসক প্রশাসকদের প্রশাসন ব্যবস্থা এবং তাদের রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে ইতিহাস। যে কেউ ধর্মীয় ও বৈষয়িক ব্যাপারাদিতে অতীত লোকদের পদাংক অনুসরণ করবে, সে অবশ্যই কল্যাণময় ভাগ্যের অধিকারী হবে।[৪৪]

খ্রি.পূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে হিরডোটাস প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন বলে তাঁকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। P.L. Gardiner[৪৫] তাঁর "Metaphysics and History" প্রবন্ধে বলেন, ইতিহাসের প্রশ্নগুলো সাধারণত, কে, কী কারণে, কার মাধ্যমে ইত্যাদি ধরনের আর এসব প্রশ্নের উত্তর ঐতিহাসিকগণই দিয়ে থাকেন। তবে ১৮ ও ১৯ শতকে এসে ইতিহাসে দার্শনিক আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। গার্ডিনারের বক্তব্যের

Dhaka University Institutional Repository

আলোকে আমরা অধিবিদ্যার সাথে ইতিহাসের একটি সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা করব। তাঁর মতে অধ্যাপক এ.জে. টয়নবির (১৮৮৯-১৯৭৫) বিখ্যাত *A Study of History* গ্রন্থে তিনি ইতিহাসের পদ্ধতিকে আরোহী পদ্ধতি বলে মন্তব্য করেন। ১২ ভলিউমের বিরাট এই গ্রন্থের প্রথম দুই ভলিউমে (Book of Genesis) সভ্যতার উত্থান ও পতনের কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি দাবি করেন তাঁর তৈরি পদ্ধতি বিভিন্ন সংস্কৃতির নিবিড় পরীক্ষণের মাধ্যমে করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে অভিজ্ঞতামূলক নীতির প্রয়োগ করা হয়েছে।[৪৬]

গার্ডিনার মনে করেন কান্টের আলোচনাতেই প্রথম ঐতিহাসিক অধিবিদ্যার সূচনা ঘটে। কান্টের প্রশ্ন ছিল, একটি একক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে ইতিহাসের যৌক্তিক পরিচালনা কে করেন? তাঁর মতে মানব জাতির মধ্যে প্রকৃতি এমন একটি ক্ষমতা দিয়েছে যা তাকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করতে, ঐক্যবদ্ধভাবে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম এবং এই প্রক্রিয়া পূর্ব নির্ধারিত। একই ভাবে তিনি ইতিহাসকেও পূর্ব নির্ধারিত এবং প্রকৃতির পরিকল্পনার বাস্তবায়ন মনে করেন। কান্ট মনে করেন, ইতিহাসের এই গতিধারা অনিবার্য ভাবে চলমান, এতে কোনো ব্যতিক্রম ঘটবে না। তবে কেন অনিবার্য তার একটি ব্যাখ্যাও তিনি দেন। তিনি 'প্রকৃতিকে' বুদ্ধিমান সত্তা হিসেবে উল্লেখ করেন এবং এই 'প্রকৃতিই' তার নিজস্ব পরিকল্পনার আলোকে আমাদের মানব জাতিকে সাজিয়েছে। তিনি এক্ষেত্রে একজন মালির উদাহরণ দেন যিনি উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে একটি বিশেষ ধরনের বৃক্ষ উৎপাদন করতে চান। গার্ডিনার এতে প্রশ্ন করেন, তাহলে আমাদের মালির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে, যার কাজ, অভ্যাস আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা জানতে পারি। তাই মালির উদাহরণটি প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রকৃতির পরিকল্পনা মূলত একটি অতীন্দ্রিয় সত্তাকে নির্দেশ করে। কান্ট চেয়েছিলেন ইতিহাসকে একটি উদ্দেশ্যের সমন্বয় রূপে ব্যাখ্যা করতে যেখানে নৈতিক নিয়ম কার্যকর কিংবা তা ন্যায় বিচারের মূর্ত প্রতীক হিসেবে বোধগম্য হবে। তাঁর মতে ইতিহাস এমন কর্তৃত্বশীল যা এর মূল্যায়নকারীকে প্রতিদান দিয়ে থাকে শাস্তি বা পুরস্কার রূপে। গার্ডিনার মনে করেন,

> ইতিহাসের আধিবিদ্যক তত্ত্বে দুটি বিষয়ের লক্ষ্য করা যায়: প্রথমত, তা সমগ্র ইতিহাসকে একটি একক ধারণার আলোকে ব্যাখ্যা করে অর্থাৎ ইতিহাস একটি পরিকল্পনার অংশ। দ্বিতীয়ত, ইতিহাসকে সমগ্র বাস্তব সত্তার ব্যাখ্যার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।[৪৭]

হেগেল ছিলেন-উপরিউক্ত প্রথম প্রকার মতের অনুসারী। তাঁর মতে ইতিহাস একটি ব্যাপকতর পদ্ধতির অনিবার্য অংশ যা মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটা একটা বিস্তৃত পদ্ধতি। শোপেন হাওয়ারও ছিলেন এই মতের অনুসারী, তাঁর মত ছিল দর্শনের জন্য একমাত্র সম্ভাব্য কর্মসূচি হলো, সার্বিক কিছু ধারণার মধ্যেই

বিশ্বপ্রকৃতির একটি পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল চিত্রায়ন। আর হেগেলের মতবাদের কেন্দ্রে আছে সেই সার্বিক ধারণা। দর্শনে গণিতের অনুপ্রবেশের জন্য তিনি দর্শনের সমালোচনা করেন। তাঁর মতে গণিত একটি ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান এবং দর্শনের উপর গণিতের প্রভাব দুর্ভাগ্যজনক। কারণ গণিত যুক্তিবিদ্যার মূল বিধিকে মেনে চলে; যেমন, একটি জিনিস এমন হতে পারে না যা সে নয় এবং সে যে ধরনের অবশ্যই সেই ধরনেরই হবে। এসব নিয়মের মাধ্যমে বস্তুর চূড়ান্ত সত্য পাওয়া যায় না। হেগেলের মতে, বিশ্বজগৎ সম্পর্কিত আলোচনায় গণিতের ব্যবহার বস্তুর সে সব বৈশিষ্ট্যকেই বিবেচনায় আনে যেগুলোর পরিমাপ করা সম্ভব; যেমন, বস্তুর আকার, ওজন ইত্যাদি। কিন্তু আক্ষরিক অর্থে চিন্তার পরিমাপ বা ধারণার ওজনের কথা আমরা বলতে পারি না। আর বিশ্বজগৎ মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, নিজস্ব অভ্যন্তরীণ চিন্তা ও নীতির আলোকে চিরন্তনভাবে সম্মুখে অগ্রসরমান, এখানে গাণিতিক নিয়ম কার্যকর নয় বরং মানসিক নিয়ম কার্যকর।

কার্ল মার্কস হেগেলের বিরোধিতা করে বলেন, ফ্রান্সের রাষ্ট্র ক্ষমতায় তৃতীয় নেপোলিয়ানের উত্থান শেষ বিশ্লেষণে সেখানকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর কারণে হয়েছে। অর্থাৎ তিনি অর্থনৈতিক বা বস্তুগত কারণকেই ইতিহাসের চালক বলে গণ্য করেছেন। অন্যদিকে হেগেল ইতিহাসের পেছনে 'Principle' বা নীতির যে ব্যাখ্যা দেন, এর অর্থ মানব-ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায় এক একটি বিশেষ 'Principle' এর আলোকে ঘটে, যেখানে ধর্ম, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নৈতিকতা, আইন-কানুন, চাল চলন এমনকি বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার ভূমিকা রয়েছে। হেগেল ঐতিহাসিক বিকাশের পেছনে মনকে অর মার্ক্স বস্তুকে প্রাধান্য দেন। একারণেই হেগেল ইতিহাসের আধিবিদ্যক বিশ্লেষণের অন্যতম অগ্রপথিক। এই ছিল PL Gardiner এর আলোচনার সারাংশ।

আমরা লক্ষ্য করেছি, ইতিহাসের যে সুশৃঙ্খল আবর্তন ও বিবর্তন তা কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়মের লংঘনে হতে পারে না। এর পেছনে কোনো বুদ্ধিমান সক্রিয় বাস্তবসত্তার কল্পনা না করে প্রকল্প গঠন করা সম্ভব নয়। সুতরাং অধিবিদ্যার সাথে ইতিহাসের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আমরা অস্বীকার করতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে আলেকজান্ডার গ্রেট থেকে বৃটিশ ফরাসি উপনিবেশ শাসন পর্যন্ত দীর্ঘ ইতিহাসে শুধু অর্থই কাজ করেছে তা আমরা বলতে পারি না। একটি সভ্যতার পতন অর্থের অভাবেই ঘটে নি। এর পেছনে সক্রিয় সত্তা বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) অধিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্ব

অধিবিদ্যার সাথে ধর্মতত্ত্বের ঘনিষ্টতা সবচেয়ে বেশি । এরিস্টটলের মতে, "ধর্মতত্ত্ব সেই সত্তা সম্পর্কে আলোচনা করে যেই সত্তা সত্তাধর্মী ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে চূড়ান্ত স্বাধীনতার সাথে একত্রে গ্রথিত করে।"[৪৮] তিনি পদার্থবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বকে সবচেয়ে তাত্ত্বিক বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেন এবং এগুলোর মাঝে আবার ধর্মতত্ত্বকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোচ্চ শ্রেণীর অধিবিদ্যা বলে বিবেচনা করেন।[৪৯] এর কারণ খুব সহজ, ধর্মতত্ত্ব যেই মূল কেন্দ্র বিন্দু নিয়ে কাজ করে অধিবিদ্যা তাই প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

ড. আবদুল জলীল তাঁর *A Contemporary Philosophy of Religion*[৫০] গ্রন্থে ধর্মতত্ত্ব ও ধর্ম দর্শনের মধ্যে যে পার্থক্য দেখান সেখান থেকে আমরা ধর্মতত্ত্বের সহজ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব। তিনি ধর্মতত্ত্বকে Science of Religion বলে মন্তব্য করেন যার উদ্দেশ্য ধর্ম ও ধর্মীয় বিষেয়র উপর মানুষের নিকট সম্ভাব্য সর্বোচ্চ বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থাপন। তিনি এটাকে ঐতিহাসিক, মনস্তাত্ত্বিক ও তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ব্যাখ্যা করেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মতত্ত্ব ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও বিকাশের কাজে নিয়োজিত; মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আচরণের মনস্তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে ধর্মতত্ত্ব কাজ করে আর তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে, বিভিন্ন ধর্মীয় পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ এবং ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য, আইন, চরিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মের মূল ধারণা ঈশ্বরকে আবিষ্কার করে ধর্মতত্ত্ব। সহজ কথায় ধর্মতত্ত্ব ধর্মীয় অভিজ্ঞতার পদ্ধতিগত অধ্যয়ন অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ব মানেই হলো তা খ্রিষ্টীয়, ইহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ বা মুসলিম ধর্মতত্ত্ব হবে। তাঁর মতে, ধর্মতত্ত্ব প্রাকৃতিক বা প্রত্যাদিষ্ট হতে পারে। প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্বে ঈশ্বরকে অনুসন্ধানের জন্য চিন্তাশীল মানুষ প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার সাহায্য নেন। যেমন, এরিস্টটলের ধর্মতত্ত্ব ও হিউমের প্রাকৃতিক ধর্ম। অন্যদিকে ঐশী ধর্মতত্ত্ব প্রত্যাদেশের উপর নির্ভরশীল যেমন বাইবেল বা কোরআন ভিত্তিক ধর্মতত্ত্ব।

ধর্মতত্ত্বের উপর্যুক্ত ব্যাখ্যার আলোকে অধিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্ব পৃথক। প্রকৃতপক্ষে অধিবিদ্যা দর্শনের অন্যতম মৌলিক একটি শাখা কিন্তু ধর্মতত্ত্ব দর্শনের কোনো শাখা নয়। কোনো বিশেষ ধর্ম নিয়ে অধিবিদ্যা কাজ করে না বরং বাস্তব সত্তাকে জানার এটা একটা স্বাধীন প্রচেষ্টা। অন্য দিকে ধর্মতত্ত্ব বিশেষ ধর্মকেন্দ্রিক। আবার ধর্ম দর্শনের কাজ হলো ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা। ধর্ম দর্শন, ধর্মতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত না হলেও ধর্মতত্ত্ব থেকেই তা উপাদান সংগ্রহ করে, তবে আবেগমুক্ত ও যথাসম্ভব পক্ষপাতহীন ভাবে সেই উপাদান পরীক্ষা করে। অন্যদিকে অধিবিদ্যা ধর্মীয় বিশ্বাস, আচরণ নিয়ে কাজ করে না বরং পরম সত্তা, আত্মার অমরতা, ইচ্ছার স্বাধীনতা, দেহ ও মনের সম্পর্ক প্রভৃতি নিয়ে কাজ করে। এদিক থেকে অধিবিদ্যায় একটি ধর্মতাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা বিদ্যমান। আর তাই

Dhaka University Institutional Repository

এটা ধর্মতত্ত্বের সহযোগী। কোনো অধিবিদ নাস্তিক হতে পারেন না এবং নাস্তিকতার বিরুদ্ধেই অধিবিদ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একই ভাবে ধর্মতত্ত্ব মানুষকে নাস্তিকতার বিপক্ষে ঈশ্বরের আরাধনার গুরুত্ব দেয়। অধিবিদ্যাকে যদি সর্বোচ্চ তত্ত্ব বলা যায় তাহলে এর সর্বোচ্চ ব্যবহারিক শাস্ত্র হলো ধর্ম। আর এ কারণেই যাঁরা অধিবিদ তাঁরা সাধারণত কোনো একটি ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী। যেমন অগাস্টিন, একুইনাস, আলফারাবী, এইচ ডি লিউইস- এঁরা একই সময় একজন ধর্মতত্ত্ববিদ ও অধিবিদ ছিলেন।

অতএব বলা যায় অধিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্ব পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এদের মধ্যে পার্থক্যের তুলনায় সাদৃশ্যই বেশি।

(৪) অধিবিদ্যা ও বিজ্ঞান

এরিস্টটল অধিবিদ্যাকে সর্বোচ্চ বিজ্ঞান বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অধিবিদ্যার সাথে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রাকৃতিক জগতের বিষয়াবলি নিয়েই কাজ করে যেখানে অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, যাচাইকরণ ইত্যাদি বিষয় আবশ্যকীয়। অন্যদিকে আধিবিদ্যক বিষয়ের জন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব নয়; প্রাকৃতিক মানদণ্ডে পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ যাচাইকরণও সম্ভব নয়। তাই প্রাথমিকভাবে অধিবিদ্যার সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে না যেমন নীতিবিদ্যা, ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্বের সাথে পাওয়া যায়। কিন্তু গভীরভাবে তাকালে দেখা যায় অধিবিদ্যা ছাড়া আসলে বিজ্ঞানের তত্ত্ব সমূহের কোনো ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়। আমি এখানে প্রথমত Gred Buchdahl রচিত "Science and Metaphyscis" [৫১] প্রবন্ধের আলোকে এবং পরে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনা করব।

বুখডাল প্রথমেই পদার্থ বিজ্ঞানী H Margenau এর উদ্ধৃতি দেন। মর্গেনুর মতে, "কার্যকারণ তত্ত্ব আসলে পদার্থবিদ্যার একটি আধিবিদ্যক উপাদান।"[৫২] তবে পরবর্তীতে বলেন, "কার্যকারণ নীতির মধ্যে রয়েছে গঠনমূলক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া যেখানে আছে একের পর এক পুন সংযুক্তি।"[৫৩] বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে, "প্রকৃতি অপরিবর্তনীয় নীতির আলোকে চলে, এখানে যা প্রযোজ্য তার চেয়ে কম বেশি হয় না।"[৫৪] গ্যালিলিওর মতে, "প্রকৃতি অপরিবর্তনীয় নীতির আলোকে কাজ করে যা কখনোই লংঘন করে না। তা ছাড়া বিশ্বজগৎ গাণিতিক নিয়মে রচিত, গণিতের ভিত্তি প্রকৃতি থেকেই তৈরি হয়েছে।"[৫৫] বিজ্ঞানের মৌলিক নীতি 'কার্যকারণ নীতি' সম্পর্কে তাত্ত্বিক পদার্থবিদগণ এ ধরনের মন্তব্য করেন, যেখানে স্পষ্টতই প্রকাশ পায় কার্যকারণ নীতির যথার্থ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

আবার ডাল্টনের পরমাণুবাদ আবিষ্কারের পর প্রশ্ন উঠে পরমাণুর অস্তিত্বের ব্যাপারে আমাদের কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে কি না। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব জগৎ সৃষ্টির মূল উপাদান পরমাণু। কিন্তু অন্যান্য অভিজ্ঞতামূলক জিনিসের মত পরমাণুকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। বুখডাল বলেন,

> ১৮৬০ ও ৭০ এর দশকে ম্যাক্সওয়েল, বোল্টজ্‌ম্যান প্রমুখের হাতে "kinetic Theory of Gases" এর উদ্ভব হলে রসায়নবিদগণ পরমাণুতত্ত্বের জোরালো সমর্থন করেন। কিন্তু যেহেতু আমরা স্বাভাবিকভাবে পরমাণুকে ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করি না, তাই বিজ্ঞানের দার্শনিকদের প্রতিক্রিয়া ছিল পরমাণুর কেবল পরোক্ষ প্রমাণই সম্ভব।[৫৬]

১৯০৩ থেকে ১৯১২ এর সময় গুলোতে পরমাণুতত্ত্বের আরো অগ্রগতি ঘটে। তখন Ostwald তাঁর *All-gemeine Chemie* (1909) গ্রন্থে বলেন, "আমরা পদার্থের পারমাণবিক বিশ্লেষণের পরীক্ষামূলক প্রমাণ পেয়েছি, তাই এটাকে আর পরোক্ষ প্রমাণ বলা যায় না।"[৫৭] কিন্তু ১৯১৫ এর শেষের দিকে আর্নস্ট ম্যাক বলেন, "পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করা এক ধরনের অন্ধবিশ্বাস (dogma) এর মত।"[৫৮] তাঁর আরো বক্তব্য হলো, প্রকৃতিতে 'আলোর প্রতিসরণ' বিধি বলতে কিছু নেই বরং প্রতিসরণের বিভিন্ন ঘটনা আছে। ম্যাক এর কথার মিল আছে ১৮৪০ এর দশকের ক্যাম্ব্রিজের খনিজ বিজ্ঞানী উইলিয়াম হোয়েলের মন্তব্যে; তিনিও পরমাণুকে একটি দার্শনিক বিষয় বলে মন্তব্য করেন। আমেরিকার পদার্থ বিজ্ঞানী ব্রিজম্যানও মনে করেন, পরমাণুর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অনুমানমূলক, তবে এর বাহ্যিক বাস্তবতাকে আমাদের হাত পায়ের মতই আমরা উপলব্ধি করছি। বুখডাল তখন মন্তব্য করলেন, এটাই আধিবিদ্যক কথা আর এখানেই বিজ্ঞানের অধিবিদ্যার প্রকাশ।[৫৯]

আপেক্ষিক তত্ত্বের ব্যাখ্যায় পদার্থবিদগণ কখনো কখনো বলতেন, পরম গতির (absolute motion) কোনো অর্থ নেই। পরম গতি হলো পদার্থিক নিয়মের গতি, যার সাথে অন্য কোনো গতির সম্পর্ক নেই, কেবল শূন্য দেশের সম্পর্ক ছাড়া। প্রাকৃতিক বিধান নির্বিচারে সবসময় একই বিধান মেনে চলে এবং সমভাবে তা বিদ্যমান। এর অর্থ দাঁড়ায় গতির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব আমরা যাচাই করতে পারি না, তাই গতির ধারণা অর্থহীন এবং সে জন্যই পরম গতির ধারণাও অর্থহীন। বুখডাল বলেন, এতে আমরা বলতে পারি যেহেতু বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলোর অস্তিত্বের সত্য মিথ্যা যাচাই করা যায় না তাই আপেক্ষিক তত্ত্বের মত বিধানগুলোও অর্থহীন। আধিবিদ্যক বচনকে যাচাই করা যায় না তাই যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীগণ অধিবিদ্যাকে অর্থহীন বলে দাবি করেন। একই কারণে তাহলে বৈজ্ঞানিক বিধি গুলোকেও আমাদের অর্থহীন বলতে হবে।[৬০]

Dhaka University Institutional Repository

কোয়ান্টাম তত্ত্বের জনক Max Planck তাঁর *The Universe in the Light of Modern Physics* গ্রন্থে বলেন, "প্রাকৃতিক বিধির অস্তিত্বকে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য নই কিংবা বর্তমান পর্যন্ত যেভাবে এসেছে ভবিষ্যতেও সেভাবে তা চলমান থাকবে তারও কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।"[৬১] Max Bornও এ প্রসঙ্গে একই কথা বলেন যে, এটি একটি বিশ্বাসের বিষয় (question of faith) এবং একটি আধিবিদ্যক নীতি। বুখডাল এটাকে বললেন, আধিবিদ্যক সংশয়। কিন্তু এই সংশয় কেন? ম্যাকও বলেছিলেন, প্রাকৃতিক বিধি বলতে কিছু নেই। তাহলে প্রকৃতিতে যে নিয়ম নীতি বিদ্যমান তাকে অস্বীকার করতে হবে। এটা এক ধরনের স্ববিরোধী বক্তব্য। এর সমাধান অধিবিদ্যাতেই পাওয়া যাবে।

বুখডাল ডেভিড হিউমের একটি মন্তব্য তুলে ধরেন যেখানে রয়েছে, "নিউটনকে প্রকৃতির রহস্যের কিছু জিনিস উদঘাটন করতে দেখা গেলেও তা আসলে সম্ভব হয় নি, সেটা রয়ে গেছে এবং সব সময় থাকবে।"[৬৩] এখানে হিউম মূলত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করলেন। মৌলিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো আমাদেরকে এমন একটি গভীর উপলব্ধি দেয় যে, এমন কিছু সংযোজক আছে যেগুলোর কারণে প্রকৃতির রাজ্য দাড়িয়ে আছে। যেমন, গতিবিদ্যার 'বল' এর ধারণা। এগুলো এক ধরনের তাত্ত্বিক সংযোজক। প্রকৃতপক্ষে এগুলো পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ নির্ভর নয়। যদি বলা হয় কোনো বস্তু অনিবার্যভাবে পরস্পর সংযুক্ত থাকে তাহলে মূলত একটি মৌলিক বিষয়কে আমরা অনুভব করি। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব এর একটি উদাহরণ। তিনি গ্রহ, নক্ষত্র, সৌর জগৎ,মহাশূন্য ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে দেখেন একটি সর্বজনীন আকর্ষণীয় 'বল' কার্যকর। কিন্তু বার্কলি এর বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন। তাঁর মতে,

> এটা কোনো পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা নয়। যান্ত্রিক কোনো কিছুই একটি কারণ হতে পারে না অর্থাৎ একটি 'বল' পরীক্ষণ কিংবা গাণিতিক যুক্তি প্রক্রিয়ায় আবিষ্কৃত হতে পারে না। বস্তুতে যে গতি বিদ্যমান তা নিষ্ক্রীয় ও আরোপিত। আমরা একজন নিরাকার কর্তার উপস্থিতি ও কার্যকে বিবেচনায় না নিয়ে, এমনকি একটি পদক্ষেপও নিতে পারি না, যিনি সব জিনিসকে তার পছন্দনীয় এমনি ধরনের নীতির আলোকে সংযোগ সাধন, গতি সঞ্চার বা স্তব্ধ করে দেন।[৬৪]

বুখডাল মনে করেন বার্কলির এই মন্তব্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অসীম সংশয়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। এখানে আরো লক্ষণীয় বিষয় হলো, আধিবিদ্যক তত্ত্বগুলো যেসব সমস্যার সাথে যুক্ত যথার্থ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও সে সব সমস্যার সাথে জড়িত। নিউটনের ভর, বল, পরম দেশ-কাল এর সংজ্ঞায় অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় নি, আর একারণেই আর্নস্ট ম্যাক এগুলোতে সংশয় প্রকাশ করেন।

আর বার্কলিও একই কারণে এগুলোকে চূড়ান্ত বলেন নি। বুখডাল বলেন, আধিবিদ্যক স্বত:সিদ্ধ ও অভিজ্ঞতামূলক নীতির মাঝে যৌক্তিক বন্ধন খুব ঘনিষ্ট নয়, তথাপি পদার্থবিদ্যার তত্ত্বের ক্ষেত্রে আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গিই পোষণ করা হয়। লাইবনিজ বলেছিলেন, বাস্তব সত্তার (reality) গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে গাণিতিক বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মত প্রাকৃতিক জগতের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম নীতির প্রতিফলন বিদ্যমান। গতিবিদ্যা, আলোক বিজ্ঞান, তড়িৎ গতি সংক্রান্ত বিজ্ঞানের বিকাশেও লাইবনিজের এই বক্তব্য মিলে যায়। ভিটগেনস্টাইনও এ কথাটি তাঁর *Tractatus* এ স্বীকার করেন। "মানুষ যথার্থভাবে জানার আগেই অবশ্য একটি নূন্যতম কার্যবিধির ধারণার অনুসরণ করে।"[৬৫] অতএব বলা যায় মানুষ অভিজ্ঞতাপূর্ব জ্ঞানের অধিকারী কমপক্ষে এক ধরনের বিধির সম্ভাব্যতার জ্ঞান। বুখড়াল বলেন, আমরা জানি, এই বিধিগুলো মৌলিক, কিন্তু এর জ্ঞান কেবল অধিবিদ্যার মাধ্যমেই পেতে পারি।

ড. গালিব আহসান খান বলেন,

> বিজ্ঞান যে ব্যাপকভাবে জড় ভিত্তিক তা সাধারণভাবে স্বীকৃত সত্য। বিজ্ঞান এমনকি তথাকথিত মনকে জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মস্তিষ্ক প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করে। বিজ্ঞানের এ জড়বাদী দিকটি নিয়ে আমার কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক আর্থার এডিংটন এবং জেমস জিনস তাঁদের ভাববাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন। কৃষ্ণ গহবর, কৃষ্ণকাঠামো (black body) বা আলোর বিন্দু উৎস (Point source of light) বলে প্রকৃতই কি কিছু আছে? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির মুখোমুখি হব।[৬৬]

নোবেল বিজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাংক বিজ্ঞানের আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ভাষায়,

> সব বস্তুই কেবল মাত্র এমন এক শক্তির মাধ্যমে উৎপত্তি এবং অস্তিত্ব লাভ করে যা একই সময় একটি পরমাণু কণার মধ্যে দেখা যায়, তাতে কম্পন সৃষ্টি করে এবং পরমাণুর এই অতি সূক্ষ্ম সৌর জাগতিক পদ্ধতি অন্য সব জায়গায় প্রয়োগ করে । আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে এই শক্তির পেছনে একটি সচেতন ও বুদ্ধিমান মনের অস্তিত্ব রয়েছে। এই মনই হলো সব বাস্তুর আধার।[৬৭]

তিনি বিজ্ঞানীকে একজন কাল্পনিক ও বিশ্বাসী মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেন। বিশ্বাস (faith) দ্বারা তিনি অর্থ করেছেন, একটি কার্যকর প্রকল্পকে মেনে নেওয়া, যেমন, কার্যকারণ নীতি। এটা সত্য বা মিথ্যা নয় বরং একটা বিশ্বাস। তাঁর মতে, ধর্ম ও বিজ্ঞান ঈশ্বরে বিশ্বাসের আহবান জানায়। ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের

Dhaka University Institutional Repository

নিকট ঈশ্বর সব কিছুর শুরু আর পদার্থবিদদের নিকট ঈশ্বর সব কিছুর শেষ বিবেচনা; ধর্মে তিনি ভিত্তি, বিজ্ঞানে তিনি বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজপ্রাসাদ।[৬৮]আর্থার এডিংটন (১৮৮২-১৯৪৪) *The Nature of the Physical World* গ্রন্থে বিশ্বজগতের মূল উপাদানকে মন (mind-stuff) বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর মতে, কেউ অস্বীকার করতে পারবে না মন আমাদের অভিজ্ঞতায় প্রথম এবং সবচেয়ে প্রত্যক্ষ জিনিস।[৬৯] জেমস জিনস তাঁর *The Mysterious Universe* গ্রন্থে বিশ্বজগতের রহস্যের পেছনে একজন কর্তার কথা অকপটে স্বীকার করেন। এজন্য ভিটগেনস্টাইন তাঁকে বিভ্রান্তিকর ও তুচ্ছজ্ঞান করেন।

সুতরাং অধিবিদ্যার সাথে বিজ্ঞানের যে একটি নিবিড় ও ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। গালিব আহসান খানের মন্তব্যের মাধ্যমে এ বিষয়ের ইতি টানছি। তিনি বলেন,

> জগতের সৃষ্টি রহস্য ধর্মেও আলোচিত হয়, দর্শনেও আলোচিত হয় এবং বিজ্ঞানেও আলোচিত হয়। এমন অবস্থায় আলোচ্য বিষয় এক হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানের এসব ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য এবং আলোচনার প্রকৃতি নির্ধারিত হয় দ্বিতীয় একটি দিক দিয়ে যা হলো আলোচনার পদ্ধতি। যেমন, সৃষ্টির রহস্য নিয়ে ধর্মের আলোচনার পদ্ধতি হলো বিশ্বাসকে ভিত্তি করে যুক্তিকে অনুসরণ করা, এক্ষেত্রে দর্শনের পদ্ধতি হলো যুক্তিকে ভিত্তি করে আদিকারণ অনুসন্ধান করা; এবং বিজ্ঞানের পদ্ধতি হলো পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষনের মাধ্যমে যুক্তি গঠন করা।[৭০]

দেখা যাচ্ছে আলোচনার পদ্ধতির কারণেই বিজ্ঞান ও অধিবিদ্যার তথা দর্শনের পার্থক্য সূচিত হয়। তবে এটাও এখানে স্পষ্ট হয়েছে অধিবিদ্যার জ্ঞান ছাড়া বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

ছ. অধিবিদ্যার পক্ষে যুক্তি

অধিবিদ্যাকে ঈশ্বর সংক্রান্ত বিদ্যা বলা যায়। এজন্যই ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষের যুক্তিগুলো প্রকারান্তরে আধিবিদ্যক যুক্তি । বি এ ও উইলিয়ামস তাঁর "Metaphysical Arguments" [৭১] রচনায় প্রথমত দুই ধরনের আধিবিদ্যক যুক্তি উপস্থাপন করেন। একটি আরোহ আরেকটি অবরোহ ভিত্তিক । আরোহ পদ্ধতি নির্ভর যুক্তিটি হলো "design argument" যা বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ পেলের 'ঘড়ির যুক্তি' নামে পরিচিত। যুক্তিটি হচ্ছে এ ধরনের যে, হঠাৎ আমাদের কেউ একটি ঘড়ি বা একটি যন্ত্র পেল, তখন সে চিন্তা করল কেউ না কেউ এটা তৈরি করেছে। অনুরূপভাবে আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক জগতের জটিল ক্রিয়া- কর্ম,শৃঙ্খলা, বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য আমরা দেখতে পাই। আমাদের তখন এমন একটি অনুমান করা উচিত যে, এগুলোর পেছনে একজন নির্মাতা ও সুনিপুন পরিচালক আছেন,

Dhaka University Institutional Repository

যিনি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে এগুলো তৈরি করে যথাযথ ভাবে এগুলোকে তত্ত্বাবধান করছেন। বিবুদ্ধবাদীগণ অবশ্যই তখন বলবেন, এই বিশ্বচরাচরে অনেক সমস্যা, মানুষের দুঃখ কষ্ট, অস্বাভাবিক বস্তু, অসাময়িক জন্ম ইত্যাদি অনন্ত অসীম ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ নেই প্রমাণ করে । কিন্তু বার্কলি এর উৎকৃষ্ট জবাব দেন,

> *কি করে ঘড়ির চলায় কেনো ত্রুটি দেখা দিলে, ভেতরের কল-কবজায় তার অনুরূপ গোল দেখা* যায় এবং কোনো নিপুন হাতে তাকে সরিয়ে নিলে আবার সব ঠিক হয়ে যায় ?[৭২]

তাছাড়া প্রকৃতির ঘটনা ব্যাখ্যায় ও জীবনের প্রয়োজনে ও শোভা বর্ধনে লোকে তাদের কাজে লাগায়।[৭৩] এ ভাবে প্রকৃতির ভারসাম্য কিছুটা নষ্ট হওয়ার কারণে প্রকৃতিতে দুর্যোগ দেখা দিতে পারে। তা ছাড়া বিশ্বজগৎ চলমান ও গতিশীল নীতির আলোকে চলছে। তাই ক্ষুধা-দারিদ্র্য, দুঃখ, সমস্যার মাধ্যমে, নদী শুকিয়ে, নতুন নদীর উদ্ভব ঘটিয়ে, ভূমিকম্পে , পাহাড় ধ্বংস করে একটি সামগ্রিক পূর্ণতার দিকে এবং ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে অণুপরমাণু থেকে মহাজগৎ পর্যন্ত নিরন্তন ক্রিয়াপরতা চলছে। বার্কলি উপসংহার টানেন এভাবে,

> অতএব খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে যে বিশ্বাস ও সাক্ষ্য বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে আশা করা যেতে পারে, অধিকাংশ লোক যারা সব সময় বিষয় ও সুখের ওপর ঝুঁকে আছে, আর নিজেদের মনের চোখ দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে দেখতে বা মনের চোখ খুলতে যারা অভ্যস্ত নয়, তাদের মধ্যে যদি তা না থাকে, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু আছে কি?[৭৪]

অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও যুক্তিটি সাদৃশ্যের ভিত্তিতে তৈরি, আর সাদৃশ্যানুমান আরোহের অন্তর্গত। আরোহমূলক যুক্তির ফলাফল শক্তিশালী নয়। অর্থাৎ এ ধরনের যুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, সুতরাং ঈশ্বরে বিশ্বাসী কেউ এই যুক্তির চেয়ে ভিন্ন কোনো যুক্তি খুঁজবেন। উইলিয়ামস তাই অবরোহ যুক্তির কথা বলেন যা নিশ্চিত ও শক্তিশালী সিদ্ধান্ত দান করে। ১৭ শতকের বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ এই ধরনের আধিবিদ্যক যুক্তির সূচনা করেন। একটি স্বতঃসিদ্ধ থেকে যৌক্তিক প্রক্রিয়ায় অনিবার্য ভাবে অবরোহ সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়। যেমন, ডেকার্টের যুক্তি, আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি অস্তিত্বশীল। আর আমার অস্তিত্বের জন্য একমাত্র ঈশ্বরই দায়ী। এখানেও প্রশ্ন থাকে স্বতঃসিদ্ধ গুলো কীভাবে তৈরি হবে। যদি এখানে কিছুটা আরোহের আশ্রয় নেওয়া হয় তাহলে সিদ্ধান্তটা সম্পূর্ণ যথার্থ হবে না। সুতরাং তাঁর মতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের জন্য অবরোহ প্রক্রিয়াও খুব ফলপ্রসু নয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ জন্যই উইলিয়ামস প্রত্যক্ষণের ভিত্তিতে আরেকটি যুক্তি উপস্থাপন করেন। যুক্তিটি হচ্ছে এমন, কেউ গোধুলী লগ্নে কিছুটা দূরত্বে একটি পুরাতন বুট পড়ে থাকতে দেখে ভাবলেন, "এটা একটা বিড়াল হবে।"এখানে প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে তিনি একটি ভুল সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রকৃতপক্ষে তার ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও নিশ্চিত বিষয়ের সন্ধান দিতে পারে নি। একটু আলোর স্বল্পতা তাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা একটা সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রাণিত করল, তিনি প্রতারিত হলেন। এভাবে আমরা বাহ্যিক জগতের যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করছি তা কি সম্পূর্ণ সঠিক? আমরা যা ভাবি প্রত্যক্ষণ আমাদেরকে তা নির্দেশ করে না। এজন্যই প্লেটো বলেছিলেন দৃশ্যমান জগৎ নয় বরং ধারণার জগতই প্রকৃত পক্ষে বাস্তব ও অস্তিত্বশীল। অধিবিদ এর মাধ্যমে দাবি করেন আমাদের কাছে কোনো জ্ঞানই নিশ্চিত নয়। তবে একটি নিশ্চিত জিনিসের অস্তিত্বের কারণেই সব অস্তিত্বশীল হয়েছে, যাকে আমরা দেখি না এবং যদি দেখতে চাই তবে ভুল দেখব। আর তাকেই আমরা ঈশ্বর বলতে পারি। আর এই যুক্তিটি অনিবার্যভাবে অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ। উইলিয়ামস আধিবিদ্যক যুক্তিকে বৃক্ষের সাথে তুলনা করেন। অধিবিদ সেগুলোকে কোথায় রোপন করবেন তা নির্বাচন করতে পারেন এবং কীভাবে যত্ন নিবেন সেটাও তার ব্যাপার। কিন্তু তিনি এমন কোনো স্থান নির্বাচন করবেন না যেখানে সেগুলো আসলে বড় হবে কি না তিনি জানেন না।[৭৫]

জ. অধিবিদ্যার সমালোচনা

খ্রি.পূ.৬০০ অব্দ থেকে মাইলেশিয় দার্শনিক থেলিসের মাধ্যমে দর্শনের সূচনা। থেলিস নিজে ছিলেন জড়বাদী। তাঁকে অনুসরণ করে পরবর্তী ডেমোক্রিটাস, এনাক্সিমিনিসসহ অনেকে এই মত অবলম্বন করেন।অন্যদিকে পারমেনাইডিস, পিথাগোরাস সহ আরেকটি ধারা ভাববাদী মত অবলম্বন করেন।সুতরাং গোড়াতেই দর্শনের দু'টি বিভাজন আমরা দেখতে পাই। জড়বাদী ধারার অন্যতম ব্যক্তি সংশয়বাদী পিরো (Pyrrho) ছিলেন আধুনিক সংশয়বাদের আদি পুরুষ।তবে প্রাচীনকালে এই দুই ধারার মধ্যে বিরোধ এতটা কঠোর হয় নি যতটা আধুনিক যুগে দেখা যায়।

দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদ ও অধিবিদ্যা বিরোধী ধারার সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি ডেভিড হিউম (১৭১১-৭৪)। তাঁর *Treaties* ও *Dialogues* গ্রন্থে অধিবিদ্যার বিপক্ষে তিনি মত দেন। বিশেষত *Dialogues Concerning Natural Religion* গ্রন্থে তিনি ঈশ্বর সম্পর্কিত প্রচলিত শক্তিশালী যুক্তি 'Design argument' ও 'Teleological argument'-এর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এগুলো খণ্ডন করেন। তিনি আত্মার অমরতার বিপক্ষে মত দেন। অধিবিদ্যার দুই হাজার বছরের ঐতিহ্যে তিনি কুঠারাঘাত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

হিউম পরবর্তী ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) ছিলেন অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদানকারী অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি প্রমাণ করেন বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার মাধ্যমে অধিবিদ্যা সম্ভব নয়। তবে নৈতিকতার স্বার্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ইচ্ছার স্বাধীনতা ও আত্মার অমরতায় বিশ্বাস করার বাধ্যবাধকতা তিনি স্বীকার করেন। কান্ট পরবর্তী অধিবিদ্যা বিরোধী ধারাগুলোতে কান্টের প্রভাব বিদ্যমান।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রভাবিত একদল তরুণ দার্শনিক অধিবিদ্যা বর্জনের ঘোষণা দেন। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ (Logical Positivism) নামের এই মতের মূল কথা, যেহেতু অধিবিদ্যার ভাষাকে অভিজ্ঞতার নিরিখে যাচাই করা যায় না তাই এই ভাষার কোনো অর্থ নেই। অধিবিদ্যার বচন দেখতে বাস্তব মনে হলেও এগুলো আদৌ কোনো বচন নয়। সুতরাং দর্শন থেকে অধিবিদ্যাকে বাদ দিতে হবে। এই মতের অনুসারীদের মধ্যে আছেন আর্নস্ট ম্যাক (১৮৩৮-১৯১৬), মরিজ শ্লিক (১৮৮২-১৯৩৬), রুডলফ কার্নাপ (১৮৯১-১৯৭০),এ.জে.এয়ার(১৯১০-১৯৮৯)প্রমুখ।এই দলের প্রেরণা ছিল ভিটগেনস্টাইনের বিখ্যাত পুস্তক *Tractatus Logico Philosophicus*. ভিটগেনস্টাইন এই দলের প্রত্যক্ষ সদস্য না হলেও তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল এখানে। ভাষাতাত্ত্বিক দর্শনের মাধ্যমে তিনি অধিবিদ্যার সমালোচনা করেন। রাইল, অস্টিন, প্রমুখ এই চিন্তাধারা গড়ে তোলেন।

অধিবিদ্যার সমালোচনা যাই থাকুক অধিবিদ্যা তার অনন্য আকর্ষণ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। অভিজ্ঞতাবাদের প্রচলিত সংস্করণ ছিল যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ। এই মতের অনুসারীগণ জোর পূর্বক দর্শন থেকে অধিবিদ্যাকে বর্জন করতে চেয়েছিলেন। প্রত্যক্ষবাদ সূচনা থেকেই প্রবল বিরোধিতা ও সমালোচনার মুখে পড়ে। এই সমালোচনায় এক সময় তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন মতের সংশোধন করেন। ভিটগেনস্টাইনও এক সময় তাঁর মতের কঠোরতা হ্রাস করে অনেকটা নমনীয় ভূমিকা রাখেন।

তথ্য নির্দেশ

1. D.A.Drennen(ed.),*A Modern Introduction to Metaphysical Reading and Contemporary Sources,* London:George Allen & Unwin Ltd,1950, p.5
2. Paul Gerard Horrigan, *Introduction to Metaphysics*. In papers archive,at http:/www.phorrigan.fcpages.com/metaphysics2and3.htm,2003.
৩. *এরিস্টটলের অধিবিদ্যা*,(অনু.আব্দুল জলিল মিয়া),ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃ.৮১
৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫
৫. *Ibid*, D.A.Drennen(ed.),1950,p.10
৬. D.F. Pears(ed.), *The Nature of Metaphysics*, New York: St.Martin's Press, 1965, p.2
৭. F.H.Bradley,*Appearance and Reality*,6th Impression, London: George Allen & Unwin Ltd, ,1916,p.1

Dhaka University Institutional Repository

৮. CRAIG, EDWARD (1998). Metaphysics. In E. Craig (Ed.), *Routledge Encyclopedia of Philosophy*. London: Routledge. Retrieved September 29, 2009, from http://www.rep.routledge.com/article/N09

৯. বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস [প্রাচীন ও ক্যাথলিক দর্শন: নির্বাচিত অংশ]*, (অনু. প্রদীপ রায়), ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন,২০০০, পৃ. ১২৩

১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

১১. জেরোম এ. শেফার, *মনোদর্শন*, (অনু. মুহম্মদ জহুরুল হক), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ.৭২-৭৩

১২. Tailor,A.E.A.,*Elements of Metaphysics*. (2nd edition) NewYork: Macmillan Company,1909,pp.39-40

১৩. *Ibid*, D.F. Pears(ed.),1965, p.34

১৪. *Ibid*, p.35

১৫. *প্রাগুক্ত, এরিস্টটলের অধিবিদ্যা*, পৃ. ২৩

১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

১৭. *প্রাগুক্ত*, বার্ট্রান্ড রাসেল,২০০০,পৃ. ৪০

১৮. উইল ডুরান্ট, *দর্শনের ইতিকাহিনী*, (অনু. আবুল ফজল) ঢাকা: বাংলা একাডেমি,১৯৮০,পৃ.২৫

১৯. *প্রাগুক্ত, এরিস্টটলের অধিবিদ্যা*, পৃ. উনিশ (ভূমিকা)

২০. *প্রাগুক্ত*, বার্ট্রান্ড রাসেল,২০০০,পৃ. ২০৫

২১. *Ibid*,Paul Gerard Horrigan,2003

২২. আমিনুল ইসলাম, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী,১৯৮৪,পৃ. ২৯৮

২৩. *Ibid*,CRAIG, EDWARD ,2009.

২৪. কমরুদ্দিন হোসেইন, *কান্টের দর্শন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬, পৃ. ১৫

২৫. জর্জ বার্কলি, *মানুষের জ্ঞান সূত্র*, (অনু. আব্দুল মতীন), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪, পৃ. দুই (অনুবাদকের ভূমিকা)

২৬. *প্রাগুক্ত*, আমিনুল ইসলাম,১৯৮৪,পৃ.৪৩০

২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৪০

২৮. মুহম্মদ আবদুল বারী, *নীতিবিদ্যা*, ঢাকা: দিদার পাবলিশিং হাউস,১৯৮২, পৃ.৯

29. Harry, J. Gensler(ed.); *Ethics, Contemporary Readings*, London: Routledge, 2004. p.26

৩০. *প্রাগুক্ত*, বার্ট্রান্ড রাসেল,২০০০,পৃ. ১৭৮

৩১. Harry, J. Gensler(ed.);*Ethics,Contemporary Readings*, pp. 30-32.

৩২. *Ibid*, p. 34

৩৩. হাসনা বেগম, *মুওরের নীতিতত্ত্ব* , (অনু.কালী প্রসন্ন দাস), ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯, পৃ. ১৪-২০

৩৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

৩৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২-৪৩

৩৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪

৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

৩৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

৩৯. আমিনুল ইসলাম, *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২, পৃ. ১৭১

৪০. *Ibid*,D.F. Pears,1965,pp. 99-123

৪১. *Ibid*, p.119

৪২. পিটার সিঙ্গার, *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬ পৃ. ৩

৪৩. ড. আনিসুজ্জামান, "মানব সেবার দার্শনিক ভিত্তি," *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা ৪১, অক্টোবর ১৯৯১ পৃ. ১৩ (২০ নং পাদটীকা)

৪৪. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামের ইতিহাস দর্শন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, পৃ. ২৪

৪৫. *Ibid*,D.F. Pears (ed)1965,pp.83-98

৪৬. *Ibid*, p.85

৪৭. *Ibid*, p.90

৪৮. *প্রাগুক্ত, এরিস্টটলের অধিবিদ্যা*, পৃ. ৩১৫

৪৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩

৫০. Abdul Jalil Mia, *A Contemporary Philosophy of Religion*, Dhaka:Islamic Foundation Bangladesh,1982, pp. 1-6

৫১. *Ibid*,D.F. Pears,1965, pp. 61-82

৫২. *Ibid*, p.61

৫৩. *Ibid*, p.61

৫৪. *Ibid*, p.62

৫৫. *Ibid*, p.62

৫৬. *Ibid*, p.65

৫৭. *Ibid*, p.66

৫৮. *Ibid*, p.67

৫৯. *Ibid*, p.68

৬০. *Ibid*, p.71

৬১. *Ibid*, p.73

৬২. *Ibid*, p.73

৬৩. *Ibid*, p.75

৬৪. *Ibid*, p.78

৬৫. *Ibid*, p.82

৬৬. গালিব আহসান খান, *বিজ্ঞানের দর্শন*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন,২০০২, পৃ. ২৩-২৪

67. http:// www. Brainyquote.com/quotes/max planck,2001

৬৮. *Ibid*

৬৯. Eddington, A.E.: *The Nature of The Physical World*,New york:The macmillan Company,1929,p.281

৭০. *প্রাগুক্ত*, গালিব আহসান খান, ২০০২,পৃ. ২৩-২৪

৭১, *Ibid*, D.F, Pears,1965,pp. 40-60

৭২. *প্রাগুক্ত*, জর্জ বার্কলি, ১৯৭৪,পৃ.৫১

৭৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩

৭৪, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪

৭৫. *Ibid*, D.F.Pears,1965,p.60

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

এরিস্টটল, একুইনাস, ব্রাডলি ও এইচ ডি লিউইস এর অবদান বিবেচনা

এই অধ্যায়ে আমি চারজন বিখ্যাত অধিবিদের অবদান বিবেচনা করব। আমি অধিবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্রে প্রধানত এরিস্টটলের চিন্তা ও আলোচনা পদ্ধতির অনুসরণের চেষ্টা করেছি। সে জন্যই প্লেটোকে বাদ দিয়ে তাঁরই শিষ্য প্রাচীন যুগের এরিস্টটলকে আমি এখানে নিয়ে এসেছি। মধ্যযুগের একুইনাস এবং আধুনিক যুগের ব্রাডলিও ছিলেন এরিস্টটলকে অনুসরণকারী একজন বিখ্যাত বৃটিশ অধিবিদ। প্রাচীনযুগে লিউসিপাস, ডেমোক্রিটাস, জেনোফেনিস, পারমেনাইডিস সর্বোপরি প্লেটোর রচনায় অধিবিদ্যার আলোচনা থাকলেও এরিস্টটলের মাধ্যমে অধিবিদ্যার যে কাঠামো তৈরি হয়েছিল তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তিনিই অধিবিদ্যাকে পৃথক রূপ দেন। তারই উপর প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন পরবর্তী যুগের অধিবিদগণ। মধ্য যুগে এরিস্টটলের অনুসরণকারী অধিবিদ ও ধর্মতত্ত্ববিদ একুইনাসের মতবাদকে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। আধুনিক যুগের অনেক বিখ্যাত অধিবিদ থাকা সত্ত্বেও আমি এরিস্টটলপন্থী ব্রাডলির অধিবিদ্যাকে এখানে আলোচনা করবো। সমকালীন অধিবিদ্যাবিরোধী তীব্র স্রোত বিশেষত বামপন্থী হেগেলিয়দের আক্রমন থেকে অধিবিদ্যাকে রক্ষার চেষ্টায় তাঁর অবদান বিরাট। সর্বশেষে বর্তমান সময়ের নতুন নতুন অধিবিদ্যাবিরোধী আপত্তির সুশৃংখল ও আবেগ-নিরপেক্ষ জবাব দানকারী বৃটিশ অধিবিদ এইচ ডি লিউইসের মন্তব্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমি এই অধ্যায়টি সাজানোর চেষ্টা করেছি।

১. এরিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.)

জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাসে এরিস্টটল নামটি গভীরভাবে সংযুক্ত। তাঁর আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা চলে এসেছিল ঠিক কিন্তু সম্পূর্ণ অভিনব ও পণ্ডিতসুলভ এবং একজন অধ্যাপকের মত সব বিষয় উপস্থাপনের প্রথম কৃতিত্ব তাঁরই। সমালোচক গুণগ্রাহী সবাই এতে একমত। আমি এখানে তাঁর দার্শনিক মত বিশেষত আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আলোচনা করব।

এরিস্টটল খ্রি.পূ.৩৮৪ অব্দে উত্তর পূর্ব গ্রিসের ম্যাসিডোনিয়ার ছোট্ট শহর স্টেগিরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নিকোমাকাস ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিফের (আলেকজান্ডারের পিতা) পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। ১৭ বছর বয়সে প্লেটোর একাডেমিতে ভর্তি হওয়ার জন্য তিনি এথেন্সে চলে যান এবং প্লেটোর মৃত্যু পর্যন্ত (৩৪৭ খ্রি. পূ.) প্রায় ২০ বছর সেখানে জ্ঞানার্জন করেন। এরপর তিনি বর্তমান

Dhaka University Institutional Repository

তুরস্কের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত এশিয়া মাইনরের এসোসে গমন করেন। সেখানে দার্শনিক কার্যক্রমের পাশাপাশি তিনি Marine Biology-এর উপর গবেষণা করেন। এসোসের শাসক হারমিয়াসের আতিথ্যে সেখানে এরিস্টটল প্রায় ৩ বছর অতিবাহিত করেন। হারমিয়াসের মৃত্যু হলে তিনি নিকটবর্তী দ্বীপ লেসবস (Lesbos) গমন করে আরো ২ বছর কাটান। এখানেই হারমিয়াসের ভ্রাতুষ্পুত্রী পিথিয়াসকে বিবাহ করেন। ইতোমধ্যে ৩৪৩ অব্দে ফিলিপের অনুরোধে তিনি আলেকজান্ডারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। আলেকজান্ডার ১৩ থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর কাছে বিদ্যার্জন করেন। ৩৩৫ খ্রি.পূ. অব্দে তিনি এথেন্সে আবার ফিরে আসেন এবং বিখ্যাত গবেষণাগার লাইসিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন। দেবতা অ্যাপোলো লাইসিয়স এর নাম অনুসরণ করে স্থাপিত তাঁর এই প্রতিষ্ঠানে জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিদ্যা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, নীতিবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যাসহ জ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখায় গবেষণাকর্ম চলে। আলেকজান্ডারের মৃত্যু (৩২৩ খ্রি.পূ.) পর্যন্ত এরিস্টটল স্বাচ্ছন্দে এথেন্সে কাটিয়ে দেন। তাঁর মৃত্যুর পর এথেনিয়দের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি জীবন নাশের আশংকায় এথেন্স ত্যাগ করে চেলসিস দ্বীপে দেশান্তরিত হন এবং পরবর্তী বছর (৩২২ খ্রি. পূ.) তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি প্রায় চার শত গ্রন্থ রচনা করেন। অধিকাংশ গ্রন্থ কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো *Categories; Posterior Analytics; Prior Analytics, Topics, Sophistical Refutations; Physics; Metaphysics; De Anima; History of Animals; Meteorology; On the Soul; Nicomachean Ethics; Politics; Rhetoric; Poetics* প্রভৃতি।[১]

এরিস্টটলের জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে যে শৃঙ্খলা আমরা পাই তা তাঁর যুক্তিবিদ্যার কারণে। তিনি যুক্তিবিদ্যাকে সব বিজ্ঞানের পদ্ধতি বলে আখ্যায়িত করেন। যুক্তিবিদ্যার নীতি অনুসরণ করেই তিনি তাঁর এসব গ্রন্থ রচনা করেন। এমনকি অধিবিদ্যার আলোচনায়ও যুক্তিবিদ্যার সূত্র প্রয়োগ করেন। এরিস্টটলের অধিবিদ্যার আলোচনা কী নিয়ে শুরু করা যায় তা বলা কঠিন- একথা বার্ট্রান্ড রাসেলও স্বীকার করেন। বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইবনে সিনা বলেন, "আমি ১৪ বার এরিস্টটলের অধিবিদ্যা অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি নি।"[২] তবে অবশ্যই তিনি স্বীকার করেন আলফারাবির অধিবিদ্যার ভূমিকা পড়ে তাঁর কাছে তা স্পষ্ট হয়েছে। এরিস্টটলের অধিবিদ্যায় সহজ সরল ভঙ্গিতে অনেক বিষয় উপস্থাপিত হলেও এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক।

এরিস্টটলের অধিবিদ্যার উপর লিখিত পুস্তক *Metaphysics* গ্রন্থটির নামকরণ তিনি নিজে না করলেও বিষয়বস্তুর কারণে পরবর্তীতে এই নামেই গ্রন্থটি পরিচিত হয়। গ্রন্থটি ১৪টি খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থটি

Dhaka University Institutional Repository

অধিবিদ্যার উপর হলেও প্রথমে তিনি জ্ঞানবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করেন। এবং এই জ্ঞানবিদ্যাই তাঁর পরবর্তী অধ্যায় ও খণ্ডসমূহের ভিত্তি। তাঁর মতে প্রতিটি মানুষ স্বাভাবিক কারণেই জ্ঞান লাভ করতে আগ্রহী। আমি সংক্ষেপে তাঁর গ্রন্থের সারাংশ তথা অধিবিদ্যার উপর তাঁর চিন্তা তুলে ধরব। আমরা আগেই বলেছি অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় আদিকারণ তথা ঈশ্বর নিয়ে আলোচনা, আত্মার অমরতা প্রভৃতি। এসব ক্ষেত্রে এরিস্টটলের মন্তব্য বক্ষ্যমান আলোচনায় পাওয়া যাবে।[৩(ক)]

এরিস্টটলের মতে, মানুষ কেন জ্ঞান লাভ করেতে আগ্রহী, কারণ জ্ঞানকে তারা ভালোবাসে।[৩] জ্ঞানের প্রতি মানুষের এই ভালোবাসার কারণ জ্ঞান ইন্দ্রিয়গুলোর উপকারিতা ও জ্ঞানের উৎস হিসেবে এগুলোর ভূমিকা। আবার জ্ঞান ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে দর্শন-ইন্দ্রিয়কে তিনি সবচেয়ে গুরুত্ব দেন। তিনি মনে করেন, এটাই জ্ঞানের প্রধান প্রবেশ পথ এবং এর মাধ্যমেই মানুষ বস্তু, ঘটনা ইত্যাদির বিভিন্ন গুণাবলি স্বচ্ছভাবে বুঝতে পারে।[৪] এরিস্টটলের মতে, মানুষের জীবন যাত্রা বিজ্ঞান বা কলা এবং যুক্তি জ্ঞানের সম্মিলনে বিকশিত হয়। বিজ্ঞান ও কলা হচ্ছে অভিজ্ঞতার ফসল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার চেয়েও বেশি ভূমিকা রাখতে পারে জ্ঞান ও উপলব্ধি। একজন সাধারণ অভিজ্ঞ লোক শুধু জানেন একটি জিনিস বা বস্তু এই ধরনের, কিন্তু কেন এই ধরনের তা তিনি জানেন না। অন্যদিকে একজন প্রকৃত জ্ঞানী বা বিজ্ঞানী এই ঘটনার উৎস ও কারণ সম্পর্কে জানেন। এজন্যই তাঁর মর্যাদা বেশি। একজন হস্তশিল্পী একটি প্রাণহীন যন্ত্র চালিত জিনিসের মত প্রায় অচেতনভাবে উৎপাদন কাজ চালান, যেমন আগুন জ্বালায় কিন্তু আগুন জানে না কেন সে দহন করে। এভাবে তিনি প্রমাণ করেন একজন লোক ব্যবহারিক জীবনে যে কাজ করে তার দ্বারা নয় বরং কেন সেই কাজ করছে তার কার্যকারণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়ার মাধ্যমেই বস্তু ও ঘটনাকে ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হতে পারে।[৫] এতে আরো প্রমাণিত হয় ইন্দ্রিয়সমূহ আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দিতে পারে না। অর্থাৎ এগুলো বস্তুর উৎস বা কারণ সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় পরিধি অতিক্রম করে কলাবিদ্যা বা বিজ্ঞানের আবিষ্কার করেন তিনিই প্রকৃত বিজ্ঞানী।[৬] এবং এভাবে সেই বিদ্যা বা শাস্ত্রই জ্ঞান শাস্ত্র বা প্রকৃত বিজ্ঞান যার মধ্যে মূলকারণ ও আদি মূল নীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

অধিবিদ্যার মাহাত্ম্যঃ

প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এরিস্টটল অধিবিদ্যার প্রকৃতি ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। জ্ঞানের ব্যাখ্যা দেওয়ার পর তিনি প্রকৃত জ্ঞানীর পরিচয় দেন। তাঁর মতে, যে ব্যক্তি বিভিন্ন জিনিস প্রজ্ঞার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক পদ্ধতিতে অনুধাবন করেন তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। কলা বা বিদ্যাসমূহের

মধ্যে যে বিদ্যা নিজের জন্য ও জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষিত সেই বিদ্যা বা কলাকে প্রকৃত জ্ঞান (Wisdom)[৭] বলা যায়। প্রকৃত পক্ষে তিনি অধিবিদ্যার জ্ঞানকেই wisdom আখ্যা দেন এবং বলেন,

> অন্যান্য বিদ্যা বা জ্ঞান যা সম্ভাব্য ফলাফলের প্রতি বেশি আকৃষ্ট সে সব বিদ্যার চেয়ে আমরা প্রকৃত জ্ঞান (অধিবিদ্যা) কে শ্রেয় ও অধিকতর গুণ সম্পন্ন বলে গণ্য করি। এই জ্ঞান অন্য কিছুর অধীনস্ত নয়। অন্য কোনো বিদ্যা বা শাস্ত্রের কাছ থেকে কখনো তা আদেশ গ্রহণ করে না। বরং এর জ্ঞান সর্বোচ্চ এবং এই বিজ্ঞান যাবতীয় বিজ্ঞান ও শাস্ত্রসমূহকে নির্দেশ ও শিক্ষা প্রদান করে।[৮]

অর্থাৎ পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাসসহ জ্ঞান বিজ্ঞানের যত শাখা রয়েছে এর সবকটিই সম্ভাব্য ফলাফলের উপর নির্ভর করে। এমনকি এসব বিষয়ের কোনো কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কিছু কাল বা বহু বছর পল ভুলও প্রমাণিত হয়। এর বিপরীতে অধিবিদ্যার জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ। কারণ এখানে নিশ্চিত বিষয়ের আলোচনা হয়। যেমন আদিকারণের ব্যাখ্যা ছাড়া জগতের আলোচনাই সম্ভব নয়। আর এ কারণেই অন্য কোনো বিজ্ঞান থেকে এটা আদেশ গ্রহণ করে না বরং অন্যগুলোকে নির্দেশনা দেয়।

এরিস্টটলের সময় অধিবিদ্যা কথাটির আবিষ্কার হয় নি। আমি আগেই উল্লেখ করেছি, অধিবিদ্যা তখন দর্শন রূপেই পরিচিত ছিল। এবং দর্শনকে তিনি প্রায়শ বিজ্ঞান বলে অভিহিত করতেন। তবে এই বিজ্ঞান অন্যান্য ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মত নয়, এটা চিন্তাশীল ও অনুধ্যানমূলক। তাঁর মতে আদি বা মৌলিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত জ্ঞানই সবচেয়ে নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য, ব্যবহারিক বিজ্ঞান সংশয়মূলক ও পরনির্ভরশীল। অধিবিদ্যার প্রকৃতি প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন,

> একজন মুক্ত মানুষ যেমন অপরের উপর নির্ভশীল না হয়ে, কারো নির্দেশের অপেক্ষা না করে তার নিজ পায়ে অগ্রসর হয়, বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ আলোচ্য বিজ্ঞান অনুরূপভাবে মুক্ত এবং জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান এই নীতিতে বিশ্বাসী। আলোচ্য বিজ্ঞান বা দর্শন ন্যায়ত: অতি মানবিক, কেননা মানবপ্রকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাসত্বমূলক।[৯]

এর অর্থ অধিবিদ্যার জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞান। মানুষের প্রকৃতিতে জৈবিক প্রকৃতির প্রাধান্য থাকায় তার জ্ঞানে সীমাবদ্ধতা ও ঝোঁকপ্রবণতা বিদ্যমান; এজন্য সে মুক্তচিন্তা করতে পারে না। সাইনোনাইডসের[১০] উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, "কেবল ঈশ্বরেরই মুক্ত চিন্তা ও ক্ষমতা রয়েছে।" এভাবে এরিস্টটল ক্রমান্বয়ে ঈশ্বরের গভীরে আসেন। তিনি বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

> যে শাস্ত্র সবচেয়ে অতি মানবিক তা সবচেয়ে গৌরবজনক। যে শাস্ত্রের বিষয়বস্তু ঈশ্বর সেই শাস্ত্রকে দৈবশাস্ত্র বলে। এই দৈবশাস্ত্রই সর্বোত্তম শাস্ত্র। প্রত্যেক জ্ঞানী বা দার্শনিক বুঝতে পারেন ঈশ্বরই মূলনীতি বা কারণ। আমদের আলোচ্য জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে অথবা বহুলাংশে ঈশ্বরসংক্রান্ত। তাই অন্যান্য শাস্ত্র ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকতর প্রয়োজনীয় হলেও এই শাস্ত্র দর্শন হিসাবে সর্বোচ্চ।[১১]

এখানে তিনি অধিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হিসেবে ঈশ্বরসংক্রান্ত আলোচনাকে উল্লেখ করেন। ব্যবহারিক জীবনে এই জ্ঞান কম গুরুত্বপূর্ণ হলেও মানুষের চিন্তার জগৎ এটাকে বাদ দিতে পারে না। এজন্য এটাকে তিনি সর্বোচ্চ দর্শন বলে অভিহিত করেন।

অধিবিদ্যা সংক্রান্ত মূল বক্তব্যঃ

এরিস্টটলের মতে প্রকৃত বা খাঁটি জ্ঞান হচ্ছে কারণসমূহের জ্ঞান বিশেষত চূড়ান্ত কারণসমূহের জ্ঞান। কারণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলে ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে সহজে ধারণা নেওয়া যায়। অধিবিদ্যার আলোচনায় এজন্য তিনি প্রথমেই কারণের আলোচনা করেন। তাঁর মতে কারণসমূহেকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।[১২]

(১) আকারগত কারণ (formal cause): কোনো কিছুর মূল পরিকল্পনা ও নকশা যাকে সৃষ্টি করা হবে। এটা সেই জিনিসের সারসত্তা। যেমন একটি মূর্তি তৈরির কথা আসলে সেটি কার মূর্তি তা নির্মাতার মনে মনে থাকে।

(২) উপাদান কারণ (material cause): কেনো কিছু তৈরির কাজে মূল উপাদান যা দিয়ে জিনিসটি তৈরি করা হবে। যেমন মূর্তির উপাদান কারণ ব্রোঞ্জ। এরিস্টটল উপাদান কারণ নিয়ে আলোচনায় পূর্ববর্তী দার্শনিকদের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, তাঁরা অনেকেই আদি কারণ রূপে উপাদান বা বস্তুগত কারণকেই উল্লেখ করেন। যেমনঃ থেলিস পানি, এমপিডোকলিস বায়ু, পানি ,আগুন ও মাটিকেই আদিকারণ মনে করতেন।

(৩) নিমিত্ত কারণ (efficient cause): এর মানে হচ্ছে যন্ত্রপাতি বা উপকরণের মাধ্যমে ব্রোঞ্জের টুকরোগুলো সংযোগ ও সমন্বয়করণ। এরিস্টটল, এখানে জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ রূপে প্রেমকে উল্লেখ করে কবি হেসিয়ডের যে মন্তব্য তুলে ধরেন, তা হলো-

> First indeed of all was chaos: but next in order
> Earth with her spacious bosom : then

Dhaka University Institutional Repository

Love, who is pre-eminent amongst all the immortals.[১৩]

(৪) পরিণতি কারণ (final cause): এর অর্থ হচ্ছে কল্পিত মূর্তিটির বাস্তব রূপদান। বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন, "এরিস্টটলের অচালিত চালককে পরিণতি কারণ হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। অচালিত চালক একটি উদ্দেশ্য প্রদান করে যা মূলত ঈশ্বরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার একটি বিবর্তনিক প্রক্রিয়া।"[১৪] এরিস্টটল তাঁর এই কারণতত্ত্ব সবিস্তার আলোচনা করেন *Physics* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। সেখানে তিনি বলেন এই চার প্রকার কারণের মাধ্যমেই সব কিছুর ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অবশ্য এই চার কারণকে তিনি পরে দু'টি কারণের অন্তর্ভুক্ত করেন। আকার, নিমিত্ত ও পরিণতি কারণ মিলে আকারগত কারণ (formal cause) আর উপাদান কারণের(material cause) মিলনে গঠিত হয় বস্তু। এ ক্ষেত্রে তাঁর একটি পরিভাষা Hylomorphism বা আকার ও উপাদান সংক্রান্ত মতবাদ। গ্রিক শব্দ hule (matter) এবং morphe (form) উভয় মিলে Hylomorphism.[১৫] এরিস্টটলের অধিবিদ্যায় কারণতত্ত্বের উদ্দেশ্য মূলত ঈশ্বরকে আদিকারণ হিসেবে ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা থেকে।

এরিস্টটলের মতে অধিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় মৌল সত্তার বিজ্ঞান (Science of being qua being)।[১৬] আদি বা মৌল সত্তার প্রকৃতি, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান ও অনুধ্যান করা দার্শনিকের কর্তব্য। সোফিস্টদের মত ব্যবহারিক জ্ঞানের বিষয়বস্তু নিয়ে নয় বরং সত্তা সম্পর্কে স্পষ্ট বা নিশ্চিত জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা দার্শনিকের দায়িত্ব। তিনি অধিবিদ্যাকে প্রজ্ঞা (Wisdom) এবং ধর্মতত্ত্ব (Theology) নামেও অভিহিত করেন। অধিবিদ্যার আলোচনায় তিনি যুক্তিবিদ্যার দু'টি স্বত:সিদ্ধ (axiom) আলোচনা করেন যার উপর ভিত্তি করে তাঁর এই সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি মনে করেন যুক্তিবিদ্যার সঠিক জ্ঞান ছাড়া অধিবিদ্যা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাঁর দুটি স্বত:সিদ্ধ হলো: ১. বিরুদ্ধপদ নীতি (Law of Contradiction) এবং ২. মধ্যপদ শূন্য নীতি (Law of excluded middle)।[১৭] বিরুদ্ধ পদ হলো,পরস্পর বিরোধী দু'টি পদের মধ্যে তৃতীয় কোনো পদের সম্ভাবনা না থাকা;অর্থাৎ এখানে একটি সত্য হলে অন্যটি অবশ্যই মিথ্যা হবে। যেমন,কোনো ছাত্র একই সময় অছাত্র হতে পারে না। কারো কূপে পড়া আর না পড়া সমান নয়। এখানে একটি সঠিক হবে। একই সময় দুটি বিরুদ্ধ পদ সঠিক হতে পারে না। আর মধ্যপদ শূন্য নীতি অনুযায়ী,পরস্পর বিরোধী দু'টি পদের মধ্যে কোনো মধ্য পদ না থাকা। অর্থাৎ এখানে, একই সময় একটি অস্তিত্বশীল হলে অন্যটির অস্তিত্ব থাকবে না। যেমন,এখন যদি বাংলাদেশে দিন হয়,তাহলে এখন রাত বললে সেটা মিথ্যা হবে। প্রকৃতপক্ষে নিয়ম দু'টি প্রায় একই অর্থ প্রকাশ করে। এরিস্টটল এর মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন, কোনো কিছু কেউ স্বীকার করলে তাকে জেনে শুনেই তা স্বীকার করতে হবে,আবার অস্বীকার করলেও

Dhaka University Institutional Repository

জেনে শুনে অস্বীকার করতে হবে। একই সময় স্বীকার বা অস্বীকার করা যাবে না। যেমন,আদি কারণ বলে কোনো কিছু স্বীকার করলে তা অস্বীকারের আর সুযোগ থাকে না।

অধিবিদ্যা সংক্রান্ত তাঁর মূল আলোচনা পাওয়া যায় Z বুক থেকে। এখানে তিনি Substance বা দ্রব্য নিয়ে আলোচনা করেন। দ্রব্যই তাঁর অধিবিদ্যার কেন্দ্রবিন্দু। আমি একটু আগে বলেছিলাম 'সত্তা' (Being) হচ্ছে তাঁর মূল আলোচ্য বিষয়। তাঁর মতে,"আমরা অস্তিত্বশীল জিনিসের মূলনীতি ও কারণ অনুসন্ধান করছি,সত্তা বলতে আমরা সত্যিকার অর্থে অস্তিত্বশীল সত্তাকেই বুঝাই।"[১৮] এরপর তিনি Being -এর কয়েকটি অর্থের কথা বলেন। যেমন, আকস্মিক সত্তা, সত্য হিসেবে সত্তা, ক্যাটিগোরিস বা বিধেয় হিসেবে সত্তা, সম্ভাবনাপূর্ণ ও বাস্তব সত্তা। বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে তিনি আকস্মিক সত্তা ও সত্য হিসেবে সত্তার ধারণাকে অধিবিদ্যা বহির্ভূত বলে বর্জন করেন।[১৯] Z বুকের প্রথম অধ্যায়ের সূচনাতেই তিনি বলেন, "সত্তার (Being)যতই অর্থ থাকুক না কেন এর প্রথম ও প্রধান অর্থ হচ্ছে 'দ্রব্য' (substance); কারণ এটার মাধ্যমে অস্তিত্বশীল সত্তাকে বোঝানো হয়।"[২০] মূলত এখান থেকেই তাঁর Being এর আলোচনা Substance এ রূপান্তরিত হয়। Being এর আরেকটি অর্থ প্রসঙ্গে এখানে তিনি বলেন,"কোনো জিনিসকে অস্তিত্বশীল হতে হলে সাথে এর গুণ,পরিমাণ বা এর অনুরূপ কোনো বিশেষণ যুক্ত হবে।"[২১] অর্থাৎ কোনো কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করা মানেই অনিবার্যভাবে তার বৈশিষ্ট ,সংখ্যা প্রভৃতিকে স্বীকার করতে হবে। তাঁর মতে, হাঁটা, সুস্থ থাকা, বসে থাকা এগুলোর কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব নেই, এগুলোর সাথে একজন কর্তার আবশ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং যা প্রাথমিক ও শর্তহীন এবং চূড়ান্ত ভাবে অস্তিত্বশীল তাই 'দ্রব্য' (Substance)। এভাবে অধিবিদ্যার সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্ন এই দ্রব্য সম্পর্কে এরিস্টটল আবার বলেন, "সত্তা কী?-এটা হচ্ছে 'দ্রব্য কী?'-এই প্রশ্নের সমার্থক।"[২২]

দ্রব্য সম্পর্কে পূর্ববর্তী মতগুলোর সমালোচনা করে এরিস্টটল নিজ মত প্রতিষ্ঠা করেন। পিথাগোরিয় চিন্তাবিদগণ মনে করতেন কঠিন দেহের চেয়ে দেহের সীমারেখাই দ্রব্য। যেমন- তল, রেখা, বিন্দু ইত্যাদি। এভাবে তারা গাণিতিক দ্রব্য দ্বারা সব কিছুর ব্যাখ্যা করেন। প্লেটোর অনুসারীগণ মনে করেন, কতগুলো চিরন্তন দ্রব্য আছে এবং এরা অসংখ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিস হতে অনেক বেশি বাস্তব। এরিস্টটল দাবি করেন চার প্রকার জিনিসকে দ্রব্য বলা যায় (ক) সত্তাধার (Substratum), (খ) সারসত্তা (Essence), (গ) সার্বিক (Universal), (ঘ) জাতি (Genus)। তবে এই চার প্রকারের প্রথমটি Substance এর আসল অর্থ বহন করে। তাঁর মতে, যার সম্পর্কে সব কিছুকে বিধেয়করণ করা যায় কিন্তু তাকে কোন কিছুরই বিধেয় রূপে ব্যবহার করা যায় না, যখন সকল গুণাবলী অপসারিত হয় তখনও যার অস্তিত্ব থাকে তাই দ্রব্য। সহজ কথা যা প্রাথমিক ও শর্তহীন এবং চূড়ান্ত ভাবে অস্তি

Dhaka University Institutional Repository

ত্বশীল তাই দ্রব্য(Substance) ।[২৩] বার্ট্রান্ড রাসেল এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন সার্বিক ও বিশেষের সমস্যা হিসেবে । তাঁর ভাষায় এরিস্টটল যা বলতে চেয়েছেন,

> সার্বিক পদ দ্বারা আমি এমন এক প্রকৃতির পদ বুঝি যা বহু উদ্দেশ্যের বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় । কিন্তু 'বিশেষ' সে রকম বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় না । সুতরাং সার্বিক স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্বশীল হতে পারে না, সার্বিক বিশেষ বস্তুর মধ্যেই বিদ্যমান থাকে । স্বকীয় নামবাচক পদ দ্বারা যা বোঝানো হয় তাই দ্রব্য-বিশেষ, আর বিশেষণ রূপে যা আসে তাই সার্বিক ।[২৪]

দ্রব্যের ব্যাখ্যায় এরিস্টটল আবার Essence বা সারসত্তার প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন । তাঁর মতে,

> *কোনো জিনিসের সারসত্তা (Essence) অনিবার্যভাবে তার অস্তিত্বের (Existence) সাথে* জড়িত । যেমন অস্তিত্বশীল হওয়া ও সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া । কেউ তার অস্তিত্বের জন্য সংগীতজ্ঞ হয় না । একজন লোকের সারসত্তা তার মূল প্রকৃতির সাথে আবশ্যিকভাবে জড়িত । মূল প্রকৃতি পদকে সংজ্ঞায়িত করবে কিন্তু পদকে ধারণ করবে না । অন্যভাবে বলা যায়, যে সমস্ত জিনিসের সংজ্ঞা দেওয়া যায় কেবল সে গুলোই দ্রব্য হতে পারে । সংজ্ঞা ও সারসত্তা প্রধানত ও মূলত substance এর সাথে সম্পৃক্ত ।[২৫]

প্রচলিত যুক্তিবিদ্যায় সংজ্ঞায় আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করতে হয় এবং সে অনুযায়ী দ্রব্যের সংজ্ঞায়ন সম্ভব নয়,কারণ দ্রব্যের আসন্নতম জাতি নেই । কিন্তু এরিস্টটল সেই অর্থে সংজ্ঞার ব্যবহার করেন নি,এখানে সম্ভবত তিনি বোঝাতে চেয়েছেন এমন আবশ্যকীয় গুণকে যাকে বিধেয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় ।

এরিস্টটলের মতে, যুগ্ম পদের উভয়টির সারসত্তা নেই । যেমন- বক্র নাসিকা । বক্রতা নাসিকার একটি গুণ, নাসিকার আবশ্যকীয় গুণ নয়, সুতরাং নাসিকার সংজ্ঞা দেওয়া যায় বক্র নাসিকার নয়, আর তাই নাসিকারই সারসত্তা আছে । এভাবে তিনি প্রমাণ করেন, "সংজ্ঞা হচ্ছে সারসত্তার সূত্র, আর সারসত্তা সঠিক, প্রাথমিক এবং শর্তহীনভাবেই দ্রব্যে অবস্থান করে ।"[২৬] অর্থাৎ সারসত্তার মাধ্যমেই একটি জিনিসের মূল পরিচয় পাওয়া যায় । যেমন বার্ট্রান্ড রাসেল যুক্তিবিদ্যাকে দর্শনের সারসত্তা বলেন,এর অর্থ যুক্তিবিদ্যা না জানলে দর্শন শেখা সম্ভব নয় ।

এরিস্টটলের মতে, একটি জিনিসকে জানা আর তার সারসত্তাকে জানা একই জিনিস । যেমন, একটি ঘোড়ার সারসত্তা জানা মানেই ঘোড়া সম্পর্কে জানা । সুন্দর এর সারসত্তা তার মূল প্রকৃতির সাথে একইরূপ হবে । তাঁর দ্রব্যের আলোচনা এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে, তিনি মনে করেন দ্রব্যই সব জিনিসের

অস্তিত্বের কারণ।[২৭] দ্রব্যের ব্যাখ্যা দেওয়ার পর তিনি এর শ্রেণি বিভাগ আলোচনা করেন। বিষয়টি রাসেল এভাবে তুলে ধরেছেন, তাঁর মতে তিন প্রকার দ্রব্য রয়েছে। যেমন,

১. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও নশ্বর

২. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিন্তু অবিনশ্বর এবং

৩. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নয়, নশ্বরও নয়। [২৮]

প্রথম প্রকারের দ্রব্যের উদাহরণ হলো বৃক্ষরাজি ও প্রাণিকুল, দ্বিতীয় প্রকারের দ্রব্য চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি। আর তৃতীয় প্রকারের দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে মানুষের প্রজ্ঞাবান আত্মা এবং ঈশ্বর। লেম্বডা খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি এই বিষয়ে কথা বলেন, তবে তৃতীয় প্রকারের দ্রব্যই হচ্ছে অধিবিদ্যার মূল লক্ষ্য। এই খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যের আলোচনা করেন। ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত আদি সঞ্চালকের অস্তিত্ব, প্রকৃতি প্রভৃতি প্রমাণ করেন।

এরিস্টটলের মতে যত প্রকার জিনিস আছে সব কিছুর মধ্যে কেলবমাত্র দ্রব্যগুলোই (Substance) আদি ও মূল। যদি সকল দ্রব্যই নশ্বর হয় তাহলে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী হবে না। কিন্তু এটা অসম্ভব; কারণ গতি অবশ্যই চিরস্থায়ী। আবার কালেরও উদ্ভব কিংবা বিলোপ হতে পারে না। একমাত্র অবিরাম পরিবর্তন হচ্ছে দৈশিক পরিবর্তন এবং একমাত্র অবিরাম দৈশিক পরিবর্তনই হচ্ছে গতি। অতএব অবশ্য অনাদি বৃত্তাকার গতি বিদ্যমান থাকবে। আর এই অনাদি গতির কারণ কেবলমাত্র একজন অনাদি সত্তাই থাকতে পারে যার মধ্যে গতি অন্তর্নিহিতভাবে বিদ্যমান এবং যা গতি সঞ্চালন করার মূলনীতির অধিকারী। এই অনাদি সত্তাকেই তিনি ঈশ্বর বলেছেন।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যগুলোকে তিনি পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক দ্রব্য বলেছেন। এগুলোর পেছনে উপাদান ও আকার কারণ বিদ্যমান। কিন্তু অতীন্দ্রিয় ও অবিনশ্বর দ্রব্যকে তিনি অপরিবর্তনীয় দ্রব্য বলে উল্লেখ করেন। এই অপরিবর্তনীয় দ্রব্য অধিবিদ্যার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। তাঁর মতে, এটা অবশ্যই পদার্থ বা উপাদান বিহীন হবে; অর্থাৎ এখানে কেবল আকার কারণ থাকবে।[২৯]

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের পর ঈশ্বরের প্রকৃতি নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। তিনি বলেন,ঈশ্বর প্রেমময়। এই প্রেমের কারণেই গতির সৃষ্টি হয়। আর এই গতি থেকে অন্যান্য গতিও সৃষ্টি হয়। তাঁর মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই, এমনকি ক্ষুদ্রতম পরিবর্তনও তাঁর মাঝে নেই। এই জন্যই তিনি অচালিত চালক । ঈশ্বর হলেন এক জীবন্ত , শাশ্বত এবং সর্বোত্তম সত্তা। তাঁর মধ্যে জীবন ও স্থিতি নিরবচ্ছিন্ন ও চিরন্তন।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর মতে,ঈশ্বর হচ্ছেন পরম চিন্তন। কারণ পরম চিন্তন সর্বোত্তম জিনিস। তাই তিনি অবশ্যই নিজেকে নিয়ে চিন্তা করেন, তাঁর চিন্তন চিন্তনের চিন্তন। যদি ঈশ্বর অন্যের বিষয়ে চিন্তা করেন তাহলে তাঁর মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিবে অথচ তিনি অপরিবর্তনীয় সত্তা। তাঁর চিন্তা হবে অবশ্যই সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক বিষয়ের চিন্তা। আধ্যাত্মিক চিন্তন মৌলিকভাবে অবিভাজ্য। মানুষের চিন্তন কালের সীমার অধীন, কিন্তু আধ্যাত্মিক চিন্তন আদি বা শাশ্বত।[৩১] পরম শুভের ধারণাকে এরিস্টটল ঈশ্বরের সাথে সম্পৃক্ত করেন। তাঁর মতে সব জিনিসকেই সার্বিক শুভ'র জন্য বিন্যস্ত করা হয়। জগৎ কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনার সমাবেশ নয়। সব জিনিস একটি অপরটির সাথে সুবিন্যস্তভাবে গ্রথিত। এটা একটা গৃহ বিন্যাসের অনুরূপ, যেখানে মুক্ত মানুষ আদৌ উদ্দেশ্যহীন ভাবে বা খেয়াল খুশিমত বাস করে না। সবাই সার্বিক মঙ্গলের জন্য নিজ নিজ কর্তব্যের প্রতি নিবেদিত হয়ে কাজ করে। প্রত্যেক জিনিসের নীতিই হলো আনুগত্য স্বীকার করে খুশিমত চলা। এম্পিডক্লিসের সমালোচানা করে তিনি বলেন, শুভ এর সাথে অশুভ চিরন্তন নয়। এনাক্সাগোরাস শুভকে উদ্দেশ্যমূলক বলেছেন, সেটাকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে জগৎ অবশ্যই অশুভ ভাবে পরিচালিত হতে পারে না।[৩২]

এরিস্টটলের অধিবিদ্যায় প্রজ্ঞাবান আত্মার অমরতার কথা উল্লেখ থাকলেও এর বর্ণনা আসে নি। এই বিষয়ে তিনি *On the Soul* এবং *Nicomachean Ethics* গ্রন্থে আলোচনা করেন। রাসেলের মতে[৩২]এরিস্টটলের আত্মার ধারণাটি অস্পষ্ট। যেমন, পিথাগোরিয়ানদের জন্মান্তরবাদকে সমালোচনা করে তিনি বলেন, আত্মাকে দেহ থেকে পৃথক করা যায় না। সুতরাং দেহের মৃত্যুর সাথে সাথেই আত্মারও বিনাশ ঘটে। কিন্তু একটু পরে তিনি আবার বলেন, বস্তুগত দেহের আকার (Form) অর্থে আত্মা একটি দ্রব্য এবং বস্তুগত দেহের মধ্যে সুপ্ত আকারে বিদ্যমান থাকে। বস্তুর আকার ও উপাদানের মতই আত্মার ও দেহের সম্পর্ক। আত্মা দেহের আকার এবং দেহ আত্মার উপাদান।[৩৪] তিনি আবার বলেন, আত্মা হচ্ছে দেহের চূড়ান্ত কারণ। আত্মা সম্পর্কে আলোচনার পর মন সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেন। তিনি বলেন, মন সম্ভবত একটি স্বাধীন সত্তা এবং মন আত্মার মধ্যে প্রোথিত। মনকে অত্যন্ত ভিন্ন জাতীয় এক প্রকার আত্মা বলেন তিনি। তাঁর *Nicomachean Ethics* এ তিনি আত্মাকে দুই ভাগ করেন,প্রজ্ঞাবান (rational) এবং প্রজ্ঞাহীন (irrational)আত্মা। প্রজ্ঞাহীন আত্মার আবার দু'অংশ- উদ্ভিদ আত্মা ও কামনার আত্মা। সমস্ত জীবন্ত বস্তুর এমনকি উদ্ভিদের মধ্যেও উদ্ভিদ আত্মা লক্ষ্য করা যায়। আর কামনার আত্মা সমস্ত প্রাণির মধ্যে বিদ্যমান। অন্যদিকে প্রজ্ঞাবান আত্মায় ঐশ্বরিক উপাদান রয়েছে। যেহেতু ঈশ্বর অমর সুতরাং প্রজ্ঞাবান আত্মাও অমর। এরিস্টটল বলেন, আমরা যতটা পারি অমর হওয়ার চেষ্টা করব এবং আমাদের মধ্যে যে ঐশ্বরিক উপাদান আছে সেটাকে কার্যকর রাখতে

সদা তৎপর হব। রাসেল মনে করেন, প্লেটো এবং খ্রিস্টধর্মে যে অমরতার কথা বলা হয়েছে এরিস্টটল সেই ধরনের অমরতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। [৩৫]

পর্যালোচনা ঃ

এরিস্টটল একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হলেও তাঁর বক্তব্যের সমালোচনা কম নয়। একদিকে রয়েছে তার সীমাহীন খ্যাতি অন্যদিকে কম হলেও রয়েছে অনেক সমালোচনা। ফ্রেড্রিক কোপলস্টন তাঁর *A History of Philosphy* (vol-iii) গ্রন্থে বলেন, "এরিস্টটল মূলত অভিজ্ঞতার জগতের একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেন। তাঁর অধিবিদ্যায় ঈশ্বরকে গতির চূড়ান্ত কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এরিস্টটলের Matter কে কেউ বুঝতে চাইলে তিনি প্লেটোর তত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করেই বুঝতে পারেন।"[৩৬] তিনি আরও বলেন ,

> প্লেটোর মতে অভিজ্ঞতার জগৎ গঠনকারী বাহ্যিক জগতের কর্তা হচ্ছেন Demiurge (গ্রিক এই শব্দের অর্থ হলো সব কিছুর মূল) আর অন্যদিকে এরিস্টটল একেই ঈশ্বর বলে অভিহিত করেন।[৩৭]

তাঁরা উভয়েই সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঈশ্বরকে স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে তের শতকের পূর্ব পর্যন্ত ডানস স্কটাস (মৃত্যু-১৩০৮) এর দর্শন প্রভাব বিস্তার করে,এরিস্টটলের দর্শনের গুরুত্ব কম ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বিশেষত আরবদের মাধ্যমে এরিস্টটলের রচনা অনূদিত হওয়ায় খ্রিষ্টীয় জগৎ এরিস্টটলকে নতুন করে আবিষ্কার করে। এ সময় তাঁকেই স্বয়ং 'দর্শন' এবং "The philosopher" নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু রেনেসাঁ দর্শনে এরিস্টটলকে দর্শনের জন্য বিপর্যয়কর বলে মনে করা হত। [৩৮]

উইল ডুরান্টের মূল্যায়ন হচ্ছে,

> এরিস্টটলের ঈশ্বর নিষ্ক্রিয়, তিনি কিছুই করেন না। তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। কোনো ইচ্ছা নেই, নেই কোনো উদ্দেশ্য: তাঁর কজ এতই পবিত্র যে, সে জন্য তিনি কোনো কাজই করেন না। বস্তুর সার বা মূল বিষয়ের চিন্তা করাই হচ্ছে তার একমাত্র করণীয়। যেহেতু তিনি নিজেই সব কিছুর সার, সব রূপের রূপ অতএব তাঁর একমাত্র করণীয় হচ্ছে নিজের সম্বন্ধে বসে বসে চিন্তা করা। বেচারা এরিস্টটলের ঈশ্বর তিনি এক নিষ্কর্মা বাদশাহ।"[৩৯]

তিনি এরিস্টটলের ঈশ্বরকে তুলনা করেন ইংরেজ রাজার সাথে যার কোনো কাজ নেই, কিন্তু রাজা।[৪০] আত্মা প্রসঙ্গে এরিস্টটল যে মন্তব্য করেন সেটাকেও বিদ্রুপ না করে ছাড়েন নি ডুরান্ট। তিনি বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

> আত্মাকে অমরতা দেওয়ার জন্যই এরিস্টটল আত্মাকে ধ্বংস করে বলেন: অমর আত্মা হচ্ছে নির্মল চিন্তা যাতে লাগে নি বাস্তবের মলিন স্পর্শ। পরাবিজ্ঞানের কেক একই সময় খেয়ে আর নিজের হাতে রেখে দিয়ে এরিস্টটল-মেসেডোনিয় বিরোধী হেমলক বিষের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কল্পনার এক সূক্ষ্ম জাল বিস্তার করেন নি তো?[৪১]

অর্থাৎ সক্রেটিসকে যেভাবে গ্রিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে "যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করা এবং দেবতাদের গালি দেওয়া"র অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, এরিস্টটল হয়ত এমনি কোনো পরিণতির আশংকা করে আত্মা সম্পর্কে দুই ধরনের কথা বলে উভয়পক্ষকে সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছেন। T.H.Irwin এর মতে, এরিস্টটলের গড বিশ্বজগতের চুড়ান্ত কারণ কিন্তু সৃষ্টিকর্তা নন যেমনটি প্লেটোও মনে করতেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন জগৎ চিরন্তন। ঐশ্বরিক কোনো আদেশ নেই বা ভবিষ্যৎ ঘটনার জন্যেও তার কোনো জ্ঞান নেই। তবে বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের উপরই নির্ভরশীল। *Physics*-VIII-এ তিনি যুক্তি দেন গতির ব্যাখ্যা একটি আদি কারণের অনিবার্যতার প্রমাণ করে আর *Metephysics*-xii-এ তিনি বলেন, এই আদি কারণই ঈশ্বর অবস্তু ও দ্রব্য।[৪২] এরিস্টটলের অধিবিদ্যার সমালোচনা যাই থাকুক অধিবিদ্যা ও দর্শনের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

এরিস্টটলকে সমালোচনার মাধ্যমে ফ্রান্সিস বেকনসহ ১৭ শতকের দার্শনিকগণ আধুনিক দর্শনের সূচনা করেন। বার্ট্রান্ড রাসেল এরিস্টটল সম্পর্কে বলেছিলেন,তাঁর মৃত্যুর দুই হাজার বছরের মধ্যে বিশ্ব তাঁর মত কোনো দার্শনিকের জন্ম দিতে পারে নি। এই অতি সুনামের কারণে দর্শনের ও বিজ্ঞানের উভয়ের বিরাট ক্ষতি হয়েছে। সে জন্যই আধুনিক দর্শন এরিস্টটলের নীতিগুলোর সমালোচনার মাধ্যমে তার অভিযাত্রার সূচনা করে। তবে তাঁর অবদানকে বিশ্ববাসী অনন্তকাল ধরে স্বীকৃতি দেবে। বিশেষ করে অধিবিদ্যার আলোচনার গুরুত্ব এখনো কোনো অংশেই কমে নি।

Dhaka University Institutional Repository

২. সেন্ট টমাস একুইনাস

মধ্যযুগের স্কলাস্টিক দার্শনিক সেন্ট টমাস একুইনাস (১২২৫-৭৪) দর্শনের ইতিহাসে এক বিখ্যাত নাম। একজন ধর্মতত্ত্ববিদ, বিশপ ও অধিবিদ হিসেবে তাঁর নাম অবিস্মরণীয়। মাত্র অর্ধশতকের জীবন, কিন্তু যে বিশাল পর্বতচুম্বী কর্ম, পৃথিবীর ইতিহাসে তা খুবই বিরল। ১২২৫ সালে ইতালির রোম ও নাপেলস্ এর মধ্যবর্তী মন্টেক্যাসিনোর রোকাসেকায় এক পাহাড়ী প্রাসাদে জন্ম হয়েছিল তাঁর। ৫ বছর বয়স থেকে মন্টেক্যাসিনোয় পড়া লেখা শুরু হয়। পরিবারের সাথে স্থানান্তরিত হয়ে নাপেলসে চলে গেলে দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় বছর পড়াশোনা করেন। এখানেই তিনি এরিস্টটলের মতবাদের সাথে পরিচিত হন। পরিবারের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি ডোমিনিকান মত গ্রহণ করেন এবং আলবার্টাস ম্যাগনাসের নিকট শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোলন গমন করেন। আলবার্টাস ম্যাগনাস ছিলেন তৎকালীন দার্শনিকদের মধ্যে প্রধান এরিস্টটলপন্থী। সেখান থেকে তিনি প্যারিস যান এবং পড়ালেখা শেষ করে ডোমিনিকানদের ধর্মতত্ত্ব বিভাগের প্রধান হিসেবে তিন বছর দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী দশ বছর তিনি ইতালির বিভিন্ন স্থানে অতিবাহিত করেন। ল্যাটিন অ্যাভেরসবাদী ও এরিস্টটলপন্থীদের দ্বন্দ্বের অবসানের জন্য তিনি আবার প্যারিস আমন্ত্রিত হন। কিছুকাল প্যারিসে অবস্থান করে নাপেলসে ফিরে যাবার সময় পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে তিনি ৭ মার্চ ১২৭৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[১]

তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হলো *Summa Theologica, Summa Contragentiles, Being and Essence, The Principle of Nature*.এরিস্টটলের *Metaphysics, On the Soul, De Anima* গ্রন্থের টীকা লিখে তিনি এসব গ্রন্থ পাঠ সহজতর করেন। আর এসব টীকাতেই তাঁর মৌলিকত্ব ফুটে উঠেছে। বিখ্যাত ধর্ম যাজক বীথিয়াসের *On the Trinity* এবং *De Hebdomadibus* এর উপর লিখিত Commentary-ও তাঁর মৌলিক অবদান। তিনি এরিস্টটলকে অনুসরণ করেন এবং এরিস্টটলের দর্শনকে খ্রিষ্টধর্মের সাথে অভিযোজন করেন। এটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। একজন বিশপ হিসেবে তিনি যেমন সেন্ট অগাস্টিন ও আনসেলমের যোগ্য উত্তরসূরি তেমনি একজন দার্শনিক হিসেবে তিনি এরিস্টটলের যোগ্য অনুসারী। থিলি তাঁর সম্পর্কে বলেন,

> চার্চ ও চার্চের উন্নয়নে তাঁর আত্মোৎসর্গ, তাঁর দার্শনিক প্রতিভা, যা তিনি ক্যাথলিক ধর্মের সেবায় প্রয়োগ করেন এবং ধর্ম ও দার্শনিক সত্যের যথার্থ মিলনে তাঁর বিশ্বাস তাঁকে এরিস্টটলের উত্তরসূরি হিসেবে এবং অগাস্টিন ও আনসেলমের পর চার্চের সবচেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত করে।[২]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ তিনি একুইনাসকে এরিস্টটলের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে এবং একইসাথে একজন একনিষ্ঠ খ্রিষ্টান হিসেবেও স্বীকৃতি দেন। একুইনাসের অধিকাংশ দার্শনিক আলোচনা এরিস্টটল-ভিত্তিক। একজন অধিবিদ হিসেবে তিনি এরিস্টটলের ঈশ্বর সম্পর্কিত আলোচনাকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। এরিস্টটলের অধিবিদ্যার অনুসরণ এবং খ্রিস্ট ধর্মের সাথে যতটুকু খাপ খাওয়ানো যায় তিনি তাই করেন। তিনি তাঁর সত্তা সম্পর্কিত *Being and Essence* গ্রন্থে ঈশ্বরের সারসত্তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তবে রাসেলের মতে, তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ *Summa Contragentiles* যেখানে তিনি তাঁর সমস্ত দর্শনের মূলকথাগুলো সন্নিবেশিত করে প্রকাশ করেন।[৩] তবে *Summa Theologica* গ্রন্থে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে পাঁচটি যুক্তি প্রদান করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ইতিহাসে তা Five ways of St. Aquinas নামে পরিচিত। একুইনাসের আধিবিদ্যক আলোচনার ক্ষেত্রে এখানে আমি রাসেলের অনুসরণ করব। আমি প্রথমে *Summa Theologica* এর ঈশ্বরের অস্তিত্বের যুক্তি এবং এর পর *Summa Contragentiles* এর সারমর্ম সংক্ষেপে আলোচনা করব, যার মাধ্যমে আশা করছি তাঁর অধিবিদ্যা সম্পর্কে একটি চিত্র ফুটে উঠবে।

বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন, "একজন পাঠক যে মানদণ্ডে এরিস্টটলের দর্শন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করবেন সেই একই মানদণ্ডে তিনি একুইনাসের দর্শন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করবেন।"[৪]এজন্যই তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যে পাঁচটি যুক্তি দেন তা এরিস্টটলের অনুসরণ করেই দেন। *Summa Theologica* গ্রন্থটি চার খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রায় চার হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত। প্রশ্ন, আপত্তি, উত্তর- এই প্রক্রিয়ায় তিনি সম্পূর্ণ গ্রন্থটি রচনা করেন। প্রথম খণ্ডে আছে ১১৯টি প্রশ্ন, দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ৩০৩টি, তৃতীয় খণ্ডে ৯০টি, তৃতীয় খণ্ডের Suppliment আকারে আছে ৬৮টি এবং চতুর্থ খণ্ডে আছে ৯৯টি প্রশ্ন এবং Appendix আকারে আছে আরো ২টি প্রশ্ন। এসব প্রশ্নের উপর আপত্তি (Objection) এবং উত্তর (Reply) দিয়ে তিনি গ্রন্থটি সাজিয়েছেন। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর যে পাঁচটি যুক্তি দেন তা এসেছে প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রশ্নে (The Question of God's Existence.)

এই প্রশ্নের অধীনে আরো ৩টি প্রশ্ন হলো :

১. ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বতঃপ্রমাণিত কি না।

২. ঈশ্বর অস্তিত্বশীল-তা প্রমাণ করা যায় কি না।

৩. ঈশ্বর অস্তিত্বশীল কি না।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় প্রশ্নটির অধীনে তিনি দু'টি আপত্তি তুলে ধরেন যেখানে ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। প্রথমত, জগতে দুই প্রকার অসীম জিনিস থাকলে জগৎ ধ্বংস হয়ে যেত। অর্থাৎ ঈশ্বর হচ্ছেন অসীম ভালোত্ব, অন্যদিকে জগতে অশুভ সমানভাবে বিদ্যমান। যদি ঈশ্বর থাকতেন তাহলে অশুভ থাকত না। সুতরাং ঈশ্বর অস্তিত্বশীল নয়। দ্বিতীয়ত, জগতের সবকিছুর মূল কথা হলো প্রকৃতি এবং সমস্ত ঐচ্ছিক কাজের জন্য রয়েছে মানুষের বুদ্ধি সুতরাং এখানে ঈশ্বরের ধারণার প্রয়োজন নেই। একুইনাস তখন বলেন,"আমার জবাব হলো, পাঁচটি উপায়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যেতে পারে।"[৬]

প্রথম যুক্তিটি হচ্ছে গতির যুক্তি। তাঁর মতে, এটা নিশ্চিত ও প্রমাণিত যে, বিশ্ব জগতে কিছু জিনিস গতিশীল। কোনো কিছু যখন গতিশীল হয় তখন নিশ্চয় অন্য কারো দ্বারা তা গতিপ্রাপ্ত হয়। কারণ- কোনো কিছুই গতিশীল হতে পারে না যদি তার ভিতর গতি সৃষ্টিকারী কোনো সুপ্ত ক্ষমতা না থাকে। একটি জিনিস গতিপ্রাপ্ত হবে তখনই যখন তার ভিতর বাস্তবে কাজ করার সামর্থ থাকে। এটা সম্ভব নয় একটি জিনিস একই সময় বাস্তব এবং সুপ্ত ক্ষমতা সম্পন্ন হবে। যেমন কোনো কিছু গরম ও নয় গরম একই সময় ঘটতে পারে না। অর্থাৎ এটা অসম্ভব যে একটি জিনিস একই সময় গতি সৃষ্টিকারী (mover) এবং গতিশীল (moved) হবে। সুতরাং যখন কোনো কিছু গতিশীল হবে তা অন্য কারো মাধ্যমেই গতিশীল হবে। আবার সেই গতি সৃষ্টিকারীর পেছনেও আরেকজন গতি সৃষ্টিকারী থাকবে। কিন্তু এভাবে অসীমতার দিকে আমরা যেতে পারি না। তাই তিনি বলেন, "সুতরাং আদি সঞ্চালকে উপনীত হওয়া ছাড়া উপায় নেই,যা অন্য কারো দ্বারা সঞ্চালিত হয় না; একেই প্রত্যেকে ঈশ্বর বলে বুঝি।"[৭] একুইনাস একজন খ্রিস্টান ছিলেন বিধায় বিশ্বাস করতেন জগৎ অনন্তকাল থাকবে না। কিন্তু তারপর কী হবে, সেখানেও অসীমতার সমস্যা। এতেও প্রমাণিত হয় অনন্ত গতির জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনিবার্য। এই যুক্তিটি এরিস্টটলেরই সংস্করণ।

দ্বিতীয় যুক্তিটি ছিল কার্যকারণ ভিত্তিক। প্রাকৃতিক জগৎ পরিচালিত হচ্ছে কার্যকারণ নিয়মের আলোকে। সবকিছুর পেছনে একটি কারণ থাকে। সুতরাং আমাদের জানা বিশ্বজগতের সব কিছুর পেছনে একটি চূড়ান্ত ও অনিবার্য কারণ থাকতে হবে। আমরা সেই চূড়ান্ত কারণকে (final cause) ঈশ্বর বলি।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে তাঁর তৃতীয় যুক্তি হচ্ছে, সকল আবশ্যিকতার আদি উৎস হিসেবে একটি আদি আবশ্যকতা। এই যুক্তিটি দ্বিতীয় যুক্তির অনুরূপ। প্রাকৃতিক জগতে যা কিছু অস্তিত্বশীল সব কিছুর সূচনা হয়েছে আকস্মিকভাবে। এখন আমরা যদি বলি, এই আকস্মিকতার পেছনে একই আকস্মিকতা

বিদ্যমান তাহলে আমাদের সমস্যায় পড়তে হয়। একুইনাস দাবি করেন, তাহলে এমন এক সময় ছিল যখন কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। যদি তা সত্য হয় তাহলে বর্তমানেও কোনো কিছুর অস্তিত্ব হতো না। কারণ অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের সূচনা কী করে হবে? অথচ আমরা দেখছি অসংখ্য জিনিস অস্তিত্বশীল। এটা আমাদেরকে এই সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রাণিত করে যে, কোনো অনিবার্য অস্তিত্বের পেছনে আরেকটা অনিবার্য অস্তিত্ব আবশ্যক। সুতরাং আমাদের স্বীকার করতে হবে, একজন অনিবার্য আবশ্যক সত্তা হিসেবে ঈশ্বর অস্তিত্বশীল, যিনি সব কিছুর কারণ কিন্তু তাঁর কোনো কারণ নেই।

একুইনাসের চতুর্থ যুক্তিটি বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তির অনুরূপ। তাঁর মতে এ জগতে আমরা বিভিন্ন পূর্ণতা লক্ষ্য করি। এবং এই পূর্ণতার উৎস এমন কিছুর মধ্যে বিদ্যমান যা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ। আমরা জগতে যত গুণ দেখি যেমন, সত্য, ভালোত্ব ইত্যাদি সবই আংশিক বা অপূর্ণাঙ্গ। এসব গুণের এমন একটি কারণ অবশ্যই থাকবে যা সমস্ত গুণকে পূর্ণাঙ্গভাবে ধারণ করে আছে। প্লেটোর সাথে একুইনাসের এখানে মিল রয়েছে। যদিও প্লেটোকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বের জন্য তিনি প্লেটোর ধারণাতত্ত্বের অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেন, সর্বোচ্চ ভালোত্বের জন্য সর্বোচ্চ সত্তার অস্তিত্ব আবশ্যক। এই ধরনের একটি সম্পর্কের চিন্তাটা আমাদের নিকট সহজেই বোধগম্য হতে পারে। সুতরাং সত্য, ভালোত্ব এবং সমস্ত সত্তার একটি চূড়ান্ত উৎস অবশ্যই কোনো না কোনো ভাবে বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তির অন্তর্ভুক্ত যার মূল কথা একটি আদি কারণ এবং বিশ্ব জগতের সব কিছুর অস্তিত্বের চূড়ান্ত কারণ হিসেবে ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা।

একুইনাসের সর্বশেষ যুক্তিটি হচ্ছে 'teleological argument.'এই যুক্তিটিকে 'Design argument'ও বলা হয়। এই যুক্তির মূল কথা হলো জগতে আমরা যা দেখছি সবকিছুই একটি উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত। জগতের শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, গতি ইত্যাদি এক পূর্ণতার দিকে ধাবমান। একুইনাস বলেন, "এমন কোনো বুদ্ধিমান সত্তা অস্তিত্বশীল যার মাধ্যমে সমস্ত প্রাকৃতিক জিনিস তাদের পরিণতির দিকে চালিত হচ্ছে; আর এই সত্তাকেই আমরা ঈশ্বর বলি।"[৭]

Summa Contragentiles গ্রন্থের মূলকথা

বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে, এই গ্রন্থটিতেই তাঁর দার্শনিক আলোচনা এসেছে যথার্থভাবে। *Theologica* তিনি মূলত খ্রিস্টানদের জন্য লিখেছেন যেখানে যুক্তির চাইতে বিশ্বাসকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বাইবেলের সত্য গুলোকেই তিনি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে *Contragentiles* মানেই

হলো খ্রিস্টান বিরোধী। এখানে তিনি বিশেষত Pagan, মুসলিম এবং যারা অবিশ্বাসী তাদেরকে খ্রিস্টধর্মের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দার্শনিক যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। এই গ্রন্থটিও একটি বিশাল গ্রন্থ। প্রায় ৮শত পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের ৪টি খণ্ড। প্রথম খণ্ডে আছে ১০২টি অধ্যায় যার শিরোনাম 'ঈশ্বর'। দ্বিতীয় খণ্ডের শিরোনাম 'সৃষ্টি' (Creation) এবং এতে আছে ১০১টি অধ্যায়, তৃতীয় খণ্ডের নাম 'ঐশ্বরিক আদেশ' (Providence)যেখানে ১৬৩টি অধ্যায় আর চতুর্থ খণ্ডের নাম 'মুক্তি' (Salvation)যাতে সংযুক্ত হয়েছে ৯৭টি অধ্যায়।

এরিস্টটল তাঁর Metaphysics যেভাবে শুরু করেছেন একুইনাস সেভাবেই তাঁর এই গ্রন্থের সূচনা করেন। অর্থাৎ প্রথমত জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা। তাঁর প্রথম কথাটি হচ্ছে "তারাই জ্ঞানী বলে অভিহিত হবেন যারা সব জিনিসকে যথার্থভাবে সাজাতে এবং উত্তমভাবে সেগুলোর পরিচালনা করতে সক্ষম।"[৯] এই কথাটি The philosopher অর্থাৎ Aristotle এর অনুকরণে বলেছেন তাও তিনি অকপটে স্বীকার করেন। গ্রন্থটিতে এরিস্টটললের *Metaphysics, Physics, Posterior Analytics, On the Soul* সহ অনেক গ্রন্থের উদ্ধৃতি এসেছে। এবং প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে এই সংক্রান্ত বাইবেলের কথাটিও তিনি উদ্ধৃত করেন। জ্ঞানীর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি আরো বলেন, একটি জিনিস তখনই সবচেয়ে ভালহবে যখন তার সুন্দর সমাপ্তি ঘটবে। সুতরাং যিনি সমাপ্তি বা চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত তিনিই অধিকতর জ্ঞানী। বিজ্ঞানের এক একটি জ্ঞান পরস্পর নির্ভরশীল। যেমন, জাহাজ চালনা জ্ঞান নির্ভর করে জাহাজ নির্মাণের উপর। রণসজ্জার সাথে জড়িত রণশিল্প। আবার সকল শিল্পকে পরিচালনাকারী শিল্প হচ্ছে স্থাপত্য শিল্প (architecture)। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার পরিণতির জ্ঞান যার আছে তাকে তিনি জ্ঞানী বলে অভিহিত করেন। যেমন, একজন জ্ঞানী স্থপতি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানী ব্যক্তি তাকেই বলতে হবে যিনি বিশ্বজগতের পরিণতি (end) সম্পর্কে জানেন এবং এর সূচনা সম্পর্কেও জানেন। এভাবে তিনি প্রমাণ করেন আদিকারণ সম্পর্কে যার জ্ঞান আছে তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি বলেন, "প্রজ্ঞার অন্বেষণ হচ্ছে সবচেয়ে পূর্ণ, মহত্তম, উপকারী এবং আনন্দদায়ক"।[১০] এর পর কেন পূর্ণ, মহত্তম, উপকারী ও আনন্দদায়ক তার কারণ ব্যাখ্যা করেন। ক্যাথলিক বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি সত্যকে আবিষ্কার করতে চান। নবম অধ্যায়ে তিনি সব জিনিসের আদি নীতির (first principle) জ্ঞানকে ৩টি ভাগে ভাগ করেন। (১) ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান, (২) ঈশ্বরের সৃষ্টির জ্ঞান ও (৩) ঈশ্বরের সৃষ্টির শৃঙ্খলা, ঈশ্বরের অলৌকিকত্ব, মানব জাতির

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্য প্রভৃতির জ্ঞান। চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি বলেন, "সব দর্শনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের জ্ঞান। ঈশ্বর সম্পর্কিত যথার্থ ধারণা দেওয়া এবং একই সাথে অধিবিদ্যার কাজও ঐশ্বরিক জিনিস নিয়ে আলোচনা- এটাই দর্শনের সর্বশেষ শিক্ষা।"[১১]

তিনি বলেন, ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা যা বলি তা দু'ধরনের। কিছু আছে এমন যা মানব বুদ্ধির সীমার উর্ধ্বে, এগুলো বিশ্বাসের মাধ্যমেই জানতে হয়। যেমন ঈশ্বর হচ্ছেন তিন এর এক। কিন্তু কিছু বিষয় আছে যা স্বাভাবিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়। যেমন ঈশ্বর অস্তিত্বশীল, তিনি এক। এগুলো প্রাকৃতিক বুদ্ধির মাধ্যমে দার্শনিকগণ প্রমাণ করেন। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে তিনি বাইবেলের উদ্ধৃতি দেন " সাবধান, ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠ, এই বিষয়টি আমাদের সীমিত জ্ঞানের বাইরে।"[১২] তিনি প্রজ্ঞার সত্যকে খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের সত্যের সাথে সমন্বয় করেন। তিনি বলেন, স্বাভাবিকভাবে মানুষের প্রজ্ঞা যে নীতিমালা সম্পর্কে জানে সেগুলোকে বিশ্বাসের সত্য অসম্ভব বলতে পারে না।অবশ্যই এই কাজটি আনসেলম,অগাস্টিনসহ অন্যান্য স্কলাস্টিক দার্শনিকগণও করেছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তিনি বলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বত:প্রমাণিত বিষয়। তবুও যুক্তির মাধ্যমে তা প্রমাণ করা যায়। এক্ষেত্রে তিনি এরিস্টটলের অনুসরণে ৩টি যুক্তি প্রদান করেন; অচালিত চালকের যুক্তি, কার্যকারণ ভিত্তিক যুক্তি ও বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তি। এ বিষয়ে আমরা *Summa Theologica* এর আলোচনায় ব্যাখ্যা করেছি। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের পর তিনি ১৫তম অধ্যায় থেকে ১০১ অধ্যায় পর্যন্ত ঈশ্বরের গুণ নিয়েই মোটামুটি আলোচনা করেন। তিনি বলেন ঈশ্বরের গুণ সম্পর্কে আমরা যথাযথভাবে জানতে পারি না। তবে তিনি কী নয় সেটা বিশ্লেষণ করে আমরা একটা ধারণা নিতে পারি। এই পদ্ধতিকে তিনি নাম দেন, "Method of Remotion."[১৩] ঈশ্বরের গুণ সম্পর্কে তিনি বলেন,

> ঈশ্বর চিরন্তন, যেহেতু আমরা দেখছি প্রতিটি জিনিসের অস্তিত্ব এসেছে গতি ও পরিবর্তনের মাধ্যমে। তাই ঈশ্বরকে গতির উর্ধ্বে আদি ও অন্তহীন সত্তা রূপে বিশ্বাস করতে হবে।[১৪]

তাঁর মতে,যদি এটা সত্য হত যে, তিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছেন তাহলে তাকে কেউ অসত্তা থেকে সত্তায় পরিণত করেছে। কিন্তু তিনি *Theologica*য় দেখিয়েছেন ঈশ্বর আদি কারণ, তাঁর শুরু ও শেষ নেই। সুতরাং তিনি চিরন্তন। আবার প্রতিটি আবশ্যিকতার পেছনে আরেকটি আবশ্যিকতার প্রয়োজন এ হিসেবেও তিনি চিরন্তন।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর মতে,ঈশ্বরের মধ্যে কোনো নিষ্ক্রিয় শক্তি নেই। তিনি সব কিছুর উপর শক্তি প্রয়োগের সামর্থ রাখেন। কিন্তু কেউ তাঁর উপর শক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। এরিস্টটল অনুসারে তিনি বলেন, " ঈশ্বর-এর মধ্যে কোনো উপাদান কারণ (material cause) নেই। যেহেতু ঈশ্বর সব কিছুর পরিণতি কারণ তাই তার মধ্যে কোনো উপাদান(matter) নেই।"[১৫] একুইনাস এরিস্টটলের অনুসারী হওয়ায় এরিস্টটলের কারণতত্ত্ব এখানে নিয়ে আসেন; আবার একজন ক্যাথলিক ধর্মগুরু হওয়ায় তিনি মনে করেন, ঈশ্বরের কোনো অংশ নেই। তিনি একক। তাঁর ভিতর সুপ্ত শক্তি ও কাজ করার শক্তি দু'টি একসঙ্গে বিদ্যমান। প্রতিটি বিভক্ত কাজ আরেকটি কাজের মাধ্যমে পূর্ণ হয়। ঈশ্বরের মধ্যে তা থাকলে তিনি অপূর্ণাঙ্গ হতেন। এটা অসম্ভব। ঈশ্বরের মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিংবা নিষ্ঠুরতা নেই। ঈশ্বর কোনো দেহের অধিকারী নন। কারণ দেহের বিভিন্ন অংশ থাকে যা একে অপরের পরিপূরক। তাঁর মধ্যে কোনো বিভাজন নেই। সুতরাং তাঁর দেহ নেই। প্রতিটি দেহ সসীম কিন্তু ঈশ্বর অসীম।[১৬]

একুইনাস ঈশ্বরকে এরিস্টটলের মতই সারসত্তার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেন। তিনি মনে করেন,ঈশ্বর নিজেই তাঁর সারসত্তা (essence)। তাঁর সত্তা ও সারসত্তা একই জিনিস। প্রতিটি জিনিস তাঁর সত্তার (Being) মাধ্যমে অস্তিত্বশীল হয়। কোনো জিনিসের সত্তাপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য অনিবার্য সত্তার প্রয়োজন কিন্তু ঈশ্বর নিজেই নিজের মাধ্যম সত্তাপ্রাপ্ত। তাই তিনিই তাঁর সারসত্তা ও সত্তা। ঈশ্বরের কোনো জাতি নেই। প্রতিটি জিনিসের একটি জাতি বা প্রজাতি থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের কোনো জাতি বা প্রজাতি নেই। বরং তিনি নিজেই তাঁর জাতি। ঈশ্বরের সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি পূর্ণাঙ্গ। তাঁর সত্তা সর্বজনীনভাবে পূর্ণাঙ্গ সত্তা। প্রতিটি সৌন্দর্যের মূলে আরেকটি সৌন্দর্য আছে। আর এজন্যই কোনো পূর্ণ জিনিস সঠিক অর্থে পূর্ণ নয়। একমাত্র ঈশ্বরই সমস্ত সৌন্দর্য, চমৎকারিত্বের পূণতর্ম কেন্দ্র।[১৭] তিনি পরম শুভ। তাঁর ভিতর কোনো মন্দ নেই। শুভ-র প্রকৃতি হলো পূর্ণতা আর evil বা মন্দের প্রকৃতি অপূর্ণতা। ঈশ্বর যেহেতু পূর্ণ সত্তা, তাই তাঁর মধ্যে অশুভ বা অপূর্ণ কিছু থাকতে পারে না।[১৮] ঈশ্বরকে তিনের এক বলে বিশ্বাস করলেও এখানে তিনি বারবার প্রমাণ করেন ঈশ্বর একজন। সব জিনিসের আদি উৎস তিনি। তিনি এক না হলে সব কিছুর উৎস হতে পারতেন না।[১৯] একুইনাস ঈশ্বরকেই সর্বজ্ঞাতা ও সর্বদ্রষ্টা বলে বিশ্বাস করেন। তাই তাঁর বক্তব্য হলো, প্রাথমিক ও অনিবার্যভাবে ঈশ্বর কেবল নিজেকে জানেন। তিনি সবকিছু জানেন তাঁর নিজের মত। প্রতিটি জিনিসের যথার্থ জ্ঞান তাঁর রয়েছে।[২০] ঈশ্বর সব জিনিসকে একই সময় উপলব্ধি করেন। অর্থাৎ ঈশ্বর যেহেতু একজন তাই সব জিনিস সম্পর্কে তাকে একই সময় জানতে হবে। এটা তাঁর সারসত্তা (essence)। আবার যেহেতু সব জিনিসের উপর ঐশ্বরিক দৃষ্টি আছে তাই এগুলো অবশ্যই একক ইচ্ছার অধীন। এভাবে ঈশ্বর সব জিনিসকেই একসাথে দেখেন।

Dhaka University Institutional Repository

[২১] ঈশ্বরের জ্ঞান কোনো অভ্যাস নয়, তাঁর জ্ঞানে কোনো ধরনের অসংলগ্নতা নেই। ঈশ্বর হচ্ছেন পরম সত্য। তিনি বিশুদ্ধতম সত্য। মানুষের জ্ঞান অন্য বস্তুর মাধ্যমে হয় তাই অসম্পূর্ণ এবং সেজন্য তার সত্যও পূর্ণাঙ্গ নয়। অন্যদিকে ঈশ্বর যেহেতু সব কিছুকে একই সময় দেখেন ও জানেন তাই তাঁর সত্য হচ্ছে চূড়ান্ত ও পরম সত্য। তিনি পরম সত্যের অধিকারী; কারণ তিনি নিজেই পরম সত্য।[২২] ৬৩তম অধ্যায়ে একুইনাস ঈশ্বর বিশেষ বস্তুকে জানেন না এমন মন্তব্য যাঁরা করেন তাঁদের ৭টি মত উল্লেখ করে সেগুলো খণ্ডন করেন। যেমন,

ক. বিশেষ বস্তু উদ্দেশ্যমূলক হওয়ার কারণে অজড় কোনো কিছুই একে জানতে পারে না।

খ. বিশেষ বস্তু সবসময় অস্তিত্বশীল থাকে না। তাই ঈশ্বর সব সময় তা জানেন না।

গ. বিশেষ বস্তু সম্ভাব্য, আবশ্যিক নয়। তাই অস্তিত্বশীল না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত জ্ঞান সম্ভব নয়।

ঘ. কিছু বিশেষ বস্তু আমাদের ইচ্ছার ফলেই উদ্ভব হয়। শুধু ইচ্ছাকারী ব্যক্তিই এরূপ বিশেষ বস্তুকে জানতে পারে।

ঙ. বিশেষ বস্তু অসংখ্য ও অনন্ত আর অনন্ত বস্তুকে জানা যায় না।

চ. ঈশ্বরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে বিশেষ বস্তু অতি সামান্য।

ছ. কিছু বিশেষ বস্তুর মধ্যে অশুভ বিদ্যমান। ঈশ্বর অশুভকে জানতে পারেন না।[২২(ক)]

একুইনাস এসব সমস্যার সমাধান ৬৫-৭১ অধ্যায় পর্যন্ত আলোচনা করেন। এসব আলোচনার মূল কথা রাসেলের ভাষায়,

> উপর্যুক্ত সাতটি যুক্তির উত্তরে একুইনাস বলেন, ঈশ্বর বিশেষের কারণ,তাই তিনি তাদের জানেন। যে সকল বস্তু এখনো উদ্ভব হয় নি তিনি তাদের সম্পর্কেও জানেন। কোনো বস্তু নির্মাণের পূর্বে সেই বস্তু সম্পর্কে শিল্পীর যেমন জ্ঞান থাকে,ঈশ্বরেরও সেরূপ জ্ঞান আছে। তিনি ভবিষ্যৎ ঘটনা জানেন। কারণ প্রতিটি কালিক বস্তুকেই তিনি বর্তমান রূপে দেখতে পান। কিন্তু তিনি স্বয়ং কালের মধ্যে নন। তিনি আমাদের মন এবং আমাদের গুপ্ত ইচ্ছার কথাও জানেন। তিনি বস্তুর অসীমতা সম্পর্কেও জানেন,যদিও আমরা তা জানতে পারি না। তিনি অতি তুচ্ছ বস্তু সম্পর্কেও জানেন। কারণ সব বস্তু সম্পূর্ণরূপে তুচ্ছ নয়,এবং প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই মহান কিছু থাকে। অন্যথায় ঈশ্বর শুধু নিজেকেই জানবেন। অধিকন্তু বিশ্বের শৃঙ্খলা অত্যন্ত চমৎকার, এবং বিশ্বের তুচ্ছ অংশগুলো না জেনে বিশ্বের এই চমৎকারিত্ব সম্পর্কে জানা যায় না। পরিশেষে,ঈশ্বর অশুভ বিষয় সম্পর্কেও জানেন। কারণ শুভ কোনো কিছু জানার মধ্যেই অশুভের বিপরীত বিষয়কে জানা যায়।[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

এরপর একুইনাস বলেন, ঈশ্বরের মধ্যে ইচ্ছা শক্তি বিদ্যমান। তিনি নিজেই জ্ঞান সুতরাং তিনি অবশ্যই ইচ্ছা শক্তির অধিকারী। শুধু তাই নয় বরং ইচ্ছা শক্তিই তাঁর সারসত্তা। ৭২-৮৮ অধ্যায় পর্যন্ত তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা নিয়ে আলোচনা করেন। ঐশী ইচ্ছার প্রধান উদ্দেশ্য ঐশী সারসত্তা। তিনি অন্যসব জিনিসের উপর একক ইচ্ছা দ্বারা কর্তৃত্ব করেন। তাঁর ইচ্ছার বহুমুখিতার কারণে তাঁর সরলতা ও একত্বের মধ্যে কোনো বিরোধ সৃষ্টি হয় না। এমনকি যে সব জিনিসের এখনো অস্তিত্ব ঘটে নি সেসব বিষয়ের উপরও তার ইচ্ছা শক্তি বিদ্যমান। নিজস্ব সত্তা ও ভালোত্বের কারণেই তিনি ইচ্ছা করেন। তবে তাঁর ইচ্ছা কোনো আবশ্যিক নয়। তিনি স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অধিকারী। তাঁর ইচ্ছার জন্য যুক্তি প্রয়োগ করা যায় কারণ ব্যবহার করা যায় না। অসম্ভব জিনিসের ব্যাপারে তিনি ইচ্ছা করেন না। যেমন, তিনি সত্যকে মিথ্যা বলেন না। ৮৯তম অধ্যায়ে তিনি বলেন, ঈশ্বরের মধ্যে কোনো কিছুর প্রতি তৃষ্ণা বা ক্ষুধার আকাঙ্ক্ষা নেই। কারণ যদি এমন কিছু থাকত তাহলে তাঁকে দৈহিক আকার ধারণ করতে হত এবং তা হত অন্য জিনিসের প্রতিরূপ। সুতরাং এটা অসম্ভব।

৯০-৯৫তম অধ্যায়ে তিনি ঈশ্বরের পূর্ণতা, নৈতিকতার আদর্শ প্রভৃতি বিষয়ের ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, কিছু আকাঙ্ক্ষা আছে যেগুলো ঈশ্বরের জন্য উপযুক্ত না হলেও ঐশ্বরিক পূর্ণতার জন্য অপ্রাসঙ্গিক নয়। যেমন, আনন্দ ও ভালোবাসা। ঈশ্বর যেহেতু সর্বোচ্চ পূর্ণ সত্তা তাই এই গুণ অবশ্যই থাকবে। তিনি নিজেকে এবং অন্যসব জিনিসকে ভালোবাসেন। যত প্রকার সদগুণ আছে তার সবকটি তাঁর মধ্যে আছে এবং পূর্ণতম আকারে আছে। তাঁর গুণ তাঁর অভ্যাস নয়; সারসত্তা। অভ্যাস অপূর্ণাঙ্গ তাই এটা ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হতে পারে না। সমস্ত নৈতিক গুণের আধার তিনি। তাঁর মধ্যে আছে চিন্তা বা ধ্যানমূলক সদগুণ। তিনি মন্দ ইচ্ছা করতে পারেন না। কোনো কিছুকেই তিনি ঘৃণা করেন না। অনিবার্যভাবে ঈশ্বর জীবন্ত সত্তা। কারণ তিনি উপলব্ধি করেন ও ইচ্ছা করেন। আর এ দু'টি কাজ জীবন্ত সত্তাই কেবল করতে পারে। তাঁর জীবন তাঁর মাধ্যমেই এসেছে, অন্য সব জীবন্ত প্রাণি তাঁর মাধ্যমে এসেছে। ঈশ্বরের জীবন চিরস্থায়ী। ঈশ্বর পরম পবিত্র, তাঁর মধ্যে অপবিত্র কিছু নেই। সর্বোচ্চ বুদ্ধি দিয়ে তিনি সব কিছু উপলব্ধি করেন এবং এতে তাঁর কোনো সমস্যা হয় না। এজন্যই তিনি পবিত্র। ১০১ তম খণ্ডের শিরোনাম হলো: "ঈশ্বরের বিশুদ্ধ ও অনন্য দয়া অন্য সব দয়ার উর্ধ্বে।" এখানে তিনি ঈশ্বরের দয়া অনুগ্রহ,ভালোবাসা প্রভৃতির আলোচনা করেন।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড 'সৃষ্টি' (Creation) নিয়ে। তাঁর মতে সৃষ্টি জগতের চিন্তা ঐশ্বরিক বিশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়। ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে অনুধ্যান আমাদেরকে তাঁর প্রজ্ঞার সাথে, তাঁর অসীম শক্তি ও ক্ষমতার সাথে, আমাদের আত্মাকে ঈশ্বরের শুভত্বের ভালোবাসার সাথে পরিচিত করে,

ঈশ্বরের পূর্ণতার নির্দেশ করে। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস তৈরিতে সৃষ্টিজগতের চিন্তা প্রমাণিত সত্য। এভাবে চিন্তা করলে ঈশ্বর সম্পর্কে ভুল ধারণাও দূর হয়। তিনি বলেন, "দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদদের মধ্যে সৃষ্টিজগৎ নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে। দার্শনিকদের কেউ বলেন, জগৎ আগুন থেকে, কেউ বলেন মাটি থেকে, কিন্তু ধর্মতত্ত্ববিদদের মতে ঈশ্বর শূন্য থেকে জগৎ সৃষ্টি করেন।"[২৪] তাঁর মতে, সৃষ্টিজগতের মাধ্যমেই ঈশ্বরকে চেনা যায়। সমস্ত উত্তাপের কারণ যেমন আগুন তেমনি সৃষ্টি জগতের কারণ ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরের কোনো কারণ নেই। তিনি নিজেই তাঁর essence বা সার সত্তা কিংবা being. কোনো মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই। সৃষ্টির কাজটি শুধুমাত্র ঈশ্বরের।[২৫] ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি প্রাকৃতিক নিয়মের ভিতরেই সৃষ্টি করেন। আত্মা বিহীন মানুষ তিনি সৃষ্টি করতে পারেন না। তিনি যা করেন তার জন্য কোনো মডেল বা নমুনা নেই, তাঁর প্রজ্ঞাই সব। তাঁর মতে,আমরা শূন্য থেকে কিছুই আবিষ্কার করতে পারি না। আমরা বলতে বাধ্য প্রতিটি জিনিসই ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল কিন্তু তিনি কারো উপর নির্ভর করেন না। সৃষ্টিজগৎ সবসময় অস্তিত্বশীল থাকবে এটা আবশ্যক নয়। ৩২-৩৮তম অধ্যায়ে যারা সৃষ্টি জগৎকে চিরন্তন বলেন তাদের বিরুদ্ধে তিনি যুক্তি দেন। তাঁর মতে সৃষ্টি জগৎকে চিরন্তন বললে ঈশ্বরের অনুরূপ হয়ে পড়ে। অথচ ঈশ্বর এগুলো সৃষ্টি করেন। কোনো অসত্তা অস্তিত্বশীল হতে পারে না।

৪৭-৫৩ অধ্যায়ে একুইনাস আত্মা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। মানুষের আত্মাকে তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করেন। এরিস্টটলের *Ethics* গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, আত্মা দেহের সাথে যুক্ত। দেহের প্রতিটি অংশেই সমগ্র আত্মা বিদ্যমান। মানুষের আত্মা অমর কিন্তু মানবেতর প্রাণির আত্মা অমর নয়। মানুষের আত্মা তার কাজের জন্য দায়ী। আত্মাকে স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্লেটোর সমালোচনা করে তিনি বলেন, প্লেটো আত্মাকে দেহ থেকে পৃথক মনে করতেন। যেমন একটি জাহাজে একজন নাবিক থাকেন। কিন্তু এটা সঠিক নয়। একজন মানুষের কেবল একটি আত্মাই থাকতে পারে। কিন্তু একটি জাহাজের অনেক নাবিক থাকতে পারে। কিন্তু একজনের মধ্যে ভীতি, ক্রোধ, সংবেদন ইত্যাদি ঘটলেও তা একটি দেহের মধ্যেই ঘটে। আত্মাকে পৃথক করলে প্রতিটি ঘটনার জন্য পৃথক পৃথক সত্তা প্রয়োজন। তাই প্রমাণিত হয়- একটি আত্মা একটি দেহের সাথে যুক্ত থাকে। এরিস্টটল অনুসারে তিনি বলেন আত্মা হচ্ছে দেহের আকার (form)। আলেকজান্ডার, গ্যালেন প্রমুখের আত্মা সম্পর্কিত ধারণা বাতিল করে তিনি বলেন, কোনো ধরনের মাধ্যম ছাড়াই আত্মা ও দেহ সংযুক্ত থাকে। ৭৩ অধ্যায়ে তিনি ইবনে রুশদের ধারণার জবাব দেন, তাঁর মত ছিল এক বুদ্ধি সব মানুষের মধ্যে বিদ্যমান, এ কথা সঠিক নয়। কারণ শুক্রাণুর সাথে আত্মা সঞ্চারিত হয় না। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আত্মা নতুনভাবে সৃষ্টি করা হয়। ৭৪ অধ্যায়ে তিনি ইবনে সিনার মত খণ্ডন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে সিনার মত ছিল এরিস্টটল-বিরোধী: মানুষের আত্মা উচ্চতর কর্তার (agent) কাছে স্খলন করে। তাঁর মতে এটা সঠিক নয়। কারণ আত্মা ঈশ্বরের Substance এর কোনো অংশ নয়।

গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের শিরোনাম 'ঐশ্বরিক আদেশ'(Providence)। এই অংশে নৈতিকতার আলোচনার উপর তিনি জোর দেন। তিনি বলেন প্রতিটি জীবই একটি চিরন্তন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। আর সেই উদ্দেশ্য হলো শুভ। প্রতিটি সৃষ্টজীব এই শুভের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। অশুভ কোনো সৃষ্টির গন্তব্য নয়। অশুভের কোনো সারসত্তা নেই। কোনো মানুষের ডানা নেই এটা অশুভ নয়। আকর্ষণীয় চুল নেই এটাও অশুভ নয়। কিন্তু স্খলন বলা হবে তার হাত নেই তখন সেটা হবে অশুভ। এর অর্থ মানুষের মধ্যে যা থাকার কথা বা থাকা উচিত সেটা না থাকাই হলো অশুভ। পিথাগোরাসের মত ছিল ভালও মন্দ দুটি জিনিসই আদি নীতিমালা। এরিস্টটলও তাই মনে করতেন। একুইনাস বলেন, যদিও এরিস্টটল এটা স্বীকার করেন, তবে এর কারণ হিসেবে এরিস্টটল প্রচলিত মতের উদ্ধৃতি দেন। প্রকৃতপক্ষে ভালোই হচ্ছে মন্দের কারণ। মন্দের যেহেতু কোনো সারসত্তা নেই তাই এগুলো ভালোর উপরই নির্ভরশীল। অশুভ কখনো শুভকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করতে পারে না। 'অশুভ' এর সর্বোচ্চ স্তর নেই, যেখান থেকে অন্যান্য অশুভ বা মন্দ উৎসারিত হবে।

২৭তম অধ্যায়ে তিনি বলেন, মানুষের প্রকৃত সুখ দৈহিক আনন্দের মধ্যেই থাকে না যা খাবার পানীয় ও যৌনক্রিয়ার মধ্যে প্রধানত পাওয়া যায়। পরম সুখ (felicity) সম্মানের মধ্যেও নেই। গৌরবে, সম্পদে, পার্থিব ক্ষমতায়, দৈহিক স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য-শক্তিতে, দূরদর্শিতা, শৈল্পিক কাজ- এসবের কোনোটির মধ্যেই পরম সুখ নেই। পরম সুখ কেবল ঈশ্বরের অনুধ্যানে। অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কে যা জানে তাতেও পরম সুখ নেই। প্রমাণ দ্বারা প্রাপ্ত ঈশ্বরের জ্ঞানেও নেই, বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানেও পরম সুখ সম্ভব নয়। প্রকৃত পক্ষে পার্থিব জীবনে ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা পূর্ণরূপে জানতে পারি না, তাই এখানে পরম সুখ সম্ভব নয়। এই জীবনে আমরা ঈশ্বরকে তার সারসত্তাসহ দেখতে পারি না। কেউ প্রাকৃতিক শক্তির মাধমে ঈশ্বরকে দেখতে পারে না।

৫৪তম অধ্যায়ে তিনি বলেন, ঈশ্বর সবকিছুর উপর কর্তৃত্ব করেন তাঁর Providence বা ঐশ্বরিক আদেশের মাধ্যমে। এটাই ছিল এই খণ্ডের মূল শিরোনাম। তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতার বাইরে কেউ কিছু করতে পারে না। তিনি সর্বত্র আছেন। ঐশ্বরিক বিধান সম্পূর্ণরূপে অশুভকে বর্জন করে না, সম্ভাব্যতা, ইচ্ছার স্বাধীনতা, ভাগ্য ও সুযোগকেও বাতিল করে দেয় না। ঐশ্বরিক বিধান পরনির্ভরশীল সকল বিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ঐশ্বরিক বিধানের পরিপূর্ণতা ঘটে গৌণ কারণ সমুহের মাধ্যমে।

অন্যসব সৃষ্টিজগতের উপর ঈশ্বর-বিধান চলে বুদ্ধিমান সৃষ্টি (intellectual creatures) দ্বারা। অর্থাৎ যা অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরের সেগুলোর উপর উচ্চতর প্রাণির কর্তৃত্বের মাধ্যমে ঐশ্বরিক বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এ ক্ষেত্রে ফেরেশতা (দেবদূত) সৃষ্টি করে সার্বিক শৃঙখলার কাজে নিযুক্ত করেন। এদের মাধ্যমেই ঈশ্বর জগৎ পরিচালনা করেন। মানুষের কর্ম ও ইচ্ছার স্বাধীনতা ঐশ্বরিক বিধানের অধীন। ৯৩তম অধ্যায়ে- তিনি ভাগ্য সম্পর্কে বলেন। ভাগ্যকে অস্বীকার করা মানেই ঐশ্বরিক বিধানকে অস্বীকার করা। ঐশ্বরিক বিধানের মধ্যে কোনো অনিশ্চয়তা নেই। ঐশ্বরিক বিধানের অপরিবর্তনীয়তা আবার প্রার্থনার মূল্যকে কমিয়ে দেয় না বা বাতিল করে না। কিছু প্রার্থনা ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিতও নয়। তবে ঈশ্বর প্রকৃতির বিরোধী কিছুই করেন না।

১০১ তম অধ্যায়ে তিনি 'Miracle' বা অলৌকিকত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন,"বস্তু-জগতের সাধারণ প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বাইরে যে সব জিনিস বিশেষ সময়ে ঐশ্বরিক ভাবে সম্পন্ন হয়, সেগুলোই অলৌকিক ঘটনা।"[২৬] আমরা কিছু জিনিস দেখে আশ্চর্য হই; এর কারণ খুঁজে পাই না। এগুলোই অলৌকিক। এই কাজগুলো ঈশ্বরই কেবল ঘটান, এখানে অন্য কেউ অংশগ্রহণ করতে পারে না। কোনো সৃষ্টিই প্রাকৃতিক বিধানের ব্যতিক্রম করতে পারে না কিন্তু তিনি ছাড়া। অন্যদিকে যাদুকরগণ (magician) বিভিন্ন আশ্চর্যজনক কাজ দেখান। এগুলো অলৌকিক নয়। যাদুকরদের মাধ্যমে সুখ পাওয়ার চেষ্টাকে তিনি অশুভ বলেন। শয়তান (demon) প্রসঙ্গে বলেন, এরাই পাপ সংঘটিত হতে সাহায্য করে। তাঁর মতে, ঐশ্বরিক বিধানের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা। ঐশ্বরিক আদেশই আমাদেরকে প্রতিবেশির সাথে ভালোবাসতে বলে। এর মাধ্যমেই মানুষ সঠিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে পারে।

১২২তম অধ্যায়ে তিনি ব্যভিচার ও বিবাহ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁর মতে,ব্যভিচার পাপ ও বিবাহ প্রাকৃতিক। যারা মনে করে একজন পুরুষ অন্য একজন অবিবাহিত নারীর সাথে তার সম্মতিক্রমে মিলন বৈধ তা কোনো ভাবেই সঠিক নয়। কারণ ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে তার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শুভ পন্থা নির্ধারণ করেছেন। আর এ ধরনের কাজ কোনো ব্যক্তির জন্য শুভ নয়। একমাত্র বিবাহের মাধ্যমেই নারী পুরুষের মিলন হতে পারে। এটাই প্রাকৃতিক। যদি বিবাহ ছাড়া মিলন হয় তাহলে সন্তানের পিতৃত্ব নিয়েও সমস্যা হতে পারে। যা অন্যান্য পশু, যেমন কুকুর, বিড়াল, ছাগল ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নয়। বিবাহ একটি স্থায়ী সম্পর্ক এবং বিবাহ একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যেই হবে। সন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে পিতার ভূমিকাকে তিনি বেশি গুরুত্ব দেন। একজন স্ত্রীকে তিনি স্বামীর অধীন মনে করেন , তবে সে লক্ষ্য হবে বন্ধুত্বপূর্ণ। নিকটাত্মীয়ের সাথে বিবাহ অনুচিত। সমস্ত যৌন মিলন পাপ কার্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

স্বেচ্ছা দারিদ্র্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দারিদ্র্য পাপের উপলক্ষ্য। মধ্যম পন্থার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। তবুও কেউ স্বেচ্ছায় সেটা অবলম্বন করলে কল্যাণ আছে যদি এর মাধ্যমে পাপ থেকে বাঁচা যায় (১৩২-৩৩ অধ্যায়)। তবে সম্পূর্ণরূপে এই সংযম অবলম্বন ভালনয়(১৩৬) এবং জীবনব্যাপী এটা অবলম্বন ভ্রান্ত কাজ। মানুষের কাজের শাস্তি বা পুরস্কার ঈশ্বরই দিবেন। এখানে তিনি ঈশ্বরের বিভিন্ন শাস্তির কথা বলেন এবং তাঁর মতে, সব শাস্তি ও পুরস্কার সমান নয়। আবার মানুষের সুখের জন্য ঐশ্বরিক সাহায্য প্রয়োজন। কেউ যদি পাপের কারণে ঈশ্বরের করুণা বঞ্চিত হয়, ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে করুণা প্রাপ্তও হতে পারে। একমাত্র করুণা প্রাপ্তি ছাড়া কেউ পাপ মুক্ত হতে পারে না। ঈশ্বর মানুষের পাপের কারণ নন।

চতুর্থ খণ্ড আলোচিত হয়েছে মুক্তি (Salvation) সম্পর্কে। এই অংশে তিনি মূলত খ্রিস্টান ধর্মের মূলনীতিগুলো যুক্তি দিয়ে উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। ঈশ্বরের ত্রিত্ব, আদি পাপ, পবিত্র আত্মা, প্রভৃতির আলোচনা এখানে এসেছে। আদি পাপ কীভাবে একজন থেকে অন্য জনে সঞ্চারিত হয়, ব্যাপ্টিজম, পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মা (Father, the Son, the Holy Spirit) পুনরুত্থান ও শেষ বিদায় নিয়েও তিনি এখানে আলোচনা করেন। শাস্তিভোগ ও প্রতিদান কীভাবে সম্ভব তা নিয়েও তিনি এখানে বর্ণনা দেন। তাঁর মতে পাপাত্মা মুক্তি পাবে না।

পর্যালোচনা

একুইনাসের দর্শন সহজ কথায় এরিস্টটলের নতুন সংস্করণ। বার্ট্রান্ড রাসেল[২৭] মনে করেন, একুইনাস সক্রেটিস- প্লেটোর মত যুক্তির অনুসরণ করেন নি এবং যুক্তি অনুসরণ করে যে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বাইবেলের বিশ্বাসকেই দর্শনে স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাছাড়া একুইনাস শিশু শিক্ষার জন্য মাতার চেয়ে পিতার ভূমিকাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে যে মত দেন, রাসেল সেটারও সমালোচনা করেন।[২৮] পিতার শারীরিক শক্তি বেশি, সেজন্য সন্তানকে শাস্তি দেওয়া ও শাসন করার ক্ষেত্রে পিতার ভূমিকার প্রশংসা করেছিলেন একুইনাস। কিন্তু রাসেল মনে করেন এটা ছিল ভুল ধারণা। রাসেল বলেন, যে ধরনের শাস্তিতে অধিক শারীরিক শক্তির প্রয়োজন হয়, সে ধরনের শাস্তি শিশুর জন্য কাম্য নয়। একুইনাস খুব স্বল্প সময় জীবিত ছিলেন। এই অল্প সময়ে তাঁর জ্ঞানের পরিপক্কতা আসে নি বলেও কেউ কেউ মনে করেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসকেই যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

একুইনাসকে রাসেল আবার কান্ট-হেগেলের চেয়ে বেশি প্রভাবশালী মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে একুইনাস ছিলেন প্রচণ্ড মেধা শক্তির অধিকারী। তাঁকে অনুসরণকারী খ্রিস্টান দার্শনিকদের টমিস্ট বলা হয়। এরিস্টটলের বিভিন্ন পুস্তক অনুবাদ করে সেগুলোর উপর টীকা লেখা তাঁর মৌলিক অবদান। তাঁর পূর্বসূরি অগাস্টিনের মত তিনিও একনিষ্ঠ খ্রিস্টান ছিলেন। কিন্তু পার্থক্য হল অগাস্টিন প্লেটোকে সবচে বড় দার্শনিক বলেন আর একুইনাস বলেন এরিস্টটলকে। উভয়ের অবদানই দর্শনে বিরাট। তাঁর অধিবিদ্যা সংক্রান্ত মতগুলো ধর্মের সাথে সমন্বিতরূপে আসলেও তিনি দর্শনকে দেখেছেন উচ্চতর বিদ্যা হিসেবে। দর্শন মানুষকে ধর্ম থেকে দূরে সরায় না বরং আরো একনিষ্ঠ করে তোলে তাই তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩. ব্রাডলি

সমকালীন দর্শনের ইতিহাসে এফ.এইচ. ব্রাডলি[১] (১৮৪৬-১৯২৪) একটি বিখ্যাত নাম ।প্রচণ্ড জড়বাদী দর্শনের যুগে তিনি ভাববাদের পক্ষে যে জোরালো ভূমিকা রাখেন তা ছিল রীতিমত দুঃসাহসিক কাজ। বৃটিশ চিন্তাধারায় তিনি খ্যাতির উচ্চ শিখরে আরোহন করেন। ব্রাডলির জন্ম ৩০ জানুয়ারি ১৮৪৬ সালে লন্ডনের ক্লাফামে ।পিতা চার্লস ব্রাডলি ও মাতা ঈ'মা লিন্টনের চতুর্থ এবং জীবিত জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন এফ.এইচ. ব্রাডলি। পিতা চার্লস ব্রাডলির সাথে তৎকালীন বৃটিশ রাজবংশের সম্পর্কের সুবাদে ঔপনিবেশিক শাসনামলে একসময় তিনি বাংলার গর্ভনর জেনারেল ছিলেন, তাছাড়া সিয়েরালিওনের গর্ভনর হিসেবেও ছিলেন কিছু দিন। তৎকালীন বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য এবং ঔপনিবেশিক কার্যক্রমের স্থায়ী প্রধানও ছিলেন চার্লস ব্রাডলি।

১৮৫৬ সালে এফ.এইচ. ব্রাডলি শেলটেনহাম কলেজে ভর্তি হন। ১৮৬১ সালে Marlborough College এ স্থানান্তরিত হন। ১৮৬২-৬৩ সালে তিনি মারাত্মক টাইফয়েড ও পরে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। ১৮৬৫ সালে একজন গবেষক হিসেবে তিনি অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি কলেজে যোগদান করেন। সেখানে বিখ্যাত প্লেটো পণ্ডিত এ.ই. টেইলর তরুণ ব্রাডলিকে দেখে অত্যন্ত আশান্বিত হন। কয়েকবার চেষ্টার পর ১৮৭০ সালে তিনি অক্সফোর্ডের Metron College এর ফেলোশিপ লাভ করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এখানেই তিনি কাটিয়ে দেন। ১৮৭১ সালের জুনে তিনি কিডনি সমস্যা, ঠাণ্ডাজনিত রোগ প্রভৃতি কারণে কিছুদিন অবসর জীবন যাপন করেন। এরপর আবার তিনি তাঁর কর্মস্থলে যোগদান করেন, তবে মানুষের সাথে সংস্পর্শ একেবারে কমিয়ে দেন। কলিংউড তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন, "আমি ব্রাডলির মাত্র কয়েকশ গজ দূরে জীবনের ১৬ বছর কাটিয়েছি, কিন্তু আমার জানা মতে কখনো তাঁর উপর আমার চোখ পড়ে নি।"[২] কিন্তু একজন ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ব্রাডলির কর্ম ও খ্যাতি ছিল অবিস্মরণীয়। ১৮৮৩ সালে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সম্মান সূচক LLD উপাধি দেওয়া হয়। ১৯২১ সালে রয়েল ডেনিশ একাডেমির সদস্যপদ ও ১৯২৩ সালে তিনি বৃটিশএকাডেমির সম্মান সূচক ফেলোশীপ লাভ করেন। ১৯২৪ সালে রাজা পঞ্চম জর্জ প্রথম একজন দার্শনিক হিসেবে তাঁকে 'Order of Merit' সম্মাননায় ভূষিত করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলির কয়েকটি হচ্ছে *Appearance and Reality; The Pre- supposition of Critical History; Ethical Studies; Principles of Logic; Essays on Truth and Reality* প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাডলির অধিবিদ্যা

আমি প্রথম অধ্যায়ে এই বিষয়ে বলেছিলাম, হেগেলিয় ভাববাদের প্রভাবে যে ক'জন দার্শনিক সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে একজন এফ.এইচ. ব্রাডলি। ব্রাডলি নিজেকে হেগেল-পন্থী না বললেও হেগেলিয় আদর্শকেই তিনি মনে-প্রাণে গ্রহণ করেন। ব্রাডলির অধিকাংশ আধিবিদ্যক আলোচনা এসেছে তাঁর বিখ্যাত *Appearance and Reality* গ্রন্থে। ১৮৮৩ সালে তিনি মিল অনুসারীদের বিপরীতে *Principles of Logic* গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের পরই তিনি *Appearance and Reality* লেখার কাজ শুরু করেন যা ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটির উপর ভিত্তি করেই আমি তাঁর আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করব।

গ্রন্থটিকে তিনি দু'টি অংশে ভাগ করেছেন-অবভাস (Appearance)এবং বাস্তবসত্তা (Reality)। মোট ২৭ টি অধ্যায়ের প্রথম ১২ টিতে এসেছে অবভাস সংক্রান্ত নেতিবাচক আলোচনা এবং বাকি ১৫ টি অধ্যায়ে এসেছে বাস্তবসত্তা সংক্রান্ত ইতিবাচক আলোচনা। গ্রন্থের শুরুতেই গুরুত্বপূর্ণ Introduction আছে যেখানে অধিবিদ্যার সংজ্ঞা, অধিবিদ্যা বিরোধী কিছু যুক্তি খণ্ডনসহ অধিবিদ্যা সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তিনি তুলে ধরেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছিলাম অধিবিদ্যার পরিচয় সম্পর্কে তিনি বলেন, অধিবিদ্যা হচ্ছে অবভাসের বিপরীতে বাস্তব সত্তাকে জানার প্রয়াস, আদি নীতিমালা বা পরম সত্তা কিংবা বিশ্বজগৎকে জানার একটি প্রচেষ্টা, খণ্ড খণ্ড বা আংশিকভাবে নয় বরং সামগ্রিক ভাবে। অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে তিনি শুরুতেই প্রচলিত তিনটি আপত্তি ও সেগুলোর জবাব দেন। সেগুলো হলো:

১। এটা যে জ্ঞান পেতে চায় তা সম্পূর্ণভাবে অর্জন অসম্ভব।

২। যদি কিছু অর্জন সম্ভবও হয় তবু তা অপ্রয়োজনীয়।

৩। অধিবিদ্যায় নতুন কোনো জ্ঞান নেই। প্রাচীন দর্শনের বাইরে এখানে কিছু নেই।[৩]

এর উত্তরে তিনি বলেন, যিনি মনে করেন অধিবিদ্যার জ্ঞান অসম্ভব তাঁর প্রতি আমাদের বলার কিছু নেই। তবে আদি নীতিমালার ব্যাপারে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্বসহ তিনি একজন 'brother metaphysician' এবং হয়ত অজ্ঞতা বশত: তিনি এই বিচরণ ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন। ব্রাডলি বলেন,

> বাস্তব সত্তা এমন জিনিস যেখানে আমাদের জ্ঞান পৌঁছতে পারে না- এটা বলার মানেই হলো বাস্তব সত্তাকে জানার দাবি; জোর দিয়ে বলা যায় যে, আমাদের জ্ঞান এমনি এক ধরনের বিষয় যা অবভাসকে অতিক্রম করতে অবশ্য ব্যর্থ- এটা (বাস্তব সত্তা) নিজেই ইংগিত করে এটা অতীন্দ্রিয়

Dhaka University Institutional Repository

ধারণা; যদি আমাদের অতিজাগতিক কোনো ধারণা না থাকে, তাহলে আমাদের অবশ্য এ প্রসঙ্গে ব্যর্থতা বা সফলতার কথা নিশ্চিতভাবে জানা উচিত নয়।[৪]

অর্থাৎ তিনি মনে করেন বাস্তবসত্তা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নেই-এই কথা বাস্তবসত্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে না। আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ অবভাসের মাধ্যমে তাকে দেখা যায় না এর মানে বাস্তবসত্তা অতীন্দ্রিয় সত্তা। তিনি আরো বলেন, যাকে আমরা সবচেয়ে সফল মনে করি, যিনি সর্বাধিক মেধার অধিকারী তিনিও কখনো বলেন না, তিনি জানেন বরং বলেন, জানার চেষ্টা করছেন। সেজন্য অবশ্য তিনি মনে করেন না সন্তোষজনক জ্ঞান সম্ভব, তবে আংশিকভাবে সন্তোষজনক হতে পারে। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করেন, পরম সত্তা সর্ম্পকে আমাদের জ্ঞান আছে নিশ্চিত ও বাস্তব জ্ঞান যদিও তিনি নিশ্চিত, তাঁর এই উপলব্ধি অপূর্ণ।[৫] অত্যন্ত জোর দিয়ে তিনি বলেন,

আমি অবশ্যই আপত্তিকারীকে বলব, তাঁর চোখ খোলা উচিত এবং মানব প্রকৃতির চিন্তা করা উচিত। বিশ্বজগৎ সর্ম্পকে চিন্তা না করে কি থাকা সম্ভব? আমি বলি না যে, সবাইকে অসচেতন বা সচেতনভাবে এক পদ্ধতির অনুসারী হতে হবে। আমি বলতে চাই বিবিধ কারণেই প্রতিটি মানুষ বিস্মিত হতে ও চিন্তা করতে বাধ্য।[৬]

ব্রাডলি তাঁর সমকালীন জড়বাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের ব্যাপক প্রভাবের কারণে জোর দিয়ে এসব কথা বলেন। তাঁর সময়ে বিজ্ঞানের প্রভাবে কিছু লোক কোনো যুক্তি বা বুদ্ধির চর্চা বাদ দিয়েই অধিবিদ্যার আবেগ নির্ভর বিরোধিতায় লিপ্ত হন। অথচ মানুষ স্বভাবতই চিন্তাশীল প্রাণি। সে নিজের এবং পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে চিন্তা না করে পারে না । অধিবিদ্যার গুরুত্ব ও অনিবার্যতার প্রসংগে তিনি আরো বলেন,

আর তাই যখন কাব্য, শিল্প ও ধর্ম সম্পূর্ণভাবে কোনো আকর্ষণ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হবে, অথবা যখন এগুলো চরম সমস্যাগুলোর সাথে সংগ্রামে এবং এসব বিষয়ে একমত হওয়ার ক্ষেত্রে কৌশল প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হবে; যখন রহস্য ও মোহিনী শক্তিবোধ উদ্দেশ্যহীনভাবে মনের মধ্যে বিস্ময় সৃষ্টি করতে অক্ষম হবে এবং একে ভালবাসতে জানবে না; যখন, সংক্ষেপে, গোধুলীর কোনো আকর্ষণ থাকবে না তখন অধিবিদ্যা অর্থহীন হয়ে যাবে।[৭]

অর্থাৎ কবিতায়,শিল্পে মানুষের কল্পনা মেশানো থাকে। বিশষত,কাব্যে এমন রূপক উপমা থাকে যাকে বাদ দিলে কবিতাই হয় না। অথচ এগুলোর কোনো আক্ষরিক অর্থ নেই। একইভাবে শৈল্পিকতা,ছবি আঁকা,কারুকার্য- এগুলো অধিকাংশই বাস্তবতার বাইরে তৈরি হয়, কিন্তু আমাদের মনে আনন্দের সৃষ্টি করে। ধর্মেও মৃত্যু পরবর্তী অজানা জগতের বিভিন্ন কথা, বিবরণ,উপমা রয়েছে যার অর্থ বোঝা অনেক

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না । এগুলো যেমন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ অধিবিদ্যাও ঠিক তেমনি । আপত্তিকারীর উদ্দেশ্যে তিনি আরো বলেন,

> হয় তাকে সব জিনিসের মূল- এর চিন্তা করাকে নিন্দা করতে হবে এবং যদি তিনি তাই করেন তাহলে তিনি মানব প্রকৃতির সবচেয়ে বড় দিককেই আঘাতের চেষ্টা করবেন, অন্যথায় তিনি আমাদের প্রতি সমর্থন দেবেন । এরপর যাঁরা মনে করেন অধিবিদ্যার জ্ঞানে নতুনত্ব নেই তাঁরা অবশ্যই জানেন এবং স্বীকার করেন মানব প্রকৃতি যাকে সত্য এবং মিথ্যা বলে সনাক্ত করে তা চিরন্তন, এতে পরিবর্তন নেই । তাই অধিবিদ্যার নতুন ব্যাখ্যা আসলেও এর বিষয়বস্তু ও কাজ একই ।[৮]

অর্থাৎ এখানে তিনি অধিবিদ্যার জ্ঞানের অপরিবর্তনীয়তার কথা বলেন । প্রকৃতির নিয়মের যেমন কোনো পরিবর্তন নেই তেমনি আধিবিদ্যক বিষয়গুলো আদিকাল থেকে একই আবেদন নিয়ে মানব মনে আগমন করে । এরিস্টটল এজন্যই অধিবিদ্যাকে অপরিবর্তনীয় সত্তার বিজ্ঞান বলেন আর ব্রাডলি সেটারই সমর্থন করেন ।

ব্রাডলির অধিবিদ্যার মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সম্বন্ধ । তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, আমরা যা দেখি ও জানি সবকিছুর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান । যে সবের মধ্যে এই ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান সে সব জিনিস স্ববিরোধী এবং অবভাস । এর বিপরীতে এমন একটি বাস্তবসত্তা বিদ্যমান যার সাথে কোনো সম্বন্ধের সম্পর্ক নেই, আর সেজন্য সেটাই পরম বাস্তবসত্তা এবং তাকে আবিষ্কারই তাঁর অধিবিদ্যার উদ্দেশ্য । এই ছিল সংক্ষেপে ব্রাডলির অধিবিদ্যা । এবার একটু বিস্তারিত বলার চেষ্টা করব ।

প্রথম অধ্যায় তিনি শুরু করেন 'মুখ্য ও গৌণগুণ' (Primary and Secondary Qualities) সম্পর্কিত আলোচনার মাধ্যমে । তিনি বলেন, বিষয়টি অনেক প্রাচীন হলেও কোনো জিনিসকে বোধগম্য করার জন্য এর আলোচনা প্রয়োজন । প্রাথমিক বা মুখ্য গুণকে তিনি জন লকের মত দৈশিক বলেন । যেমন, দ্রব্যের আকৃতি, বিস্তৃতি, কাঠিন্য,সংখ্যা ইত্যাদি । আর গৌণগুণকে বলেন মানসিক । যেমন, দ্রব্যের রং,রূপ,স্বাদ,গন্ধ ইতাদি;এগুলো বস্তুতে থাকে না, বরং ইন্দ্রিয় ও মনের উপর নির্ভরশীল । গৌণগুণ মুখ্যগুণ ছাড়া অস্তিত্বশীল হতে পারে না । বাস্তবে রঙিন এমন কিছু নেই; যে চক্ষু এটাকে লাল বলছে আরেকটি চক্ষু এটাকে কালোও বলতে পারে । গরম ও ঠাণ্ডা ত্বকের উপর নির্ভরশীল । স্বাদ ও গন্ধ, জিহ্বা ও নাকের উপর নির্ভরশীল । এভাবে দেখা যায় গৌণ গুণগুলো স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল হতে পারে না । সে জন্য এগুলো স্ববিরোধী, তাই অবভাস । দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি

'বাস্তব এবং গুণ'(Substantive and Adjective) এর আলোচনায় একমুষ্ঠী চিনির উদাহরণ দেন। তিনি বলেন,

> চিনি এমন একটা জিনিস যার উপর গুণ ও বিশেষণ আরোপ করা যায়। যেমন: সাদা, কঠিন, মিষ্টি। চিনির কেবল সাদাত্ব, কঠিনত্ব বা মিষ্টিত্ব নেই। চিনির বাস্তব সত্তা (Reality) এই তিনটির সমন্বয়। যদি কোনো বিশেষণ ছাড়া আমরা চিনির কল্পনা করি তাহলে হতবুদ্ধি হওয়া ছাড়া আর বিকল্প থাকে না।[৯]

এখানে চিনি হচ্ছে 'উদ্দেশ্য' (Subject) আর গুণগুলো হচ্ছে 'বিধেয়' (Predicate); এর বিপরীতক্রমে ঐ গুণগুলোর কোনো একটিকে 'উদ্দেশ্য' করে যদি আমরা এর 'বিধেয়'কে খুঁজি তাহলে চিনি পাব না। সুতরাং প্রমাণিত হয় সম্বন্ধ ছাড়া আমরা যেমন কোনো কিছুর ব্যাখ্যা করতে পারি না, তেমনি সম্বন্ধের ব্যাখ্যাও এক ধরনের অনবস্থা দোষের সৃষ্টি করে। তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতে তিনি বলেন, অনিবার্য ভাবেই আমরা সম্বন্ধ ও গুণের স্বীকার করছি। যদিও তাত্ত্বিক ভাবে এটা সত্য বাস্তবতা নয় বরং অবভাস। এখানে তিনি দুটি সত্য আবিষ্কার করেন। ১) সম্বন্ধ ছাড়া কোনো গুণই থাকতে পারে না এবং ২) সম্বন্ধ ছাড়া আমরা যেসব গুণ পাই সেগুলোর বোধগম্য অর্থ নেই।এই অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে তিনি বলেন, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত আমাদের যে অভিজ্ঞতা তা আসলে সত্য নয় এবং আমাদের সামনের এই বিশাল জগতের নিন্দা না করে আমরা পারি না।[১০]

চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি দেশ ও কালের অবাস্তবতার কথা বলেন। তাঁর মতে, এগুলো অবভাস, কারণ যে কোনো স্থানই তার সাথে ঠিক একই ধরনের স্থানের সাথে যুক্ত এবং বর্ধিত স্থানটিও একটি স্থান। এভাবে দেশ বলতে বোঝানো যায় পরস্পর সর্ম্পক যুক্ত কিছু স্থানের সমন্বয়কে। সুতরাং এখানেও সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছু নেই।[১১] একই ভাবে সময়ও সম্বন্ধের সমন্বয়। সময়কে যদি এ-সি-ই এভাবে ভাগ করি তাহলে এর মধ্যে এ-বি-সি-ডি-ই এভাবে পাওয়া যাবে। আবার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত এভাবেও সময় সম্পর্ক যুক্ত। সুতরাং কালও সমন্ধ ছাড়া কিছু নয়। তাই দেশ ও কাল বাস্তব নয়, অবভাস। এভাবে তিনি গতি ও পরিবর্তন, কার্যকারণ, সক্রিয়তা ও বস্তুজগৎ সম্পর্কে দেখানোর চেষ্টা করেন, এসব কিছুতেই সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাই অবভাস।

বাহ্যিক জগতের বর্ণনার পর তিনি নবম ও দশম অধ্যায়ে আত্মা সম্পর্কে বলেন । তাঁর মতে আত্মা সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের মত হলো, এটা বাস্তব, অবভাস নয়। কিন্তু তিনি যুক্তি দেন এটাও অবভাস, বাস্তব নয়। তাঁর ভাষায় ,

Dhaka University Institutional Repository

> আমরা সবাই নিশ্চিত যে, আমরা অস্তিত্বশীল, কিন্তু কোন্ অর্থে, এবং কী বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা অস্তিত্বশীল, এই বিষয়ে আমরা অনেকেই অসহায়, অনিশ্চিত ও অন্ধ বিভ্রান্তির মধ্যে আছি ।[১২]

তিনি মনে করেন, আমরা আত্মা সম্পর্কে যা বলি তা বাস্তব নয়, অবভাস । অর্থাৎ ডেকার্ট যেমন মনের অস্তিত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেন, ব্রাডলি সেই মন বা আত্মা সম্পর্কে সন্দেহ করেন । এ সংক্রান্ত প্রচলিত বিভিন্ন মত উপস্থাপন করে তিনি সেগুলোর খণ্ডন করেন ।

তাঁর মতে, আমরা একটা বিশেষ মুহুর্তের কথা ভাবতে পারি । যেমন- আমাদের অনুভূতি, চিন্তা, সংবেদন ; এগুলো সৃষ্টি হয় বস্তু জগতে, অন্যান্য মানুষ এবং আমাদের নিজেদের মাধ্যমে । সব জিনিসকে আমরা এভাবেই দেখি । এতে আমি নিজের সম্পর্কে যা বলতে পারি তাই আত্মা । কিন্তু ব্রাডলি বলেন এটা সঠিক ব্যাখ্যা নয় । আবার কেউ বলেন, একজন মানুষ মাছ খাইলে যেমন সেটা তার পেটে অবস্থান করে অত্মাও ঠিক এধরনের দেহের অভ্যন্তরীণ জিনিস । ব্রাডলি এটাকেও সঠিক ব্যাখ্যা বলেন না । আবার যাঁরা বলেন মানুষের নিজস্ব স্বাভাবিক আচরণ ও কোনো কিছুর প্রতি তার যে আচরণ তার মাধ্যমেই আত্মার প্রকাশ ঘটে-এটাকেও তিনি বৈধ বলে স্বীকার করেন না । তাঁর ভাষায়,

> আমাদের বলা উচিত হবে, একজন মানুষের সত্যিকার আত্মা তার সেই সম্বন্ধের উপর নির্ভর করতে পারে না যা পরিবর্তনশীল । আর পরিবর্তন সঠিক কথা নয় । কারণ কোনো কোনো মানুষের জীবনে অপূরণীয় পরিবর্তন দেখা যায় ।[১৩]

তিনি এ কথাটি তাঁর গ্রন্থের প্রায় সব জায়গায় বলেছেন,অর্থাৎ যেখানে পরিবর্তন সেখানে প্রকৃত অবস্থা পাওয়া যাবে না । পরিবর্তনশীলতা এক ধরনের সম্বন্ধের সৃষ্টি করে । আর যেহেতু মানুষের আত্মার বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে সেহেতু তা বাস্তব হতে পারে না । তিনি বলেন, "যদি কারো জীবনে কোনো বিপদ, মৃত্যু, ভালোবাসা আসে তাহলে তা কি একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটে না?"[১৪] সুতরাং আত্মাকে আচরণের সমষ্টি বললেও সেটা সঠিক নয় ।

আবার একজন মানুষের মন সম্পর্কে এর উপাদান, কাঠামো ইত্যাদি আমরা বলতে পারি । কিন্তু তখন অবশ্যই আত্মা কোথায় অবস্থান করে সেটা চেষ্টা করেও আমরা পাব না । তাঁর মতে, এটাকে যদি আমরা পরিবর্তনের সারসত্তা বলি তাও সঠিক হতে পারে না । কারণ যাকে আমরা সারসত্তা বলব তা আদৌ সারসত্তা হতে পারে না । যেমন, শৈশব, যৌবন, বার্ধ্যক্য, ব্যাধি, পাগলামিতে মন বা আত্মার বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা যায় । একদিকে উৎকর্ষতা অন্যদিকে ভোগান্তি, এধরনের বৈপরীত্য আত্মায় থাকতে পারে না । লাইবনিজের মত আত্মাকে মোনাড বললেও সঠিক হয় না । কারণ, যদি এটাকে

Dhaka University Institutional Repository

মোনাডের মত অবিভাজ্য একক ধরা হয় তাহলে তা জীবনের সাথে সমান্তরালভাবে অবস্থান করবে। সেটা হবে চলন্ত। আত্মার এ ব্যাখ্যাও সঠিক হতে পারে না। সুতরাং দেখা যায় কেউ আত্মাকে Subjective আবার কেউ Objective বলেন; কেউ মনোবৈজ্ঞানিক এবং কেউ পৃথক সত্তা বলেন; এসব কিছুই আসলে পরস্পর নির্ভরশীল ও সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং আত্মা একটি অবভাস।

অবভাসের আলোচনা শেষ করে তিনি বাস্তবসত্তার (Reality) আলোচনা শুরু করেন। ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে পঞ্চদশ অধ্যায় পর্যন্ত তিনি Reality এর বৈশিষ্ট্য ও একত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর মতে Real হচ্ছে যা সন্দেহের উর্ধ্বে অর্থাৎ যা সম্পূর্ণভাবে নিজের মতো এবং নিজের দ্বারা পরিচালিত হয় । এখানে সম্বন্ধের সম্পর্ক না থাকায় কোনো স্ববিরোধ নেই। এখন প্রশ্ন আসে এ ধরনের সম্বন্ধবিহীন কোনো কিছুর অস্তিত্ব আছে কি না। তিনি বলেন, প্রতিটি অবভাসের পেছনে অবশ্য একটি Reality থাকবে। সুতরাং বাস্তবসত্তাকে অবশ্যই অস্তিত্বশীল হতে হবে। কিন্তু বাস্তবসত্তা কি বহু না এক? তাঁর জবাব, Absolute Reality বহু নয় বরং এক। এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি। তাঁর ভাষায়,

> পরম সত্তা এমন এক পদ্ধতি এবং এর উপাদান অনুভূতি মূলক অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাই এটা একটি একক এবং একীভূত অভিজ্ঞতা, যা প্রতিটি আংশিক বৈচিত্র্যকে আলিংগন করে। কারণ এটা অবভাসের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এবং সেজন্য কোনো অনুভূতি বা চিন্তা এর সীমা অতিক্রম করে যেতে পারে না।[১৫]

কখনো তিনি বলেন, Real is individual[১৬] অথবা সম্পূর্ণ নৈতিক ধারণা হিসাবে the real is perfect. তাঁর মতে অ-বিরোধই হচ্ছে বাস্তবসত্তার যাচাই।

হেগেলের কথা হলো ঐশ্বরিক মন অন্য সব মনের ব্যাপারে অবশ্যই চিন্তা করবে এবং জ্ঞানের বস্তুসমূহ নিয়েও চিন্তা করবে। এতে বোঝা যায় পরম বাস্তবসত্তা (Absolute Reality)সব ক্ষুদ্রতর মনকে ধারণ করে আছে। কিন্তু ব্রাডলির কথা ছিল ভিন্ন। কারণ আমরা যদিও Absolute Reality বা হেগেলের বাস্তবসত্তার সাথে বাহ্যিক সম্পর্কমুক্ত কিন্তু অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক থেকে মুক্ত হতে পারি নি। তাই এখানে অংশকে ধারণকারী সমগ্র হচ্ছে subject এবং objectএর সমন্বয়; অন্য কথায়, এই আত্মা এবং অন্য সব আত্মার সমন্বয়। সুতরাং হেগেল যাকে বাস্তব বলেছেন, ব্রাডলি তাকে অবাস্তব বলেছেন। কিন্তু বাস্তবসত্তার অস্তিত্ব ব্রাডলি অবভাসের মাধ্যমেই প্রমাণ করেছেন। তাঁর মতে, বাস্তবসত্তার জ্ঞান আমরা কখনো অর্জন করতে পারি না। আমরা যা জানি সবই একটি ধারণা নির্দেশকারী। বিমূর্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বজগতের চিন্তা থেকে এটা আমাদের মনে এসেছে। এই বিমূর্ত বিশ্বজগৎ আমার মস্তিষ্ক ছাড়া প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব লাভ করে না। আমি ঘাসের বিধেয় রূপে যখন সার্বিক সবুজকে উল্লেখ করি তখন আসলে কেউ তা দেখে না। সার্বিক সবুজ আসলে হালকা, গাঢ়, উজ্জ্বল, পৃথক, সংযুক্ত কোনোটিই নয়। এভাবে আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে Reality কে জানতে পারি না। আর যেখানে পরিপূর্ণভাবে আমরা জানতে পারি না সেখানে সব সময় ভ্রান্তি থাকে; আমরা জানি না বা জানতে পারি না কতটুকু ভ্রান্তি হয়েছে। এভাবে আমরা একটি উভয় সংকটে পড়ি। আবার যদি আমরা Absolute কে জানতাম তাহলে সে জানাটা প্রকৃত জানা হত না, কারণ তখন তা জ্ঞানের বস্তু হত। আমাদের সব জ্ঞান অনুভূতি ও সম্বন্ধ থেকে পাওয়া। আমরা সম্বন্ধ ছাড়া অন্যের অনুভূতি সর্ম্পকে জানতে পারি না। সুতরাং আমাদের চিন্তা Reality সর্ম্পকে সঠিক ধারণা দিতে পারে না। দেখা যাচ্ছে, ব্রাডলির যুক্তি এক ধরনের অজ্ঞেয়বাদের দিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। যেমনটি হার্বার্ট স্পেনসারে আমরা দেখেছি। স্পেনসারের কথা ছিল আমরা Absolute কে জানি না এবং জানতে পারি না। আবার পরম সত্য সম্পর্কে স্পেনসারের কথা ছিল Absolute truth আমরা পেতে পারি না। তবে ব্রাডলির সাথে তাঁর পার্থক্য হলো ব্রাডলি বলেন,"পরম সত্য বলতে কোনো জিনিস নেই, সব সত্যই অবশ্যই আংশিকভাবে মিথ্যা এবং মিথ্যা হতে বাধ্য।"[১৭]

তবে ব্রাডলিকে অজ্ঞেয়বাদী বলা যায় না। কারণ তিনি এটাও বলেন,"এমন কোনো সত্য নেই যা সম্পূর্ণরূপে সত্য এবং এমন কোনো মিথ্যাও নেই যা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা।"[১৮] সত্যের কিছু Degree আছে, Reality এরও কিছু degree আছে। জড় সম্পূর্ণভাবে বাস্তব নয় কিন্তু তা ভ্রান্ত পর্যবেক্ষণ নয়। স্পেনসারের সাথে তাঁর আরেকটি পার্থক্য হল আমরা বাস্তবসত্তার পূর্ণ জ্ঞান না পেলেও তাকে জানার প্রচেষ্টাই আমাদের কাজ। রাশডালের মতে, ব্রাডলির মধ্যে ভাববাদ, স্পিনোজাবাদ এবং রূপবাদের সমন্বয় ঘটেছে। স্পিনোজা বলেছিলেন আমাদের সমস্ত জ্ঞাত সচেতন অভিজ্ঞতা একটি দ্রব্যের বিধেয় যাকে আমরা জানি না, কিন্তু তা আড়াল থেকে কথা বলে-চিন্তাশীল সত্তা ও চিন্তার বস্তুর সাথে। অন্যদিকে ব্রাডলির পরম সত্তাকে অতীন্দ্রিয় জগৎ থেকে কথা বলতে দেখা যায় না।[১৯]

ব্রাডলির মতে Absolute এর মধ্যে সব অসামঞ্জস্যতা একত্রে অবস্থান করে, কিন্তু আমরা তা জানি না কীভাবে তা অবস্থান করে। তবে এটা নিশ্চিত কোনো একটিকেও সেখান থেকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। Absolute সমস্ত বিরোধকে ধারণ করেই সমৃদ্ধ হয়।[২০] তাঁর মতে অধিবিদ্যা ও ধর্ম পৃথক। ধর্মের ব্যাপারেও তাঁর মত, এটা একটা অবভাস। নৈতিকতাকেও তিনি অবভাস বলেন। তাঁর

ভাষায়,"নৈতিক অশুভ কেবল মাত্র নৈতিক অভিজ্ঞতার মধ্যে অস্তিত্বশীল হতে পারে এবং সেই অভিজ্ঞতা সারসত্তার দিক থেকে অসামঞ্জস্যতাপূর্ণ।"[২১] আর এ জন্যই তা অবভাস।

ঈশ্বর সম্পর্কে ব্রাডলির মত হলো ঈশ্বরও পরম সত্তার অবভাস। তাঁর ভাষায়,"ধর্ম স্বভাবতই মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে।"[২২] আর যখন সম্বন্ধ সৃষ্টি হবে তখনই স্ববিরোধ তৈরি হবে। মানুষ একদিকে একটি সসীম সত্তা যা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে মানুষের ধারণা কেবল একটি কল্পনা। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে মানুষ কিছুই করতে পারে না। অন্যদিকে ঈশ্বরও সসীম সত্তা। মানুষের উর্ধ্বে তার অবস্থান, তার ইচ্ছা ও বুদ্ধির কারণে তিনি অন্যসব সম্বন্ধ থেকে কিছুটা স্বাধীন।[২৩] তাই ঈশ্বরকে যদি একটি চিন্তাশীল ও অনুভূতিশীল সত্তা বলি তাহলে তাঁর একটি নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। কিন্তু যে সম্বন্ধের মাধ্যমে তাকে ব্যাখ্যা করি, তা যদি বাদ দেওয়া হয় তাহলে তিনি হবেন সঙ্গতিহীন শূন্যতা কিংবা তিনি হবেন সসীম সত্তা।[২৪] তিনি Absuloute কে ঈশ্বরের উর্ধ্বে চূড়ান্ত বাস্তবসত্তা মনে করেন যা ধর্মের ঈশ্বর থেকে ভিন্ন। তাঁর ভাষায়,

> যদি আপনি পরমসত্তাকে ঈশ্বরের সাথে একীভূত করেন, তাহলে তা ধর্মের ঈশ্বর নয়। আবার যদি তাদের পৃথক করেন, তখন ঈশ্বর সামগ্রিকভাবে একজন সসীম সত্তায় পরিণত হবেন। তা সত্ত্বেও যে সম্পর্কের কথ মূলত পূর্বে অনুমান করা হয়েছে, সেই লক্ষ্যে পৌছলে পরম বাস্তব সত্তার অনুপস্থিতিতে ঈশ্বর ও তার ধর্ম উভয়ই বিস্মৃত হয়ে যাবে।[২৫]

আমরা জানি এরিস্টটলও ঈশ্বর সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক পর্যায়ে ঈশ্বরকে প্রায় নিষ্ক্রীয় করে দিলেন। আর এখানে ব্রাডলিও সেই কাজটি করলেন। তিনি সাধারণ মানুষের সাধারণ ধর্মের কথা চিন্তা না করে এমন এক পরম সত্তার ধারণা দেন যার সাথে মানুষের কোনো যোগাযোগ ও সম্পর্ক নেই। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তিনি পরের পৃষ্ঠায় বলেন,

> আমরা বলতে পারি ঈশ্বর যতক্ষণ না সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবেন ততক্ষণ তিনি ঈশ্বরই নন। আর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ঈশ্বর ধর্মের ঈশ্বর নন। ঈশ্বর তখন একটি আকারে (aspect) পরিণত হবেন বরং পরম সত্তার একটি অবভাস হিসেবে।[২৬]

এখানেও তিনি ধর্মের ঈশ্বরের চেয়ে ভিন্ন এক পরম সত্তার ধারণা দেন। প্রকৃতপক্ষে অধিবিদ্যার মূল কেন্দ্রই হচ্ছে পরম সত্তা। ধর্মের সাথে অধিবিদ্যার পার্থক্য আছে বলেই ধর্মের ঈশ্বরের সাথে সবক্ষেত্রে আধিবিদ্যক পরম সত্তার মিল হবে না। তিনি নিজেও স্বীকার করেন, এ ক্ষেত্রে তিনি হেগেলকে অনুসরণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অধিবিদ্যা ও ধর্মকে পৃথক বললেও তিনি উভয়ের মধ্যে একটি সমন্বয়ের চেষ্টাও করেন। তাঁর মতে অধিবিদ্যার কাজ চূড়ান্ত সত্যকে নিয়ে এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটা ধর্মের উর্ধ্বে। কিন্তু অন্যদিকে আমরা ধর্মের সারসত্তা হিসেবে জ্ঞানকে পাই না এবং এটা অবশ্য এই অর্থ করে না যে, এর সারসত্তা কেবল অনুভূতির মধ্যেই রয়েছে। বরং ধর্ম আমাদের সত্তার প্রতিটি ক্রিয়ার মাধ্যমে ভালোত্বের পূর্ণাঙ্গ Reality কে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। আর তাই এটা একটা ব্যাপকতর জিনিস এবং সেই জন্য দর্শন বা অধিবিদ্যার চেয়ে উচ্চতর। তিনি আরো বলেন, দর্শনও অন্যান্য জিনিসের মতই একটা অবভাস। একদিকে এটা অনেক উচ্চ, অন্যদিকে এর অবস্থান নিম্নতর। এর দুর্বলতা, এটা কেবল তাত্ত্বিক। অন্যদিকে যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যের মধ্যেই এর সারসত্তা তাই এর অবস্থান উচ্চতর।[২৭]

সর্বশেষ, ২৭তম অধ্যায় Ultimate Doubts -এ তিনি তাঁর গ্রন্থের উপসংহার টানেন। Reality সম্পর্কে এখানে তাই বলেন,

> আমাদের কাছে এখন এটা স্পষ্ট যে, বাস্তব সত্তা এক,অনিবার্যভাবেই এটা হচ্ছে অভিজ্ঞতা এবং এতে আছে ভারসাম্যপূর্ণ আনন্দ। অবভাস ছাড়া জগতে আর কিছু নেই,আর অবভাসের প্রতিটি অংশই সমগ্রকে বিশেষায়িত করে; অন্য দিকে যখন বিষয়টিকে(অবভাস ও বাস্তবসত্তা) একসাথে দেখা হবে তখন প্রকৃতপক্ষে অবভাসকে পাওয়া যাবে না।[২৮]

এই অধ্যায়ের শিরোনাম তিনি দিয়েছেন 'চরম সংশয়'। সবকিছুর মধ্যে সংশয়কে তিনি চরম সংশয় নাম দেন যা অবভাসের দীর্ঘ আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন। আর এখানে তিনি সব সংশয়ের উর্ধ্বে বাস্ত বসত্তার একত্বের বিষয়টিকে উপস্থাপন করেন। সব কিছুকে অবভাস বলে তিনি বলতে চেয়েছেন এর বিপরীতে অবশ্যই এক বাস্তব-সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে। এটা কোনো কাল্পনিক বা অতিজাগতিক বিষয় নয় বরং অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মত তিনি বলেন,এটা বাস্তব অভিজ্ঞতা। তাঁর ভাষায়,"সব সংশয়ের উর্ধ্বে এখন এটা স্পষ্ট যে, বাস্তবসত্তা এক। বাস্তবসত্তা অবশ্যই একটা অভিজ্ঞতা এবং এই সিদ্ধান্তের উপর সন্দেহ করা অসম্ভব।"[২৯] অর্থাৎ অবভাসের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বাস্তবসত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ্য জ্ঞান লাভ হয়েছে। বুদ্ধি বা স্বজ্ঞা কিংবা প্রত্যাদেশ বাণির মত নয় বরং অভিজ্ঞতার মান অনুযায়ী এটা এখন স্পষ্ট যে, বাস্তবসত্তার অস্তিত্ব ছাড়া দৃশ্যমান এই জগতের অস্তিত্ব অসম্ভব। সর্বশেষে তিন হেগেলকে আবার সমর্থন করে বলেন, "খুব ভিন্ন একটা কিছু দিয়ে নয়, আরো নিশ্চিতভাবে বললে,হেগেলের প্রয়োজনীয় সেই বার্তা দিয়েই আমি শেষ করছি।"[৩০]হেগেলের সেই বার্তা ছিল, একমাত্র পরম-আত্মাই সবকিছুর মূল। আধ্যাত্মিক সেই আত্মা থেকেই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। তবে হেগেলের সাথে তাঁর পার্থক্য Absolute কে হেগেল বলেছেন Spiritual, আর তিনি বলেন অভিজ্ঞতালব্ধ।[৩১]

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা

ব্রাডলি অধিবিদ্যা সংক্রান্ত এই গ্রন্থ রচনার পর আরো ৩০ বছর জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময় তিনি অন্যান্য রচনার পাশাপাশি তাঁর অধিবিদ্যার উপর আরোপিত অভিযোগও খণ্ডন করেন। রাসেল তাঁর অধিবিদ্যার প্রচুর সমালোচনা করেন। রাসেলের ভাষায়,

> অধিকাংশ লোকই স্বীকার করবেন যে, এ যুক্তি ভেবে চিন্তে খাড়া করা হয়েছে। পারস্পরিক সম্বন্ধের মত একটা প্রত্যক্ষ বিষয়ের চেয়ে অতি সূক্ষ্ম, বিমূর্ত ও জটিল যুক্তি প্রক্রিয়ায় ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।[৩২]

অর্থাৎ ব্রাডলি প্রত্যক্ষ,বাস্তব ও নিশ্চিত সম্পর্কের ব্যাপারে যে সন্দেহ করেন তাতে ভুল হওয়াটা স্বভাবিক; যেমন পিতা পুত্রের সম্পর্ক। এখানে সন্দেহ করা আমাদের জন্য অত্যন্ত বিব্রতকর ও অসম্ভব। অথচ ব্রাডলির এখানেও সন্দেহ। রাসেলের মতে,তাঁর সম্বন্ধের সমস্যাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। সম্বন্ধের কারণেই তিনি সবকিছুকে অবভাস বলেন। এবং সেজন্য এগুলো অবাস্তব। কিন্তু এর দ্বারা কী বোঝা যায়? যেমন ৭>৩ (৭, ৩ এর চেয়ে বড়) এই আকারটি মিথ্যা হবে। অথচ এটা বাস্তব সত্য।[৩৩] রাসেল আরো বলেন, এ এবং বি দু'টি ঘটনা এবং বি এর আগে এ ঘটে। এখানে এ এবং বি-দু'টি ঘটনার মধ্যবর্তী সম্পর্ক স্থাপিত হয় আগে সংঘটিত ঘটনার মাধ্যমে। এখানে ৩টি জিনিস 'এ' আগে ঘটে এবং 'বি' আর এগুলো অবস্থিত দেশ-কালের মধ্যে। এ সম্পর্কটা একটা বাস্তব সম্পর্ক, কিন্তু ব্রাডলি এটাকে অবাস্তব বলেন।[৩৪] রাসেলের এই সমালোচনাটিতেও হয়ত প্রশ্ন তোলা যায়। কারণ, তিনি এখানে যে গাণিতিক পদ্ধতিতে বিষয়টির ব্যাখ্যা দেন দর্শনের সকল শাখায় বিশেষত অধিবিদ্যায় সবসময় তা প্রযোজ্য হতে না পারাটাই স্বাভাবিক। জ্ঞানের অন্যান্য অনেক শাখাতেই গাণিতিক নিয়ম মেনে চলা সম্ভব হয় না। রাসেল আরো দাবি করেন,

> এ কথাটা যোগ করা উচিত যে, ব্রাডলি নিজেই যেমন দেখতে পান, তাঁর সমস্যাগুলো নতুনভাবে দেখা দেয় যখন তিনি সত্তার প্রতি কোন বৈশিষ্ট্য আরোপ করার সময় উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের মধ্যে যে-সম্বন্ধ দেখা দেয় সেই সম্বন্ধ নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেন, এবং সে-জন্য তিনি সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হন যে,কোন সত্যই সম্পূর্ণ সত্য নয়। অত্যন্ত অমূর্ত একটা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এ রকমের একটা সিদ্ধান্ত থেকে সন্দেহ করা স্বাভাবিক হয়ে উঠে যে, যুক্তিটার মধ্যে কোন ত্রুটিআছে ।[৩৫]

অর্থাৎ উদ্দেশ্য বিধেয়ের সম্পর্ককে যদি সন্দেহ করা হয় তাহলে বাক্য গঠনই সম্ভব নয়। এখানে বাস্ত বসত্তাকে বিশেষায়িত করা মানে বিধেয়করণ-মানে এতে সন্দেহ সৃষ্টি। তাহলে বাস্তব সত্তাকেও তিনি সন্দেহ করলেন। তাই বাস্তবসত্তার প্রমাণ সংশয়পূর্ণ। আবার ব্রাডলির সমালোচনার মূল বিষয় হিসাবে রাসেল উল্লেখ করেছেন তাঁর একত্ববাদী মতকে যা পারমেনাইডস, স্পিনোজা, হেগেলের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

এসেছে। অন্যদিকে রাসেল নিজে বাস্তববাদী মতের অনুসারী ও অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। ব্রাডলির বক্তব্যে ধর্মতাত্ত্বিকদেরও খুব উৎফুল্ল হওয়ার কারণ নেই। যেহেতু তিনি ঈশ্বরকেও পরম বাস্তব সত্তার অবভাস বলে উল্লেখ করেন। তবে এর ইতিবাচক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। তথাপি এটাকে খুব সন্তোষজনক মত বলবেন না ধার্মিকগণ। কিন্তু তিনি বাস্তবসত্তাকে উপলব্ধির জন্য যে প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন তা সন্তোষজনক। আমরা একুইনাসের সাথে তাঁর বক্তব্য এভাবে সমন্বয় করতে পারি যে, একুইনাস যেহেতু বলেছেন ঈশ্বর কেমন আমরা জানি না, জানতে পারি না তাই তাকে জানার উপায়- তিনি কী নন তার ব্যাখ্যার মাধ্যমে। একই ভাবে সম্বন্ধের কারণেই হোক আর যে কারণেই হোক আমরা পরমসত্তাকে জানতে পারি না তবে জানার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তবে ব্রাডলিকে মূল্যায়ন করে এডওয়ার্ড কেয়ার্ড বলেন, "কান্ট পরবর্তী রচনার মধ্যে ব্রাডলির *Appearance and Reality* গ্রন্থটি সবচেয়ে বড় দার্শনিক ঐতিহ্য।"[৩৬] কোনো বড় দার্শনিকই সমালোচনার উর্ধ্বে নন। এতক্ষণের আলোচনায় এটা বলা যায় ব্রাডলির যুক্তিতে কিছু ভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও অধিবিদ্যার উপর তাঁর বক্তব্য অনেকটা স্পষ্ট।

৪. এইচ ডি লিউইস

এইচ ডি লিউইস (Hywel David Lewis) (১৯১০-১৯৯২)সর্বসাম্প্রতিক কালের একজন বৃটিশধর্মতত্ত্ববিদ ও অধিবিদ। ভাষাতাত্ত্বিক দর্শন, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ ও সমকালীন অধিবিদ্যা বিরোধী মনোভাবের তিনি একজন বিশিষ্ট সমালোচক। তিনি ১৯১০ সালের ২১ মে ওয়েলসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ডেভিড জন লিউইস ছিলেন ওয়েলসের Presbyterian Church এর একজন মন্ত্রী। তিনি ওয়েলসের Caernarfon Grammar School এ পড়াশুনা শেষ করে বাঙ্গোরে University of North Walse এ দর্শনে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৩২ সালে ১ম শ্রেণিতে অনার্স ডিগ্রী সম্পন্ন করে অক্সফোর্ডের jesus college -এ মাস্টার্স করেন ১৯৩৪ সালে। অক্সফোর্ডে তিনি H A Prichard এবং W.D.Ross এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। ১৯৩৫ সালে B.litt অর্জন করে ব্যাঙ্গোর কলেজে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। এরপর ১৯৫৫ সালে তিনি University of London এর Kings College-G History and Philosophy of Religion, Department এর চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করে ১৯৭৭ সালে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। কর্মজীবনে অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি বিবিধ দায়িত্ব পালন করেন। যেমন ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত তিনি মূরহেড লাইব্রেরি অব ফিলোসোফির সম্পাদক, ১৯৬২-১৯৬৩ এরিস্টটলিয়ান সোসাইটির প্রেসিডেন্ট, ১৯৬৫-১৯৬৮ রয়েল ইনস্টিটিউট অব ফিলোসোফির চেয়ারম্যান ছিলেন। এছাড়া তিনি Religious Studies সাময়িকীর একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৯৬৪-৭৯ পর্যন্ত এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিবাহিত ছিলেন। ১৯৯২ সালের ১৭ জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১]

তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল রাষ্ট্রদর্শন, নীতিবিদ্যা ও ধর্মদর্শনের উপর। ২০টির উপর গ্রন্থ এবং অসংখ্য প্রবন্ধ তিনি রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম হলো : *Our Experience of God (1959), Freedom and History (1962) The Elusive Mind (1969)* প্রভৃতি। তিনি আমেরিকা, কানাডা, জাপান,ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে Visiting Professor হিসেবে ভাষণ দেন। এছাড়া এডিনবার্গের *Gifford Lectures (1966-68), The Wilde Lecture at Oxford (1960-63)* প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা।[২] তিনি ছিলেন আড়ম্বরহীন, প্রচার বিমুখ ও খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী একজন দার্শনিক। তিনি দেহ ও মনের সম্পর্কের ব্যাপারে Ryle এর মতের সমালোচনা করেন এবং অত্যন্ত তীক্ষ্মভাবে ভাষাতাত্ত্বিক ও যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের জবাব দেন।

এইচ ডি লিউইস এর অধিবিদ্যা সংক্রান্ত মতবাদ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ ,রচনা এবং বক্তৃতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমরা এখানে তাঁর ঈশ্বর সংক্রান্ত মতবাদ, দেহ ও মনের সম্পর্ক ও আত্মার অমরতা প্রসঙ্গে বক্তব্য আলোচনা করব। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ ও ভাষাতাত্ত্বিক দর্শনের সমালোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব। লিউইস তাঁর বিখ্যাত *Our Experience of God* গ্রন্থে ঈশ্বর ও ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর কথা বলেন। গ্রন্থের সূচনাতেই তিনি বার্ট্রান্ড রাসেলের সমালোচনা করেন। রাসেল তাঁর *My Philosophical Development* গ্রন্থে বলেছিলেন, ধর্মীয় বিশ্বাসের পক্ষে দর্শন কিছু করতে পারে কি না এমন একটি চিন্তা থেকে তিনি দর্শনে এসেছেন এবং এক পর্যায়ে তিনি বলেন, "প্রথম আমি স্বাধীন ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাস হারাই, এরপর অমরতা এবং সর্বশেষ ঈশ্বরে।"[৩] রাসেল ইচ্ছার স্বাধীনতার আধিবিদ্যক ধারণাকে সমর্থন করেন নি। তিনি প্রথমদিকে ম্যাকটেগার্টকে অনুসরণ করে অধিবিদ্যার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন কিন্তু পরে তাঁর চিন্তা চেতনায় ম্যুরের প্রভাব পড়ে এবং একপর্যায়ে তিনি অধিবিদ্যার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। অন্যদিকে লিউইস বলেন, ধর্ম তাঁর প্রাথমিক দর্শন চিন্তায় খুব কমই প্রভাব ফেলেছে। তিনি আরো বলেন,"আমি দর্শনে ধর্মীয় সত্যকে প্রতিষ্ঠার একটি নতুন ও স্বাধীন পন্থা পেয়েছি, পূর্বের চলা পথের একটি বিকল্প পথ হিসেবে।"[৪] তিনি প্রথম দিকে বাস্তববাদী মতের প্রতি আকৃষ্ট হন কিন্তু পরে ধর্ম ও অধিবিদ্যার দিকে ফিরে আসেন। তিনি মনে করেন, অনেক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম থেকে দূরে সরে পড়েন কিংবা ধর্মকে গভীরভাবে বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এর কারণ, তাঁরা ধর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে কীভাবে ব্যাখ্যা করতে হয় তা উপলব্ধি করেন নি, বিশেষত যে সব মতবাদ তাঁদের কাছে আপত্তিকর মনে হয়। এই গ্রন্থের প্রথম দু'টি অধ্যায়ে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে বিভিন্ন প্রচলিত যুক্তি আলোচনা করেন এবং কিছু মূল্যবান মতামত সংযোজন করেন। আমরা এখন সেগুলো আলোচনা করব।

ঈশ্বর সম্পর্কিত প্রচলিত তত্ত্ববিষয়ক, বিশ্বতাত্ত্বিক, কার্যকারণ সংক্রান্ত, উদ্দেশ্যবাদী প্রভৃতি যুক্তির ত্রুটি বিচ্যুতিসহ আলোচনা করে তিনি এগুলোকে যুক্তির মাধ্যমে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তবে ঈশ্বর সম্পর্কিত রহস্যবাদী যুক্তিটি তাঁর নিকট বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। এ সম্পর্কে তাঁর একটি প্রবন্ধ "God and Mystery"[৫] তে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা এসেছে। স্বজ্ঞার মাধ্যমে কীভাবে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় সেটাও তিনি এখানে আলোচনা করেন।

প্রচলিত বিশ্বতাত্ত্বিক ও তত্ত্ববিষয়ক যুক্তির মূল্যায়ন করে লিউইস বলেন, এখান থেকে আমরা দুইটি উপকার পাই। তাঁর ভাষায়,

Dhaka University Institutional Repository

> এ ধরনের প্রচলিত যুক্তির অধ্যয়নে আমরা দু'টি উপকার পাই। প্রথমত, আমরা মূল্যায়ন করি, কীভাবে এগুলো যুক্তি হিসেবে ব্যর্থ হয়; দ্বিতীয়ত, আমরা চিন্তার আলোড়ন থেকে একটি অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে পারি যা এগুলোর পেছনে বিদ্যমান এবং এগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত করে তোলে।[৬]

তাঁর এই মূল্যায়ন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে এ দু'টি যুক্তি যে জিনিসটিতে এসে একীভূত হয়ে পড়ে তা হলো, আমরা প্রত্যক্ষভাবে যে সব শর্তমূলক ও অসম্পূর্ণ সত্তার মুখোমুখি হই সেগুলোর এমন কিছু উৎস থাকা দরকার যা সেই প্রক্রিয়ায় সীমিত হতে পারে না। অন্যদিকে বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তিতে বলা হয় 'অস্তিত্ব' জিনিসটি কেবল এক ধরনের গুণ বা বিধেয় হতে পারে। কান্টের মত আপত্তিকারীগণ এর ত্রুটি নির্দেশ করেন। কান্টের কথা ছিল অস্তিত্ব ঈশ্বরের অনিবার্য গুণ নয়। সুতরাং ঈশ্বরের ধারণা থেকে তাঁর অস্তিত্বের ধারণা নিঃসৃত করা অর্থহীন।[৭] আবার তিনি প্রশ্ন করেন, ইন্দ্রিয় জগতে প্রযোজ্য কার্যকারণ নীতি অতীন্দ্রিয় জগতে কীভাবে প্রযোজ্য হবে, তা জানারও কোনো প্রক্রিয়া নেই; আর এখানে তত্ত্ববিষয়ক প্রমাণ প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির আশ্রয় নেয়। এই জন্যই বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তির সাথে তত্ত্ববিষয়ক যুক্তির মৌলিক পার্থক্য নেই। লিইউস তার উত্তরে বলেন,

> যদি আমরা এটাকে সহজভাবে গ্রহণ করি যে, আমরা এমন কিছু অনিবার্য চিন্তার অধীন যা আমাদের ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করতে প্রভাবিত করে এবং জোর প্রদান করে বলে, অস্তিত্বের কিছু অনিবার্যতা আছে যা আমরা অন্য কোথাও খুঁজে পাই না, তখন এটা আমাদেরকে একটি দৃঢ়তর ভিত্তির দিকে নিয়ে যায়, যা বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তিতে শর্তহীন সর্বোচ্চ সত্তা হিসাবে ব্যাখা করা হয়। যারা মনে করেন কারণের প্রাকৃতিক রীতি আমাদেরকে সুশৃঙ্খল অভিজ্ঞতার কথা বলে এবং সব কিছুর নিবিড় পরিচালনার নির্দেশ করে সেটার মধ্যে অবশ্যই একটি যুক্তি আছে। আমাদের সমস্ত পর্যবেক্ষণ একটি আদি কারণ ছাড়া কখনো বিশ্বজগৎ পাওয়ার দাবি করতে পারে না।[৮]

অর্থাৎ বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তিতে অস্তিত্বের আবশ্যকীয়তার প্রসংগটি তিনি এখানে তুলে ধরেন। তিনি বলতে চান যদি কোনো কিছুর অস্তিত্বের চিন্তা করতে আমরা বাধ্য হই তাহলে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ক্ষেত্রেই আমরা বাধ্য। আবার প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির সাহায্য ছাড়াই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আমরা বিশ্বজগতের আদিকারণের চিন্তা করতে বাধ্য হই। এভাবে তিনি বিশ্বতাত্ত্বিক ও তত্ত্ববিষয়ক উভয় যুক্তিকেই সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেন। লিইউস এই ধরনের যুক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি যুক্তি তুলে ধরেন যাকে তিনি সবচেয়ে বিধিসম্মত বলেন। তা হচ্ছে- "সর্বোচ্চ স্বপ্রতিষ্ঠিত সত্তার অনিবার্যতার প্রতি অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রতকারী একটি কৌশল।"[৯] এখানে তিনি অজ্ঞেয়বাদীকে প্রশ্ন করেন- "বিশ্বজগতের এসব জিনিস কেমন করে হলো তা

Dhaka University Institutional Repository

জানতে কি তার কোনো উৎসাহ নেই?" যদি তিনি উত্তর দেন- "এগুলো আমাদের সমস্যায় ফেলে না, তাহলে আমাদের প্রশ্ন- আমাদের সমস্ত চিন্তার উপযোগী একটি পটভূমি নির্ধারণ করতে বা বিশ্বজগৎকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে তিনি কি বাধ্য? তিনি কি তা পারেন না?" লিউইস তখন বলেন, "হয়ত এতে তিনি প্রভাবিত হবেন না এবং যদি তার ধৈর্য থাকে তাহলে আমরা অন্য একটি জিনিসের কথা বলি, (জোরালোভাবে যুক্তি না দিয়েও) সেটা হলো দেশ-কালের শুরু বা সমাপ্তির প্রশ্ন।" তিনি বলেন, আমরা এটাকেই সবচেয়ে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দাবি করছি না। আমাদের কাছে এখনো এমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই যা বিশ্বজগৎকে সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করবে, যা সম্পূর্ণ মৌলিক ও ভিন্নতর। আবার যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে বা বিপক্ষের উত্তরে অজ্ঞেয়বাদীর মত কেউ বলেন Nothing, তাহলে এতে কোনো সত্তার অস্তিত্বই অস্বীকার করা হবে। লিউইস বলেন, এটা ভুল হবে; কারণ এটা অন্তত স্বীকার করে- কোনো কিছুর থাকা উচিত নয় এবং ফলস্বরূপ তখন বলতে হবে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের মত একটা কিছু আসলে আছে। কিন্তু এই জবাব বস্তুজগৎকে সম্পূর্ণ শেষ করে দেয়। অথচ বস্তু জগতের ব্যাপারে আমাদের অনিবার্য অন্তর্দৃষ্টির কারণে আমরা পরস্পর মুখোমুখি হই।

তত্ত্ববিষয়ক যুক্তির ব্যাপারে তিনি বলেন, যাঁরা এই যুক্তির বিরোধিতা করেন তাঁরা অস্তিত্বকে কোনো বিধেয় বলতে না-রাজ। তাদের এই দাবি আসলে ঠিক নয়। আপত্তিকারীদের মধ্যে যারা বলেন অস্তিত্ব কোনো ধারণার অংশ নয় লিউইস তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এটা সব সসীম জিনিসের জন্যই সত্য যে, সেগুলো তাদের নিজস্ব প্রকৃতির অনিবার্যতার কারণে অস্তিত্বশীল হতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের বিষয়টি ভিন্ন। সসীম বস্তুর জন্য যা প্রযোজ্য তার জন্য তা প্রযোজ্য নয়। ডেকার্টের যুক্তিতে অনেক ভ্রান্তি ও অদ্ভূত অনুমান থাকলেও বুদ্ধিবাদী প্রমাণের মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি দেন। ঈশ্বরের ধারণা একটি হৃদয়গ্রাহী ধারণা- এটাই ডেকার্টের মৌলিক বুদ্ধিবাদী উক্তি। লিউইস বলেন, সংশয়বাদীগণ ডেকার্টের সমালোচনা করলেও তাঁর কাছে মনে হয় ডেকার্টের ঈশ্বরের ধারণা খুবই স্পষ্ট ও সরল। ডেকার্টের উক্তিটি ধর্মীয় ভাবাপন্ন নয়। চার্চ যেভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা বলে সে ধরনের কোনো প্রত্যাদেশ বা চার্চের কোন শিক্ষাও নয় এটা। কিন্তু একটি স্বাধীন, স্বচ্ছ ও অপ্রত্যাখ্যানযোগ্য প্রত্যয়- একজন বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন জীব হিসাবে তিনি তা উপস্থাপন করেন। ডেকার্টের মতে, "একজন ঈশ্বর আছেন এ কথার চেয়ে আরো স্পষ্ট কোনো কথা আছে কি? -যিনি নিরংকুশ সত্তা, যার সারসত্তা কেবল অস্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত।"[১০] অর্থাৎ অস্তিত্ব তার থেকে পৃথক করা যায় না। তবে এসব উক্তি তৈরি হয়েছে খুব সংশয়পূর্ণ একটি যুক্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (Cogito ergo sum)। লিউইস বলেন, ডেকার্ট ও তাঁর অনুসারীদের উচিত ছিল তাঁদের বুদ্ধির মাধ্যমে প্রমাণিত রূপে তাঁদের প্রত্যয়কে

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপন করা। তাহলে তা আরো সহজ-সরল ও বুদ্ধিবাদী হতো। এর কোনো সুদৃঢ় অভিজ্ঞতামূলক ভিত্তি ছিল না এবং কিছু সীমিত অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া আমরা কেমন করে অগ্রসর হতে পারি তা এখানে নেই। ডেকার্ট কমপক্ষে মনে করতেন এর কোনো বিকল্প নেই, এটাই ছিল তাঁর ভুল। তবে ঈশ্বরের অনিবার্য সত্তার প্রত্যয়ের সাথে বুদ্ধির পৃথক কার্যের সংযোগ সাধনে তিনি ভুল করেন নি।[১১]

লিউইস কার্যকারণ সংক্রান্ত যুক্তিটাকেও পুনর্বিন্যাস করেন। তাঁর মতে,যখন ঈশ্বরকে সব কিছুর ব্যাখ্যা, ভিত্তি বা আদি কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়, তখন এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ আমরা প্রত্যেকটি ঘটনার কারণ খুঁজি। কারণ, কোনো কিছু এমনিতে ঘটতে পারে এমনটা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। এভাবে স্বাভাবিক প্রয়োজনেই ঈশ্বরের মধ্যে আমরা সামগ্রিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাই। উদাহরণস্বরূপ,যখন কোনো পিস্তল থেকে গুলি বের হয়, এর কারণ কী?কারণ,আমরা গুলি করি। কীভাবে তা ঘটে? কারণ,গান পাউডার, অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ইত্যাদির প্রকৃতি এ ধরনের। কিন্তু যখন গুলি করা হয় তখন এগুলোর বিস্ফোরণ হওয়া উচিত কেন? কারণ, রাসায়নিক বিক্রিয়া। কিন্তু কেন এই ধরনের উপাদানগুলোর এমন আচরণ করা উচিত? কারণ, এখানে সংশ্লিষ্ট অণু পরমাণুগুলো এ ধরনের কাজ করে। পদার্থবিদকে তখন রসায়নবিদ উদ্ধার করেন। কিন্তু পদার্থবিদ যেভাবে চান বস্তু কেন সে রকম আচরণ করে? যা হোক এই উত্তরগুলো পূর্ণাঙ্গ।[১২] লিউইস এই ধরনের উদাহরণের মাধ্যমে বলেন, আমরা এভাবে অনন্ত প্রশ্নের অবতারণ করতে পারি। কিন্তু শেষ প্রশ্নের উত্তর পাই না। তখনই একটা ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরের কাছে আমরা পৌঁছি। কিন্তু কারণের মধ্যে এর কোন আবশ্যিক সম্পর্ক আছে কি না? তিনি বলেন, আমরা এধরনের কোনো অনিবার্যতা পর্যবেক্ষণ করতে পারি না কিংবা আবশ্যকীয়তাও প্রত্যক্ষ করি না। কিন্তু আরোহের মাধ্যমে ঘটনা পরম্পরায় এবং বিশ্বজগতের নিয়মের রাজত্বে আমরা অনিবার্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। লিউইস বলেন, তিনি মনে করেন না এটা একটা সফল প্রচেষ্টা।

অন্যদিকে হিউম কার্যকারণ সম্পর্কের আবশ্যকীয়তাকে মনোবৈজ্ঞানিক ঘটনা বলে যে দাবি করেন তাও লিউইসের মতে সঠিক নয়। একটি গভীর বা অলংঘনীয় প্রকারের আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে যা ভবিষ্যতে ঘটবে এমন ব্যাখ্যা না দিয়ে আমরা পারি না, কিংবা সেখানে অবশ্য তা থাকবে, এমনকি যদি আমরা সেটা এই মুহূর্তে নাও পেয়ে থাকি। এটা কোনো অনুমান নয়, বরং নিশ্চয়তা এবং একটি প্রত্যয় এবং কেবলই তা মনস্তাত্ত্বিক বিষয় নয়। এটা আদৌ সম্ভব নয় যে, সম্পূর্ণ আকস্মিক কোনো ঘটনা থাকা উচিত। আমরা এমনটা আশা করতে পারি না। বাস্তবে অবশ্য প্রতিটি ঘটনার একটি ব্যাখ্যা থাকবে। এখানে এ ধরনের আকস্মিক দৈব ঘটনা স্বীকারের ফলে বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তির জন্য একটি সমস্যা হতে পারে। অর্থাৎ প্রতিটি ঘটনার একটি কারণ থাকবে এ

Dhaka University Institutional Repository

কথাটির মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করে। লিউইস এর জবাবে বলেন,"বিশ্ব জগতের চূড়ান্ত স্বব্যাখ্যামূলক প্রকৃতি যে পদ্ধতিতে যুক্ত সেই প্রক্রিয়াটিকে যদি এখানে কার্যকারণ সম্পর্কে পাওয়া যায় তাতে খুব সমস্যার কিছু নেই।"[১৪]অর্থাৎ বিশ্বজগতে একটি জিনিসের সাথে যেভাবে আরেকটি জিনিস সুশৃঙ্খলভাবে যুক্ত হতে থাকে তাকে কার্যকারণ বলায় দোষের কিছু নেই।

কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্যে সৃষ্ট সমস্যার সমাধানে লিউইস আবার স্বজ্ঞার কথা বলেন।[১৫] তাঁর মতে, ঈশ্বরের আবশ্যিক সত্তাকে উপলব্ধির জন্য এটা একটা উপযুক্ত মাধ্যম। তবে ঈশ্বরের স্বজ্ঞা অন্যান্য স্বজ্ঞার মত নয়; যেমন কেউ একজন নারীর ধ্যান করলে তার যে স্বজ্ঞা আসে কিংবা হিটলারের ধ্যান করলে যে ধরনের স্বজ্ঞা আসে। এতে কিছু অসুবিধা থাকলেও লিউইস এটাকে গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে,অন্যান্য সসীম সত্তার মত ঈশ্বরের স্বজ্ঞা হতে পারে না, বরং তা হবে সৃষ্টিগত সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে প্রত্যক্ষভাবে মনের মাধ্যমে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষণ করা। তবে এ সম্পর্কে ইসলাম খ্রিষ্টান ও ইহুদি ধর্মের মধ্যে বিরোধ আছে। তবে স্বজ্ঞা ঈশ্বরের সাথে অনুমানভিত্তিক সংযোগ নয়, বরং প্রত্যক্ষ সংযোগ; সমস্ত যুক্তির উর্ধ্বে তাকে মেনে নেওয়ার বাধ্যবাধকতা, যেমনটি নীতিবিদ্যায় দেখা যায়।

লিউইসের কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি রহস্যবাদী যুক্তি।[১৬] লিউইস বলেন, ঈশ্বরের ধারণা এক অনন্য ধারণা। অন্য যে কোনো ধারণার চেয়ে তাঁর ধারণা পৃথক। এই ধারণা অভিজ্ঞতামূলক নয় বলারও সুযোগ নেই । মরমী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারি, যার সূচনা স্বজ্ঞার মাধ্যমে হয়ে থাকে। গণিত কিংবা অভিজ্ঞতামূলক কিছু নীতিমালা কিংবা নীতিবিদ্যায় সাম্প্রতিক অনেক ধারণা থাকলেও সেগুলোকে আমরা সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করার দাবি করতে পারি না। এগুলোর ব্যাপারে কঠোরতর কোনো ব্যাখ্যা হয়ত নেই, যেমন, ভালোত্ব-র কোনো প্রকার অপ্রাকৃতিক বিশ্লেষণই সম্ভব নয়। একইভাবে পদার্থিক জগৎ, গাণিতিক কিংবা কার্যকারণগত বিষয়ের কথা বলতে পারি। এগুলোর বর্ণনা হয়ত সম্ভব নয়, তবে এগুলোর সাথে যুক্ত বিভিন্ন জিনিসের মাধ্যমে আমরা এগুলোকে উপলব্ধি করতে পারি। যেমন- পদার্থবিদ্যার আলোক তরঙ্গ, চৌম্বক ক্ষেত্র, পরমাণু কিংবা আণবিক শক্তির ধারণা। কোনো বিজ্ঞানী জানেন না এগুলো আসলে কি? যেমন রং সম্পর্কে মানুষের ধারণা; এগুলোও সে রকম। এসব ব্যাপারে অনেক কিছু আমরা বলতে পারি, কিন্তু এ ধরনের বৈজ্ঞানিক বিষয়ের রহস্যের সমাধান কারো কাছে নেই।

তাঁর মতে,আমাদের মনটাও একটা রহস্য। আমরা অন্যের মন সম্পর্কে জানি না। তবে এতটুকু জানি কেউ সন্তুষ্ট বা রাগান্বিত কি না যা সাধারণ আলোচনায় আসে। বাস্তবে অন্যের মন সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা খুব জটিল ব্যাপার, জানলেও তা হয়ে থাকে ভ্রান্তি, ভুল উপলব্ধি ও সম্ভাব্যতা নির্ভর।

Dhaka University Institutional Repository

আমার মধ্যে এখন যে জ্ঞান আছে তা সম্পূর্ণভাবে অন্যের মধ্যে নেই। যারা এটাকে সমস্যা মনে করেন না তাদের জন্য এটা কিছুই না। কারণ এটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদর্শনের বিষয় নয়। এটা অনুমান করা যায়, বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু অন্যের মন সম্পর্কে জানতে কে বাধার সৃষ্টি করে? প্রকৃতপক্ষে সব সসীম অর্জনের একটি বাস্তব, চূড়ান্ত ও অপরিহার্য সীমানা থাকাটা স্বাভাবিক।

তিনি যে রহস্যের কথা বলেন তা উচ্চতর গণিতকে যারা রহস্য মনে করেন তাদের মত নয়, কিংবা গোয়েন্দা কাহিনীও নয়। বরং এই রহস্য হলো যার ব্যাখ্যা সম্ভব নয় তা স্বীকার করা । বিশ্বজগৎ শূন্য থেকে উদ্ভব হতে পারে কি না এ ধরনের প্রশ্ন থেকে রহস্য। লিউইস বলেন, আমাদের অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতার কারণে রহস্যের সূচনা, তবে ইতিবাচক অর্থেও রহস্যের ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমন দেশ ও কালের সমস্যা। তিনি বলেন, দেশের ধারণাটি একটি অসীমতার সমস্যা (ad infinitum) এবং হতবুদ্ধি সৃষ্টিকারী। আর এজন্য এর পক্ষে তিনি আর যুক্তি দিতে পারেন না। তিনি অন্যদেরকে এই বিষয়ে চিন্তা চালিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। যদি তারা তাই করেন তাহলে এমন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যেখানে বিশ্বজগৎ একটি Supra rational চরিত্র প্রদর্শন করে যার রহস্যকে আমরা কখনো হ্রাস করতে পারি না। এ ভাবেই লিউইস রহস্যের (mystery) মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে পদার্থবিদ্যার রহস্যে ঈশ্বরই তার সমাধান, অন্যের মন সম্পর্কে একমাত্র ঈশ্বরই জানেন এবং সেই বাধা তিনিই অতিক্রম করতে পারেন।

লিউইস প্রচলিত দেহ-মন সম্পর্কিত আচরণবাদী মতেরও সমালোচনা করেন। গিলবার্ট রাইল ছিলেন এ মতের প্রধান সমর্থক যা তাঁর *The Concept of Mind* গ্রন্থে এসেছে। আচরণবাদ অনুযায়ী আমরা চেতনা সম্পর্কিত যত ধারণা পোষণ করি সেগুলি দৈহিক আচরণে প্রকাশ পায়। রাইল ডেকার্টের দ্বৈতবাদের কঠোর সমালোচনা করেন। রাইল তাঁর এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়টির নাম দিয়েছেন "Descartes' Myth" আর এখানে প্রথম অনুচ্ছেদটিই শুরু করেন দ্বৈতবাদকে ব্যঙ্গ কওে দেওয়া নাম 'স্বীকৃত মতবাদ' (Official Doctrine)শিরোনামে। তিনি ডেকার্টের দ্বৈতবাদকে এভাবে বর্ণনা করেন,

> সম্ভবত মূর্খ ও শিশু ছাড়া প্রতিটি মানুষের একটি দেহ ও একটি মন আছে আবার তাদের কেউ বলতে পছন্দ করেন, মানুষ মানেই হলো একটি দেহ ও একটি মন উভয়ই মানুষের দেহ ও মন সাধারণত ঘোড়ার গাড়িতে যেভাবে ঘোড়া ও গাড়ি যুক্ত থাকে (harness) সেভাবে একত্রে অবস্থান করে কিন্তু তার মন মৃত্যুর পরও অস্তিত্বশীল ও সক্রিয় থাকে।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ ডেকার্ট ও তাঁর অনুসারীদের বিশ্বাস হচ্ছে একটি মানুষের দেহ ও মন দু'টি ভিন্ন জিনিস। কিন্তু রাইল মনে করেন মানুষের মন বা আত্মা বলতে কিছু নেই। লিউইস বলেন, রাইল ডেকার্টের মতবাদের ব্যাখ্যায় মূর্খ্য ও শিশুকে বাদ দিয়েছেন অথচ ডেকার্ট 'Idiot'বা 'Infant'কে এভাবে বাদ দেন নি। রাইলের মতবাদকে তিনি আবেগ-নির্ভর বলে দাবি করেন। *The Elusive Mind* [১৮] গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লিউইস রাইলের কিছু মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর সমালোচনা করেন। প্রসঙ্গত বলতে হয়, লিউইস ডেকার্টের দ্বৈতবাদের সমর্থনকারী ছিলেন। আর দ্বৈতবাদ অনুসারে দেহ ও মন পৃথক সত্তা এবং মৃত্যুর পর মন বা আত্মা অমর থাকে। তিনি বলেন, ডেকার্টের এই দ্বৈতবাদকে সমর্থন করেন প্রাচ্যবিদগণ; পাশ্চাত্যের প্লেটো ও অগাস্টিনের আত্মা সম্পর্কিত মতবাদও এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ; বার্কলি, কান্ট এবং কিছু ক্ষেত্রে লাইবনিজের মতও ছিল অনুরূপ। লিউইসের মতে, এই 'Idiot'এর মধ্যে ভালঅভিনেতাও তো থাকতে পরেন,যারা মূর্খ হওয়া সত্ত্বেও এই শিল্পে দক্ষ হতে পারেন। এদের মন না থাকার প্রশ্ন আসে না। আবার ঘোড়া ও গাড়ির(harness) যুক্ত হওয়ার সাথে তিনি তুলনা করেন মানুষের দেহ ও মনকে; এটা এক ধরনের কাল্পনিক শব্দ(metaphor) অথচ ডেকার্ট এগুলোর কোনোটিই বলেন নি। এটাতে লিউইস অবশ্যই আপত্তি করেন নি। ডেকার্ট পিনিয়াল গ্রন্থির মাধ্যমে দেহ ও মনের সংযোগ সাধনের যে ব্যাখ্যা দেন তারও সমর্থন করেন লিউইস। রাইল ডেকার্টের মতবাদকে "যন্ত্রে ভূতের ধারণা" (The dogma of the Ghost in the machine) বলে যে সমালোচনা করেন লিউইস সেটারও জবাব দেন। তাঁর মতে,এগুলো রাইলের আবেগমূলক প্রকাশ যা দর্শনে ব্যবহৃত হওয়া দুর্ভাগ্যজনক। তিনি আরো বলেন, মানসিক ঘটনাকে রাইলের 'Just a variety of mechanical' বলাটা যথার্থ হয় নি। কারণ মানসিক ধারণার মধ্যে কারণিক সম্পর্ক বিদ্যমান। ডেকার্ট মানসিক ঘটনাকে দৈহিক ঘটনার চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক বলেন নি; বলেন, মনের উপর আমাদের প্রত্যক্ষ প্রবেশ আছে যা প্রাকৃতিক ব্যাপার। ডেকার্ট-সমর্থকদের রাইল বলেন, তারা Avert Disaster এর দিকে ধাবিত হন, অথচ এটা সঠিক নয়, বরং রাইল নিজে সেদিকে ধাবিত হন। কারণ চিন্তার বিপর্যয় রাইলের ঘটেছে। লিউইস বলেন, যদি মনের কাজ দেহের মতই হয়, তাহলে দেহ যেহেতু যান্ত্রিক নিয়মের অধীন সুতরাং মনও যান্ত্রিক নিয়মের অধীন হবে অবশ্যই। যেহেতু পদার্থিক জগৎ পূর্ব নির্ধারিত তাই মানসিক জগৎও পূর্ব নির্ধারিত হবে। এতে মূলত ইচ্ছার স্বাধীনতার অস্তিত্বই থাকে না। ডেকার্টের মতবাদকে রাইল "শ্রেণি বিভ্রান্তি"র (category mistake)স্বীকার বলেও ব্যঙ্গ করেন। রাইলের ভাষায়,

Dhaka University Institutional Repository

একজন বিদেশি আগন্তুক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে এসে এর বিভিন্ন কলেজ, লাইব্রেরি, ভবন প্রভৃতি ঘুরে এসে জিজ্ঞেস করলেন,'বিশ্ববিদ্যালয় কোথায়?' [১৯]

অর্থাৎ,মানুষের দেহ ও মনকে পৃথকভাবে দেখা হলে বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজে না পাওয়ার মত মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে না। রাইল এটাকেই 'শ্রেণি বিভ্রন্তি' আখ্যা দেন আর তাঁর মতে, এরই স্বীকার হয়েছেন ডেকার্ট ও তাঁর অনুসারীগণ।কিন্তু লিউইস মনে করেন বরং এখানে রাইল নিজেই শ্রেণি বিভ্রান্তির স্বীকার। করণ,দেহ ও মনের মধ্যে তিনি মনকেই খুঁজে পাচ্ছেন না।[২০] লিউইস আরো বলেন,"আমরা মানুষের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি কারো মন আছে অথবা খুব ভাল একটি মন আছে; যেমন আমি খুব ভালকরেই বলতে পারি,আমার একটি দেহ আছে।"[২১] অর্থাৎ দেহের মতই অনিবার্যভাবে মন অস্তিত্বশীল।

লিউইস সমকালীন বৃটিশ দর্শনের বিখ্যাত নাম। আমরা এতক্ষণ লক্ষ করেছি, তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর প্রচলিত যুক্তিগুলোর সংস্কার করে কিছু নতুন যুক্তি পেশ করেন, দেহ ও মন সম্পর্কিত জড়বাদী মতগুলোর খণ্ডন করেন। অন্যসব অধিবিদের মত তিনিও আত্মার অমরতা এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির উপর যুক্তি প্রদান করেন। এরিস্টটল,একুইনাসের মত তিনিও অধিবিদ্যার জ্ঞানকে সর্বোচ্চ জ্ঞান মনে করেন। বিশেষ করে অধিবিদ্যার সাম্প্রতিক সমালোচনাগুলোকে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে খণ্ডন করেন। তাঁর অধিবিদ্যা সংক্রান্ত অবদান আলোচনার মাধ্যমে আমি চারজন অধিবিদের আলোচনা এখানে শেষ করছি।

তথ্য নির্দেশ:

এরিস্টটল

১. http:// www.plato.stanford.edu/aristotles metaphysics,9/6/2008
২. http:// www.muslimphilosophy.com,2012
৩. (ক).ড. আবদুল জলিল মিয়ার অনুবাদে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন, চলিত ভাষায় উপস্থাপন,সাবস্টেন্স এর বাংলা 'দ্রব্য' লেখা।
৩. *এরিস্টটলের অধিবিদ্যা*, (অনু. আব্দুল জলিল মিয়া), ঢাকা:বাংলাএকাডেমী, ১৯৮৮ পৃ. ৩
৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪
৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬,৭
৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭,৮
৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯
৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯
৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২
১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২
১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩
১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪
১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

১৪. বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস [প্রাচীন ও ক্যাথলিক দর্শন: নির্বাচিত অংশ]*, (অনু. প্রদীপ রায়), ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন,২০০০ পৃ. ১৬৩
১৫. http:// www.plato.stanford.edu/aristotles metaphysics,9/6/2008
১৬. *প্রাগুক্ত, এরিস্টটলের অধিবিদ্যা*, পৃ.৮১
১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮,৮৯
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪-১২৬
২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩
২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩
২২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪
২৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩
২৪. *প্রাগুক্ত*, বার্ট্রান্ড রাসেল, ২০০০,পৃ.১৫৭
২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২
২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪
২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬
২৮. *প্রাগুক্ত*, বার্ট্রান্ড রাসেল,২০০০,পৃ. ১৬২
২৯. *প্রাগুক্ত, এরিস্টটলের অধিবিদ্যা*, পৃ.৩২৬
৩০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩০
৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৯
৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৩৮-৩৯
৩৩. *প্রাগুক্ত*, বার্ট্রান্ড রাসেল,২০০০, পৃ. ১৬৩
৩৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫
৩৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬
৩৬. Fredrick Copleston, S.J.: *A History of Philosphy*(vol-iii) Maryland:The Newman press,1953 p.411
৩৭. *Ibid*, p.412
৩৮. *Ibid*, p.414-5
৩৯. উইল ডুরান্ট, দর্শনের ইতি কাহিনী (অনু.আবুল ফজল),ঢাকা:বাংলা একাডেমী,১৯৮০,পৃ.১০১
৪০. *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০১
৪১. *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০৩
৪২. www.muslimphilosophy.com/aristotle,2012

একুইনাস

১. http://Plato. Stanford.edu/entries/Aquinas.30/9/2009
২. Weber, A, *History of Philosophy* (tr. F. Thilly), New York:Charles Scribner's Sons, 1905, p. 246
৩. বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস [প্রাচীন ও ক্যাথলিক দর্শন: নির্বাচিত অংশ]*, (অনু. প্রদীপ রায়), ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন,২০০০,পৃ.২১৭
৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬
৫. Aquinas, *Summa Theologica*, Ques. 2, Para. 10-14
৬. *Ibid*, para. 15
৭. *Ibid*, para. 15
৮. *Ibid*, para. 16
৯. Aquinas, *Summa Contragentiles*, Book-1, Chap.1, Para-1
১০. *Ibid*, Book-1, Chap.2, Para-1
১১. *Ibid*, Chap.4, Para-3
১২. *Ibid*, Para,7-8
১৩. *Ibid*, Chap. 14, Para-1
১৪. *Ibid*, Chap. 15, Para- 1,2
১৫. *Ibid*, Chap.17 , Para- 1,3

১৬. *Ibid*, Chap. 20, Para- 1
১৭. *Ibid*, Chap. 28, Para- 1-10
১৮. *Ibid*, Chap. 39, Para- 1-5
১৯. *Ibid*, Chap. 42, Para- 20-21
২০. *Ibid*, Chap. 50
২১. *Ibid*, Chap. 55, Para- 3-5
২২. *Ibid*, Chap. 59-62. ২২(ক).এই অনুবাদ ড.প্রদীপ রায়ের
২৩. *প্রাগুক্ত,* বার্ট্রান্ড রাসেল, ২০০০, পৃ.২২১
২৪. *Contragentiles*, Book-2, Chap.4
২৫. *Ibid*, Chap. 21
২৬. *Ibid*, Book-3, Chap.1
২৭. *প্রাগুক্ত,* বার্ট্রান্ড রাসেল,২০০০, পৃ.২২৬-২৮
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

<u>ব্রাডলি</u>

১. http://plato.stanford.edu/entries/bradley.3/3/2009
২. *Ibid*
৩. Bradley, F.H.; *Appearence and Reality.* 6^{th} Impresion, London: George Allen & Unwin Ltd.1916, pp. 1-3
৪. *Ibid*, p. 2
৫. *Ibid*, p. 3
৬. *Ibid*,p.4
৭. *Ibid*, pp. 3,4
৮. *Ibid*,p.4
৯. *Ibid*, p. 20
১০. *Ibid*, p. 26
১১. *Ibid*, pp. 41-42
১২. *Ibid*, p. 76 (অনু.আমিনুল ইসলাম,*সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন* গ্রন্থে)
১৩. *Ibid*, p.79
১৪. *Ibid*, p.83
১৫. *Ibid*, pp. 146-47
১৬. *Ibid*,p.140
১৭. Rashdall, H; *The Metaphysics of Mr. F.H. Bradley,* London:The British Academy, 1912,p.9
১৮, *Ibid*, p.9
১৯. *Ibid*, p.11
২০. *Ibid*, Bradley, F.H.;1916, p.305
২১. *Ibid*, pp. 201-202
২২. *Ibid*, p. 445
২৩. *Ibid*, p. 446
২৪. *Ibid*, p. 446
২৫. *Ibid*, p. 447
২৬. *Ibid*, p. 448
২৭. *Ibid*, p. 453
২৮. *Ibid*, p. 511
২৯. *Ibid*, p. 522
৩০. *Ibid*, p.522
৩১. *Ibid*,Rashdall,1922, p.10

Dhaka University Institutional Repository

৩২. বার্ট্রান্ড রাসেল,*বহির্জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান*, (অনু. আব্দুল বারী), ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮,পৃ. ৬
৩৩. http://plato.stanford.edu/entries/bradley.3/3/2009
৩৪. *Ibid*
৩৫. বার্ট্রান্ড রাসেল, দর্শনের রূপরেখা (অনু. আবদুল মতীন),ঢাকাঃ অনন্যা,২০০২,পৃ.২৪০
৩৬. http://plato.stanford.edu/entries/bradley.3/3/2009

এইচ ডি লিউইস

1. http://wbo.llgc.org.uk/hd lewis/2009
2. http://philpapers.org/hd lewis
3. Lewis, H.D. , *Our Experience of God*, London:George Allen & Unwin Ltd., 1959, p. 13
4. *Ibid*, p. 13
5. Lewis, H.D. , "God and Mystery" , in I.A.N. Ramsey, (ed.) *Prospect for Metaphysics*, London:George Allen & Unwin Ltd, 1961, pp. 206-237
6. *Ibid*, Lewis, H.D.,1959, p. 42
7. সৈয়দ কমরুদ্দীন হোসেইন, *কান্টের দর্শন*, ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬, পৃ. ৯৫
8. *Ibid*,Lewis, H.D.,1961, p. 219
9. *Ibid*, p. 220
10. *Ibid*, p. 223
11. *Ibid*, p. 221
12. *Ibid*,Lewis, H.D. ,1959, p. 38
13. *Ibid*,Lewis, H.D. 1961, p. 228
14. *Ibid*, p. 230
15. Lewis, H.D. , 1959, p. 45
16. *Ibid*, pp. 45-46
17. Gilbert Ryle, *The Concept ofMind,* London:Hutchinson's University Library,1959,p.11
18. www.gifford lectures.org/ The Elusive Mind (1966-1968)
19. Gilbert Ryle, *The Concept ofMind,* ,p.16
20. www.gifford lectures.org/ The Elusive Mind (1966-1968)
21. *Ibid*

Dhaka University Institutional Repository

৩য় অধ্যায়

অধিবিদ্যা সম্পর্কে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের অবস্থান বিচার

দর্শনের ইতিহাসে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ একটি বিপ্লবী চিন্তাধারার নাম। ভাববাদী, আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞাবাদী কিংবা আধিবিদ্যক মতবাদের বিরুদ্ধে এটি এক প্রচণ্ড আন্দোলন। যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদ (logical empiricism),বৈজ্ঞানিক দর্শন (scientific philosophy) এবং নব্য প্রত্যক্ষবাদ (neo-positivism) নামেও এই মতবাদের ব্যাখ্যা করা হয়। এখানে হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ ও লাইবনিজের বুদ্ধিবাদের সমন্বয় ঘটে । গণিত, যুক্তিবিদ্যা ও ভাষাতাত্ত্বিক দর্শনের মিলন হয় এখানে। এটা ছিল এক ধরনের ভাষাতাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণী দর্শন। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্মানির বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক এই মতবাদের অনুসারীদের সংঘ যথাক্রমে ভিয়েনা সার্কেল এবং বার্লিন সোসাইটি এবং উভয়ের সমর্থনকারী বৃটিশও মার্কিন দার্শনিকদের মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯২০ ও '৩০ এর দশকে যাত্রা করে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ। প্রতিষ্ঠার পরপরই তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হয় এই মতবাদ। আমি এই অধ্যায়ে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের একটি পর্যালোচনা উপস্থাপনের চেষ্টা করব।

উৎপত্তি ও ইতিহাস

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের মূল অনুপ্রেরণা আর্নস্ট ম্যাক (১৮৩৮-১৯১৬), গটোলব ফ্রেগে (১৮৪৮-১৯২৫), বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০), ভিটগেনস্টাইন (১৮৮৯-১৯৫১)প্রমুখ। তাছাড়া তৎকালীন পদার্থবিদ, বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বেরও প্রভাব ছিল এই আন্দোলনে। গণিত, যুক্তিবিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে একদল তরুণ-দার্শনিক সবকিছুকে বিজ্ঞানের আলোকে মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করেন। ফ্রেগেকে বলা হয় আধুনিক যুক্তিবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রচলিত সিমান্টিক ও ভাষা দর্শনের অগ্রপথিক ছিলেন। রাসেল, কার্নাপ ও ভিটগেনস্টাইনের উপর তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। আর এ কারণে তাঁকে বিশ্লেষণী দর্শনেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। জার্মান এই গণিতবিদ, যুক্তিবিদ ও দার্শনিক এ কারণেই যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের মূল প্রেরণা। ফ্রেগের ছাত্র ছিলেন ভিটগেনস্টাইন এবং ১৯১০ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত কার্নাপও ছিলেন তাঁর ছাত্র। ১৮৯৫ সালে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে সৃষ্ট "Philosophy of Inductive Science" ডিপার্টমেন্টের প্রধান হিসেবে যোগ দেন বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদের সমর্থক ও প্রচণ্ড অধ্যিবিদ্যা-বিরোধী আর্নস্ট ম্যাক।[১]

১৯০৭ সালে গণিতবিদ হ্যান্স হান, অর্থনীতিবিদ অটো নিউরেথ, পদার্থবিদ ফিলিপ ফ্রাংক ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা করতেন। অন্যদিকে তরুণ

Dhaka University Institutional Repository

ভিটগেনস্টাইন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অস্ট্রিয় সামরিক বাহিনীতে থাকাকালীন শত্রুর হাতে বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় তিনি *Tractatus Logico Philosophicus* গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপি রচনা করেন। ১৯২১ সালে যুদ্ধ পরবর্তীতে জার্মান ভাষায় ও ১৯২২এ ইংরেজি ভাষায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলে সৃষ্টি হয় তুমুল আলোচনা- বিতর্ক। ১৯২২ সালে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্নস্ট ম্যাকের পদে অধিষ্ঠিত হন মরিজ শ্লিক,যিনি ইতোমধ্যেই বিজ্ঞান-দার্শনিক ও বিশেষত আইনস্টাইনের একজন ভাষ্যকার হিসেবে পরিচিতি পান। শ্লিককে কেন্দ্র করেই ভিয়েনা সার্কেল প্রতিষ্ঠিত হয় যার অন্যান্য প্রাথমিক সদস্য ছিলেন ফিলিপ ফ্রাংক, হ্যান্স হান ও অটো নিউরেথ।[২] গোড়ার দিকে প্রতি বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন ভবনে তারা মিলিত হতেন এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয় প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করতেন। ১৯২৬ সালে রুডলফ কার্নাপ এখানে আমন্ত্রিত হন এবং অচিরেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। ভিটগেনস্টাইন আলোচনায় না বসলেও শ্লিক ও ওয়াইজ ম্যান তাঁর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। ১৯২৮ সালে "Ernst Mach Society" নামে এই সংঘ প্রচারণা চালায়। অন্যদিকে বার্লিনে এ সময় হ্যান্স রেইচেনবাক এর নেতৃত্বে "Society for Empirical Philosophy"গঠিত হয়।[৩] ১৯২৮ এর নভেম্বরে ভিয়েনা সার্কেলের (ম্যাক সোসাইটি) প্রতিষ্ঠাকালীন অধিবেশন হয়; এর প্রথম সভাপতি হিসেবে মরিজ শ্লিক, সহ-সভাপতি হ্যান্স হান, এবং সেক্রেটারিয়েট সদস্য নির্বাচিত হন নিউরেথ ও কার্নাপ।[৪] ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বরে এর নিজস্ব নাম, মেনিফেস্টো প্রভৃতি নিয়ে একটি কনফারেন্স হয়। কার্নাপ, হান, নিউরেথ স্বাক্ষরিত প্রথম প্রকাশনা হচ্ছে *The Scientific World Conception: The Vienna Circle* যার মধ্যে এই চক্রের উদ্দেশ্য, পরিচিতি প্রভৃতি স্থান পায়। ১৯৩০ সালে বার্লিন সোসাইটির মিলিত প্রচেষ্টায় কার্নাপ ও রেইচেনবাক এর সম্পাদনায় *Annales der Philosophie* সাময়িকী প্রকাশিত হয়। ১৯২৮ থেকে '৩৬ পর্যন্ত শ্লিক ও ফ্রাংকের সম্পাদনায় *Writings on the Scientific World Conception* নামে এই চক্রের সিরিজ পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত নিউরেথ এর সম্পাদনায় *Unified Science* সিরিজ প্রকাশিত হয়। ১৯৩১ সালে এই মতবাদের নতুন নাম 'Logical Positivism' (যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ) দেন AE Blumberg এবং Herbert Feigl.[৫]

ইতোমধ্যে জার্মানিতে নাৎসীবাদের উদ্ভব হয়। নাৎসীবাদের উত্থানে এই মতবাদের অনুসারীগণ দেশ ছেড়ে চলে যান। ১৯৩১ এ কার্নাপ ভিয়েনা ছেড়ে প্রাগে যান। ফেইজল যান মিনেসোটা, হান মৃত্যুবরণ করেন ১৯৩৪ সালে, ১৯৩৬ এ কার্নাপ শিকাগোতে স্থানান্তরিত হন, মরিজ শ্লিক মানসিক বিকারগ্রস্ত একজন ছাত্র কর্তৃক নিহত হন ১৯৩৬ সালে। এতে সার্কেলের অনুষ্ঠান অনিয়মিত হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

আর ১৯৩৮ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই সংঘের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়।[৬] তবে এর অনুসারীগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ায় অন্যভাবে এর বিস্তৃতি ঘটে। কার্নাপ আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার দার্শনিকদের প্রভাবিত করেন। আমেরিকায় এই মতের অনুসারী ছিলেন সি.ডব্লিও.মরিস, আর্নেস্ট নেগেল। ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির এল সুসান, জন উইজডম; অক্সফোর্ডের গিলবার্ট রাইল, এয়ার; ফ্রান্সের Louis Rougier প্রমুখ এই মতের সমর্থক ছিলেন। তবে বৃটিশদার্শনিক এ.জে. এয়ার (১৯১০-১৯৮৯) ছিলেন এই মতের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে মরিজ শ্লিক, রুডলফ কার্নাপ ও এয়ারের রচনাই যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের পরিচয় তুলে ধরে।

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের মৌলিক চিন্তাধারার মধ্যে রয়েছে বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বচনের ব্যাখ্যা, পরখনীতি, অধিবিদ্যা বর্জন, বিজ্ঞানের ভাষা, নীতিবিদ্যার ব্যাখ্যা প্রভৃতি। আমি সংক্ষেপে এ প্রসঙ্গে এখন আলোচনা করব।

১। বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বচনঃ

ভিটগেনস্টাইনের *ট্রাকটেটাসে*'র মূল কথা ছিল, "যা কিছু বলতে হবে তা স্পষ্ট করেই বলতে হবে এবং যা বলা যাবে না তাতে অবশ্যই আমাদের চুপ থাকতে হবে।"[৭] আর এটাই ছিল যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের মূল প্রেরণা। প্রকৃতপক্ষে এই উক্তি সবাই সমর্থন করেন কিন্তু এর উপর ভিত্তি করে তিনি পরে যে সব কথা বলেন সেগুলো নিয়েই শুরু হয় বিতর্ক। *ট্রাকটেটাসের* ভূমিকায়- রাসেল বলেন, ভিটগেনস্টাইন এই গ্রন্থে বোঝাতে চেয়েছেন, "ভাষার মৌলিক কাজ হলো ঘটনার স্বীকার বা অস্বীকার করা; কোনো ভাষার বাক্য প্রকরণের নিয়মানুযায়ী একটি বাক্যের অর্থ তখনই নির্ধারিণ হবে যখন এর অন্তর্ভুক্ত শব্দগুলোর অর্থ জানা যাবে।"[৮] অর্থাৎ তিনি মনে করতেন দেশ কালে সংঘটিত ঘটনার বর্ণনা বা স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির প্রকাশই কোনো ভাষার মৌলিক কাজ। প্রতিটি ভাষাই বর্ণ,শব্দ ও বাক্যের মাধ্যমে গঠিত হয়। কোনো বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলোর কোনোটির অর্থ যদি স্পষ্টভাবে জানা না যায় তাহলে সে বাক্যের অর্থ স্পষ্ট হবে না।

ভিটগেনস্টাইন অর্থপূর্ণ বচনকে মৌলিক ও যৌগিক বলে বিভক্ত করেন। মৌলিক বচন জগৎ সংক্রান্ত ও যৌগিক বচন পুনরুক্তিমূলক।[৯] ভিটগেনস্টাইনের *ট্রাকটেটাসের* প্রভাবে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের প্রধান সমর্থক রুডলফ কার্নাপ এ প্রসঙ্গে দু'টি বিখ্যাত গ্রন্থ লেখেন- *The Logical Syntax of Language* এবং *Philosophy and Logical Syntax.* এছাড়াও অন্যান্য প্রবন্ধে এয়ারসহ মরিজ শ্লিক সবাই বিশ্বাস করতেন অর্থপূর্ণ বচনকে কেবল দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়: বিশ্লেষক

(analytic) এবং সংশ্লেষক (synthetic)। এর সাথে আরো দু'টি ধারণা অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়- অভিজ্ঞতাপূর্ব (a priori) এবং অভিজ্ঞতা নির্ভর (a posteriori)। বিশ্লেষক বচন হচ্ছে, উদ্দেশ্যের মধ্যেই যার বিধেয় অবস্থান করে, যেমন সব কুমার অবিবাহিত। কুমার মানেই হচ্ছে অবিবাহিত। অন্যদিকে সংশ্লেষক বচনের উদ্দেশ্যে বিধেয় থাকে না বরং তা নতুন তথ্য প্রদান করে। যেমন পুকুরে মাছ আছে। প্রত্যক্ষবাদীদের মতে বিশ্লেষক বচন পুনরুক্তিমূলক বচন (tautology)। এ ধরনের বচন পাওয়া যায় যুক্তিবিদ্যা, গণিত, জ্যামিতি প্রভৃতিতে। অন্যদিকে সংশ্লেষক বচন ব্যবহৃত হয় পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতিতে। ফ্রেগে ও রাসেলের অনুসরণ করে তাঁরা বলেন, যুক্তিবিদ্যা ও গণিত কোনো বাস্তব তথ্য দিতে পারে না কেবল পুনরুক্তি ছাড়া। এ ধরনের বিষয় গুলো কিছু স্বত:সিদ্ধ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। অন্যদিকে সংশ্লেষক বচন নিয়ে বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদী মতের মধ্যে রয়েছে পার্থক্য। বুদ্ধিবাদ বলে অভিজ্ঞতা ছাড়া সংশ্লেষক বচন সম্ভব অন্যদিকে অভিজ্ঞতাবাদ বলে সম্ভব নয়। প্রত্যক্ষবাদীগণ অভিজ্ঞতাবাদের অনুসরণ করেন। বুদ্ধিবাদের মতে ঈশ্বর ও নৈতিকতা সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে সহজাত ধারণার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় যা অভিজ্ঞতা-পূর্ব। অন্যদিকে অভিজ্ঞতাবাদের অনুসারী প্রত্যক্ষবাদ অনুযায়ী অভিজ্ঞতার বাইরে কোনো কিছু প্রমাণ সম্ভব নয়। সুতরাং ঈশ্বর ও অধিবিদ্যা সংক্রান্ত সমস্ত বচন যেহেতু বিশ্লেষক নয় এবং সংশ্লেষকও নয় সুতরাং এগুলো কোনো বচনের মধ্যেই পড়ে না, আর তাই অর্থহীন। এ কথাগুলো এয়ারের *Language, Truth and Logic* গ্রন্থেও বর্ণনা করা হয়েছে।[১০]

২। পরখনীতি

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ যে নীতির মাধ্যমে অধিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব ও নীতিবিদ্যার বচনকে অর্থহীন দাবী করে তার নাম পরখনীতি। এই নীতির মূল কথা হলো বিশ্লেষণী বচন যেহেতু কোনো তথ্য বহন করে না বা নতুন জ্ঞান দেয় না তাই এগুলো আমাদের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো কেবল ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের যথার্থ ব্যবহারের নিয়ম নির্দেশ করে। এগুলোকে যাচাই করার প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে সংশ্লেষক বচনের জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞতা -প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা কিংবা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রমাণিত অভিজ্ঞতা। শ্লিক এ প্রসঙ্গে বলেন, "যাচাইযোগ্যতা, যা অর্থের জন্য পর্যাপ্ত ও আবশ্যকীয় শর্ত তা আসলে যৌক্তিক অনুক্রমের একটি সম্ভাব্যতা: এটা সৃষ্টি হয় বাক্য গঠনের এমন নিয়ম দ্বারা যার মাধ্যমে এর শব্দগুলো সুনির্ধারিত হয়।"[১১]অর্থাৎ কোনো উক্তির অর্থের জন্য যে পর্যাপ্ত ও আবশ্যকীয় শর্ত

Dhaka University Institutional Repository

থাকতে হয় তা প্রমাণিত হয় তার যাচাইয়ের মাধ্যমে। আর যাচাইযোগ্যতা মানে হলো ঐ উক্তিটি যে বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তা যথার্থভাবে বাক্যপ্রকরণ মেনেছে কি না তা জানা।

এয়ার ১৯৩৬ সালের গ্রন্থে বলেন, "একটি বাক্য কেবল তখনই অর্থপূর্ণ হবে যখন কীভাবে তা যাচাই করা যায় তা জানা যাবে এবং যখন পর্যবেক্ষণ সেটাকে সত্য বা মিথ্যা বলতে সক্ষম করবে।"[১২] এর ব্যাখ্যায় তিনি দুই ধরনের যাচাইযোগ্যতার কথা বলেন। দুই কারণে একটি বচনের যাচাই সম্ভব নয়, যেমন, চাঁদের বিপরীত পার্শ্বে পাহাড় আছে- এমন বচনের যাচাই আদৌ সম্ভব নয়। এগুলো নীতিগতভাবে যাচাইযোগ্য নয় (in principle not verifiable), আবার আরেক ধরনের বচন, যেমন কেউ নতুন একটি শব্দ উদ্ভাবন করে তা ব্যবহার করল যার সম্পর্কে অন্যদের কোনো জ্ঞান নেই, তাই ব্যাবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা যাচাইযোগ্য নয় (practically not verifiable). কিন্তু ১০ বছর পরের সংস্করণে তিনি তাঁর মতের কঠোরতা লাঘব করেন। এক্ষেত্রে তিনি আবার দুর্বল ও শক্তিশালী যাচাইযোগ্যতার কথা বলেন।[১৩] শক্তিশালী যাচাইযোগ্যতা হচ্ছে,কোনো উক্তিকে কেবলমাত্র যদি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়। যেমন, আর্সেনিক বিষাক্ত,সব মানুষ মরণশীল। আর যদি কোনো উক্তিকে বর্তমানে প্রমাণ করা না গেলেও ভবিষ্যতে তার প্রমাণের সম্ভাবনা থাকে তাহলে তা হবে দুর্বল যাচাইযোগ্যতা। যেমন,চাঁদের অপর পৃষ্ঠে পর্বত আছে। এখানে প্রথমটিকে তিনি আবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও দ্বিতীয়টিকে পরোক্ষ প্রমাণ বলে অভিহিত করেন। তাঁর ভাষায়-

> আমি এখন বলব, একটি উক্তি কেবল তখনই প্রত্যক্ষভাবে যাচাইযোগ্য হবে যদি তা পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক উক্তি হয় অথবা তা এক বা একাধিক পর্যবেক্ষণ-উক্তির সংযোগে তৈরি হবে, যা অন্তত একটি পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক উক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং অন্য কোনো আশ্রয়বাক্য থেকে অবরোহ প্রক্রিয়ায় তৈরি হবে না। আর পরোক্ষ উক্তির ব্যাপারে আমার প্রস্তাব হবে, একটি উক্তি তখনই পরোক্ষভাবে যাচাইযোগ্য হবে যদি তা নিম্নে শর্তাবলি পূরণ করে: প্রথমত, যে আশ্রয়বাক্যগুলোতে একাধিক প্রত্যক্ষ যাচাইযোগ্য বিবৃতি রয়েছে এবং সেগুলো অন্য কোনো আশ্রয়বাক্য থেকে অবরোহযোগ্য নয়; আর দ্বিতীয়ত এসব আশ্রয়বাক্য এমন কোনো উক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করবে না যা বিশ্লেষক নয়, কিংবা প্রত্যক্ষভাবে যাচাইযোগ্য অথবা স্বাধীন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম এমন পরোক্ষ যাচাইযোগ্য উক্তি। আর আমি এখন পরখ নীতিকে প্রয়োজন অনুযায়ী পুনরায় এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি, যা বিশ্লেষক না হলেও আক্ষরিকভাবে অর্থপূর্ণ উক্তি তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যাচাইযোগ্য হওয়া উচিৎ।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

এখানে দেখা যাচ্ছে, তিনি প্রত্যক্ষ যাচাইএর জন্য অন্তত একটি পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক উক্তিতে নেমে এসেছেন। আবার পরোক্ষ যাচাইএর ক্ষেত্রে আক্ষরিকভাবে অর্থপূর্ণ হওয়ার কথা বলেন। আক্ষরিকভাবে অর্থপূর্ণ হলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যাচাইযোগ্য হতে পারে। অর্থাৎ ব্যবহারিক দিক থেকে তো বটে কিন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাইয়ের সম্ভাবনা থাকলেও তাকে অর্থপূর্ণ বলা যাবে। এই আত্মসমালোচনা শ্লিকসহ অন্যদের মধ্যেও দেখা যায়। যেমন তাঁদের পরবর্তী মত অনুযায়ী সব জড় বস্তু মাটির দিকে আকৃষ্ট হয়- এ ধরনের সার্বিক উক্তি এবং চাঁদের অপর পৃষ্ঠে পর্বত আছে- এ ধরনের বর্তমানে অপ্রতিপাদনযোগ্য উক্তিকেও পরখনীতির সংশোধিত ভাষ্যানুসারে অর্থপূর্ণ বলা যায়। নীতিগত পরখের সমর্থনে শ্লিক তাঁর পূর্ববর্তী সংকীর্ণ মনোভাব সংশোধন করে বলেন,"তথ্যগত বচনাদিকে যথার্থ বচন বলা যায়, যদি নীতিগতভাবে এবং যৌক্তিক দিক থেকে তাদের প্রতিপাদনের সম্ভাবনা থাকে।"[১৫] তবে তাঁদের মতের নমনীয়তা প্রকাশ পেলেও এবং পরোক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে অনেক বচনকে স্বীকার করলেও আধিবিদ্যক বচনকে তাঁরা অর্থহীন বলে যান। কারণ তাঁদের মতে এসব বচনের আদৌ প্রমাণ সম্ভব নয়।

গ. অধিবিদ্যা বর্জন

প্রত্যক্ষবাদের প্রধান কাজ ছিল দর্শন থেকে অধিবিদ্যাকে নির্বাসন প্রদান। কার্নাপের-"The Elimination of Metaphysics through Logical Analysis of Language" প্রবন্ধের আলোকে আমি প্রত্যক্ষবাদের অধিবিদ্যা বর্জনের মতবাদটি আলোচনা করছি।

কার্নাপের মতে, যদি কেউ প্রশ্ন করেন ভিয়েনায় বসবাসকারীদের মধ্যে যাদের টেলিফোন নাম্বারের শেষ অংক ৩ তাদের সবার গড় ওজন কত কিংবা ১৯১০ সালে ভিয়েনায় ৬ জন লোক বাস করছিল, এ ধরনের বাক্যগুলো অর্থহীন। তিনি অধিবিদ্যার বচনকে এ স্তরে ফেলতে চান। তাঁর মতে কোনো ভাষা গঠিত হয় শব্দ ভাণ্ডার (vocabulary) এবং বাক্য রীতির (syntax) মাধ্যমে। একটি বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলো অবশ্যই অর্থপূর্ণ হবে এবং বাক্যগঠনের জন্য নির্ধারিত ব্যাকরণগত নিয়ম অবশ্যই সবাইকে পালন করতে হবে, তা না হলে সেই বাক্য হবে, কার্নাপের মতে, ছদ্ম উক্তি (Pseudo statement)। আর ছদ্ম উক্তি দু'টি কারণে হতে পারে, কার্নাপের ভাষায়:

> হয় এগুলো এমন একটি শব্দ ধারণ করবে, যার অর্থ থাকাটা ভ্রান্তভাবে বিশ্বাস করা হয়, অথবা বাক্য গঠনকারী শব্দগুলোকে যখন বাক্য গঠন-রীতি লঙ্ঘন করে সংযুক্ত করা হয় তখন সেগুলো কোনো অর্থ পূর্ণ উক্তি প্রকাশ করতে পারে না।[১৬]

তাঁর এই মতের আলোকে তিনি শব্দের অর্থপূর্ণতা ও বাক্যের অর্থপূর্ণতা ব্যাখ্যা করেন।

i.শব্দের অর্থপূর্ণতা

কার্নাপের মতে, যে শব্দের অর্থ আছে তা একটি ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু তা যে ধারণা দিতে চায় বাস্তবে যদি তার অস্তিত্ব না থাকে তাহলে সেগুলো হবে ছদ্ম ধারণা (Pseudo-concept)।[১৭] একটি শব্দের উৎপত্তির সময় তা যে ধারণা বহন করত ধীরে ধীরে সময়ের পরিবর্তনে সেই অর্থ পরিবর্তিত হয়ে নতুন একটি অর্থ সৃষ্টি করে। এভাবে ছদ্ম ধারণার উদ্ভব হয়। একটি শব্দের অর্থ নির্ধারিত হয় তার প্রয়োগের মানদণ্ডের উপর। অর্থাৎ কোন উদ্দেশ্যে এটা গঠিত হয়েছে তার অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণের উপর এর অর্থ নির্ভর করে। যেমন কেউ একটি নতুন শব্দ “Teavy” উদ্ভাবন করেন এবং কোন জিনিস teavy এবং কোন জিনিস তা নয়- বলে দেন, তখন এই শব্দের অর্থ জানার জন্য তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, এর প্রয়োগের মানদণ্ড কী,কিংবা কীভাবে তিনি এর অর্থ নির্ধারণ করলেন? তখন যদি তিনি বাস্তব বা অভিজ্ঞতাভিত্তিক কোনো প্রমাণ দিতে না পারেন তাহলে স্বভাবতই বলা যাবে আসলে এই ধরনের শব্দ প্রয়োগের কোনো বৈধতাই নেই। অথবা কেউ toovy নামে আরেকটি শব্দ উদ্ভাবন করে বলে দিলেন এর মানে হচ্ছে quadrangular (চতুর্ভুজাকার)। এখানেও একই সমস্যা। toovy কী তা বোঝানোর জন্য বর্ণনা না দিয়ে বরং এখানে একটি প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই ধরনের প্রতিশব্দ অর্থপূর্ণ হলেও toovy শব্দের সমার্থক হিসেবে এর কোনো প্রমাণ বা মানদণ্ড তার কাছে নেই। সুতরাং এ ধরনের শব্দ আবিষ্কার করে তা অন্য একটি শব্দের সমার্থক বলে চালিয়ে দেওয়াটা একটা হাস্যকর ব্যাপারও বটে।

ii. আধিবিদ্যক শব্দ অর্থহীন

কার্নাপ এ ধরনের অর্থহীন, অপ্রাসঙ্গিক শব্দের সাথে আধিবিদ্যক শব্দকে তুলনা করে এদের অর্থহীন বলে মন্তব্য করেন।[১৮] যেমন, একটি আধিবিদ্যক শব্দ “Principle”- যা সত্তার নীতি নিয়ে কথা বলে। অনেক অধিবিদ এটা ব্যাহার করেছেন বিশ্বজগতের সর্বোচ্চ নীতি হিসেবে। তাঁর মতে,আমরা অধিবিদকে যদি প্রশ্ন করি, `x’ হচ্ছে `y’এর নীতি এই বাক্যটি কিসের ভিত্তিতে সত্য বা মিথ্যা হবে, অধিবিদ তখন হয়ত বলবেন y, x এর সত্তার মধ্যেই বিদ্যমান, কিন্তু অধিবিদ এখানে কোনো অভিজ্ঞতামূলক পর্যবেক্ষণযোগ্য সম্পর্ক আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হন। কার্নাপের মনে করেন, Principle শব্দটির মূল Principium যার অর্থ সূচনা (beginning); এই মূল অর্থ বাদ দিয়ে অধিবিদ একে রূপক অর্থে ব্যবহার করেন। এমনি আরেকটি শব্দ God এই শব্দটির ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় ৩টি পরিস্থিতিতে এর ৩টি অর্থ প্রকাশ পায়,

(১) Mythological বা পৌরাণিক ব্যবহারে এর অর্থ, এমন একটি দেহবিশিষ্ট সত্তা যাকে অলিম্পাস পর্বতে রাখা হয়েছে যা শক্তি, ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার প্রতীক।

(২) কখনো এটা আধ্যাত্মিক সত্তার নির্দেশ করে, যার মানুষের মত দেহ নেই, কিন্তু প্রত্যক্ষ বস্তু বা প্রক্রিয়ারূপে বিদ্যমান। এই দুই অর্থে God এর অর্থ যাচাই করা যায়।

(৩) অন্যদিকে এর আধিবিদ্যক প্রয়োগ এমন কিছুকে নির্দেশ করে যা অভিজ্ঞতার সীমার উর্ধ্বে। এই তৃতীয় অর্থের সাথে পূর্বের দুই অর্থের সংযোগ নেই। এভাবে God তার মূল অর্থ হারিয়ে ফেলে এবং এ ক্ষেত্রে God এর যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় তা Pseudo definition. এখানে যৌক্তিক নিয়মের লঙ্ঘন হয়েছে এবং এই শব্দের সত্যতা যাচাইয়ের কোনো মানদণ্ড নেই।

একইভাবে কার্নাপ মনে করেন প্রচলিত বিভিন্ন আধিবিদ্যক শব্দ যেমন, ধারণা (Idea),পরম (Absolute),শর্তহীন (Unconditioned),অসীম (Infinite),সর্বোচ্চ সত্তা (the being of being),অসত্তা (non being),স্বগত সত্তা (thing in itself),পরম আত্মা (absolute spirit),সারসত্তা (essence),অহং(the Ego) ইত্যাদিকে অভিজ্ঞতার নিরিখে যাচাই করা যায় না, তাই এগুলো অর্থহীন, যেমনটি আমরা teavy বা Toovy এর ক্ষেত্রে লক্ষ করেছি।

iii.বাক্যের অর্থপূর্ণতা

শব্দের অর্থপূর্ণতার আলোচনায় কার্নাপ দেখিয়েছেন যেহেতু আধিবিদ্যক শব্দকে অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই করা যায় না তাই সেগুলো অর্থহীন। এখন তিনি বলবেন বাক্য রীতি না মানলে বাক্য গঠন হতে পারে না।[১৯] যেমন:

১. সিজার হচ্ছেন এবং

২. সিজার একটি মৌলিক সংখ্যা

এখানে প্রথম বাক্যে বাক্যরীতি লংঘন করা হয়েছে। কোনো বাক্যের বিধেয় অব্যয় হতে পারে না, তা অবশ্যই একটি বিশেষ্য বা বিশেষণ হবে। যদি বলি সিজার একজন সেনাপতি তাহলে তা অর্থপূর্ণ হতে পারে। ২য় বাক্যটিতে বাক্যবিধি লংঘন করা হয় নি, কারণ এখানে প্রথম বাক্যের সমস্যা নেই। তা সত্ত্বেও এটা অর্থহীন, কারণ একটি সংখ্যার ক্ষেত্রেই কেবল বলা যায় এটা মৌলিক সংখ্যা, কোনো ব্যক্তির স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতিবাচক কিছুই এখানে নেই।

Dhaka University Institutional Repository

iv. আধিবিদ্যক বাক্য-ছদ্ম উক্তি

উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত কার্নাপ আধিবিদ্যক বাক্যের ক্ষেত্রে প্রদর্শন করেন।[২০]কার্নাপ হাইদেগারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- "এই অনস্তিত্বের মানে কী? অনস্তিত্ব বিদ্যমান-এ কথা বললেই কি অনস্তিত্ব অস্তিত্বশীল হবে?"[২১] তিনি প্রশ্ন করেন, আমরা Nothing কে কোথায় খোঁজ করতে চাই? কীভাবে Nothing কে পেতে পারি? আসলে যার অস্তিত্ব নেই তার খোঁজ আমরা পেতে পারি না। এ ধরনের বাক্য ব্যাকরণগত ভুল ও যৌক্তিক নিয়মেও ভ্রান্ত। তাঁর মতে, আধিবিদ্যক উক্তি কেবল কোনো ধারণা বা রূপকথা নয়। রূপকথা যুক্তিবিদ্যার সাথে সাংঘর্ষিক নয় কারণ এগুলো অর্থপূর্ণ যদিও মিথ্যা। আধিবিদ্যক উক্তি কোনো কুসংস্কার নয়, কুসংস্কার সত্য বা মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু আধিবিদ্যক উক্তি মিথ্যা বা সত্য নয় বরং অর্থহীন। তথাকথিত "মানবীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা" অধিবিদ্যাকে রক্ষার একটি প্রচেষ্টা। এই মত অনুযায়ী আধিবিদ্যক উক্তিগুলো কোনো মানুষ কিংবা সসীম সত্তা দ্বারা যাচাইযোগ্য নয়। অধিবিদ্যার প্রশ্নের উত্তর কেবল অসীম সত্তাই দিতে পারেন। কার্নাপ এর উত্তরে বলেন, ৭ সংখ্যাটি কি পবিত্র? জোড় না কি বিজোড়, কোন সংখ্যা খারাপ? এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারে না। আমরা যে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি না তা অন্যের সহযোগিতায় নিশ্চিত হতে পারি কিন্তু অন্যের সাহায্যে আমরা অর্থহীন, বোধগম্যহীন কোনো কিছুর জ্ঞান পেতে পারি না। সুতরাং আধিবিদ্যক জ্ঞান সম্ভবপর হতে পারে না।

কার্নাপ এরপর সব ধরনের আধিবিদ্যক বচনকেই অর্থহীন বলে দাবি করেন। একইভাবে এয়ারের গ্রন্থেও আমরা দেখতে পাই, তিনি দাবি করেন, সব আধিবিদ্যক বচন অর্থহীন। এয়ার ডেকার্টের "আমি সন্দেহ করি তাই অস্তিত্বশীল" (cogito ergo sum) কে মিথ্যা বলেন। তাঁর ভাষায়,

> প্রকৃতপক্ষে তিনি ভুল করেন; কারণ, আমার সন্দেহ না থাকাটা একটি স্ববিরোধী কথা, যদি কেবল এটা নিজেকে অস্বীকার করে; আর সেজন্য "আমি সন্দেহ করি তাই অস্তিত্বশীল" বাক্যটির কোনো তাৎপর্য আমরা স্বীকার করতে পারি না।[২২]

অর্থাৎ এয়ার বলতে চান,সন্দেহ করার কোনো প্রয়োজনই হয় না। বাস্তবে যা আছে তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। সন্দেহ না করেই এসবের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। তাই ডেকার্টের উক্তির মধ্যেই স্ববিরোধ বিদ্যমান। ডেকার্ট বুদ্ধির মাধ্যমে জ্ঞানের উৎপত্তির কথা বলেন এবং সহজাত ধারণার মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। যেহেতু এসব জিনিস অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে এবং পরখনীতির আলোকে যাচাই করা যায় না তাই এয়ার এগুলোকে অর্থহীন বলে বর্জন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. নীতিবিদ্যা বর্জন

এয়ারের মতে, প্রচলিত নৈতিক পদ্ধতিগুলো যথার্থ নয়। এগুলো অধিবিদ্যার সাথে জড়িত। নৈতিক দার্শনিকগণ এগুলো দিয়ে কী চান, আবিষ্কার করেন বা প্রমাণ করেন তা বোঝা খুব কঠিন।[২৩] অর্থাৎ প্রচলিত নৈতিক মত যেমন,সুখবাদ,বুদ্ধিবাদ,পূর্ণতাবাদ প্রভৃতিতে আধিবিদ্যক ব্যঞ্জনা রয়েছে বলে তাঁর ধারণা। তবে ১০ বছর পর তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটে। তিনি বলেন,

> ...*উপযোগবাদ প্রভাবিত একজন লোক সাধারণভাবে একটি কাজ সঠিক বলতে বোঝাবেন*, এর গ্রহণযোগ্য বা উন্নত হওয়ার ক্ষেত্রে এর প্রবণতা, অথবা আরো সম্ভাব্য যে, এটা এমন কাজ যা উন্নত হওয়ার প্রবণতা সম্পন্ন যাকে বলা হয় সার্বিক সুখ। আর এ ক্ষেত্রে তার উক্তির বৈধতা একটি অভিজ্ঞতামূলক বিষয় বা ঘটনায় পরিণত হয়। একই ভাবে যিনি তার নৈতিক মতের ভিত্তি হিসেবে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেন, অর্থাৎ একটি কাজ সঠিক বা অন্যায় রূপে গ্রহণ বা বর্জনের বিষয়টি গির্জা বা ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনুমোদিত হয় বলে মনে করেন তখন সেটারও অভিজ্ঞতামূলক ভাবে যাচাই হতে পারে।[২৪]

অর্থাৎ এয়ার ইতোপূর্বে নৈতিকতার উৎস হিসেবে ধর্ম ও অধিবিদ্যাকে অস্বীকার করলেও অভিজ্ঞতার শর্ত যুক্ত করে পরে এর স্বীকৃতি দেন। অন্যদিকে শ্লিক বলেন, নীতিবিদ্যা আমাদের কোনো আদর্শনিষ্ঠ জ্ঞান দেয় না, কারণ এই অর্থে নীতিবিদ্যা অর্থহীন যেহেতু তার পরখ করা যায় না। তাঁর মতে,নীতিবিদ্যা হচ্ছে বর্ণনামূলক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (Ethics is the descriptive scientific theory) আর এই অর্থে মানুষ স্বভাবতই আনন্দকে ব্যথার উপর অগ্রাধিকার দেয়।[২৫]

নীতিবিদ্যার ব্যাপারে ভিটগেনস্টাইনের মত ছিল, জগতে প্রত্যেক জিনিস নিজের মতই আছে এবং প্রতিটি ঘটনা নিজের মতই ঘটে। এতে মূল্য বলতে কিছু নেই।[২৬] অর্থাৎ মানুষ যা করছে তা তার প্রয়োজনে স্বাভাবিকভাবেই করছে। মানুষের জীবনে দুঃখ-দুর্দশা প্রাকৃতিকভাবেই হচ্ছে,মানুষ যেভাবে চেষ্টা করে সেভাবেই পায়; প্রকৃতির নিয়মের বিপরীতে এখানে কিছুই ঘটে না। তাই নৈতিকতার ধারণা অর্থহীন। তাই তিনি সিদ্ধান্ত টানেন,"সুতরাং নীতিবিদ্যার বচন থাকাটা একেবারেই অসম্ভব।"[২৭]কার্নাপ নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করেন। তাঁর মতে, "গতানুগতিক নীতি দর্শন তথ্যের অনুসন্ধান নয়, বরং কী শুভ আর কী অশুভ, কী করা ঠিক আর কী করা ঠিক নয় তার একটি ভানপূর্ণ অনুসন্ধান।"[২৮] অর্থাৎ তাঁর মতে তথ্যের অনুসন্ধানই হওয়া উচিৎ ছিল নীতিবিদ্যার কাজ। সেটা না করে কোনটি ভালকোনটি খারাপ তা অনুসন্ধান করা একধরনের প্রতারণা ও অযৌক্তিক কাজ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যক্ষবাদীগণের মূল স্লোগান ছিল ভাষার দুর্বোধ্যতা দূর করে সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আদর্শ ভাষা আবিষ্কার যেখানে বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ নীতি এবং যুক্তিবিদ্যার বিশ্লেষণী পদ্ধতি অনুসৃত হবে। তাঁদের বিশ্বাস ছিল- এ ধরনের আদর্শ ভাষা প্রণয়ন করা গেলে যে কোনো সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব হবে। এ আদর্শ ভাষার কষ্টি পাথরে যেসব সমস্যার সমাধান করা যাবে না সেগুলোকে অবশ্যই নিরর্থক বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এক্ষেত্রে অটো নিউরেথের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তবে বাস্তবতা হলো দীর্ঘদিনের চেষ্টার পরও এ ধরনের আদর্শ ভাষা প্রণয়ন তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।[২৯]

সমালোচনা

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ শুরু থেকে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে। এই সমালোচনায় তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে অনেকেরই আত্মসমালোচনা লক্ষ্য করা যায়। ভিটগেনস্টাইন *Tractatus* লিখে প্রচুর সুনাম অর্জন করলেও জীবদ্দশায় আর কোনো গ্রন্থ লিখে প্রকাশ করেন নি, তবে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ *Philosophical Investigation* পূর্ব-মতের প্রচুর সংশোধনীসহ মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল। এজন্যই তাঁকে প্রাথমিক ও পরবর্তী ভিটগেনস্টাইন রূপে চিহ্নিত করা হয়। এ.জে. এয়ার ২৪ বছর বয়সে *Language Truth and Logic* এ যে মন্তব্য করেছেন ১০ বছর পরের সংস্করণে তার কিছু অংশ সংশোধন করেন। মরিজ শ্লিক, কার্নাপসহ অনেক অনুসারীর মধ্যেই এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

প্রত্যক্ষবাদের বিরুদ্ধে প্রথম সমালোচনা দেখা যায় কার্ল পপারের *The Logic of Scientific Discovery(১৯৩৪)*, গ্রন্থে, তিনি এখানে verifiablity principle এর পরিবর্তে falsification principle প্রতিস্থাপন করেন। তিনি অর্থহীন বচন থেকে অর্থপূর্ণ বচনের পার্থক্যের সাথে সম্মত ছিলেন না, বরং তাঁর মত ছিল আধিবিদ্যক বচন থেকে বৈজ্ঞানিক উক্তিকে পার্থক্যকরণ। প্রত্যক্ষবাদীদের মত তিনি দাবি করেন নি, আধিবিদ্যক উক্তি অবশ্য অর্থহীন হবে, তিনি দাবি করেন, কোনো মতবাদ বা উক্তিকে আমরা প্রায়োগিক বা অভিজ্ঞতাপ্রসূত বলব কেবল তখনই, যখন একে প্রায়োগিকভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাবে। আধিবিদ্যক বচন অমিথ্যায়নাযোগ্য বা অবৈজ্ঞানিক হলেও অর্থহীন নয়। কোনো মতবাদের সূত্রপাত ঘটে কল্পনাপ্রসূত অনুমান হিসেবে আর পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য হলো বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এদের মিথ্যা প্রমাণ করা। অনুমানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সংকল্পই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির পরিচায়ক।[৩০]

বিখ্যাত ভারতীয় দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণ তাঁর *History of Philosophy* গ্রন্থে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করেন। তিনি বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

> ...তাদের প্রত্যক্ষবাদী মতবাদের মাধ্যমে তারুণ্যের আবেগে দর্শনের সংস্কার বরং বিজ্ঞানের প্রতি এক অন্ধভক্তি অধিবিদ্যাকেই শুধু অর্থহীন করে না বরং কার্যকারণ বিধি প্রকাশকারী সর্বজনীন বচন সমূহের মত বিজ্ঞানের কিছু মৌলিক উপাদান বা ধারণাকেও অর্থহীন করে। কিন্তু এটা আরো মজার বিষয় যে, অভিজ্ঞতামূলক যাচাইযোগ্যতা ভিত্তিক অর্থের এই ধরনের মানদণ্ড যেমনটি ভিটগেনস্টাইন ও অন্যান্যরা স্বীকার করেন সেই মানদণ্ড বহনকারী বাক্য ও বাক্যগঠনের অন্যান্য রীতিকেও তা অর্থহীন করে ফেলে। কারণ এই বাক্যগুলো আসলে অন্য কিছু বাক্য সম্পর্কিত এবং এখানে অভিজ্ঞতামূলক কোনো ঘটনা নেই যাকে কেবল পরবর্তী বাক্য নির্দেশ করবে।[৩১]

অর্থাৎ প্রত্যক্ষবাদী মতকে প্রথমত তিনি তারুণ্যের আবেগ বলে মন্তব্য করেন যেখানে যুক্তির চাইতে আবেগ বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে; দ্বিতীয়ত বিজ্ঞানের প্রতি এই মতবাদের এতই অন্ধভক্তি ছিল যে, নিজেদের মানদণ্ডের আলোকে বরং অজ্ঞতাবশত বিজ্ঞানকেই তাঁরা অস্বীকার করে ফেললেন। যেমন কার্যকারণ নীতি,মাধ্যাকর্ষণ নীতি প্রভৃতির অভিজ্ঞতাপূর্ব ব্যাখ্যাকে তাঁদের নীতির আলোকে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত,অভিজ্ঞতামূলক যাচাইয়ের বিষয়টি ভাষার লেখ্য ও জড়ীয় রূপকে যাচাই করতে পরখনীতি কোনো বিশেষ নিয়ম সরবরাহ করতে পরে নি, কারণ আধিবিদ্যক ধারণাকে ব্যাকরণের নিয়মে যাচাই করা সম্ভব নয়। চতুর্থত, তাঁদের পরখনীতি ব্যাকরণের নিয়মকেও অর্থহীন করে ফেলে, কারণ এগুলোকে যাচাইয়ের আগেই তাঁরা স্বীকার করে নেন।

এইচ.ডি. লিউইস[৩২] যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের যে সমালোচনা করেন তাও পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। তিনি বলেন, কিছু উক্তি এমনও আছে যা সম্পূর্ণ সঠিক, স্বাভাবিক ব্যাকরণগত নিয়মের অধীন এবং প্রকৃতপক্ষে যাকে দেখতে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তার আদৌ কোনো অর্থ নেই। কারণ অভিজ্ঞতায় তা যাচাই করা সম্ভব নয়। যেমন, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এই শক্তিকে উপলব্ধি করা যায় কিন্তু যাচাই করা যায় না। পরখনীতির মানদেণ্ড তা গৃহীত হতে পারে না। কিন্তু আমাদের মেনে নিতে হয়। রাধাকৃষ্ণণের কথার সাথে এখানে তাঁর মিল রয়েছে। তাঁর মতে,কার্নাপ আধিবিদ্যক শব্দকে বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে অর্থহীন বলেছেন, যা সঠিক নয়। যেমন, State কিংবা Society (বড় হাতের S যুক্ত) দ্বারা বোঝানো হত কয়েক ধরনের রহস্যপূর্ণ সত্তা বা তাদের আকৃতিকে এবং তাদের এক একজন সদস্যের জীবন ও ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে। কিন্তু বর্তমানে এই শব্দ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। একইভাবে ধর্মতত্ত্ববিদগণ যুগ যুগ ধরে একজন পৌরাণিক মানুষ (Mythical man)সম্পর্কে 'man' শব্দটি ব্যবহার করে আসছেন যার পতনের জন্য তারা অনুশোচনা করেন। অথচ আমরা এখন সবাই 'man' (মানুষ) রূপেই পরিচিত। ভাষাতাত্ত্বিক সংশয়ের জন্য আমাদের অনুশোচনা করা উচিত কিন্তু এই ধরনের সংশয় নিঃসন্দেহে কিছু অসত্য ধারণাকেই সত্য বানাতে সাহায্য করছে।

Dhaka University Institutional Repository

লিউইসের মতে, এই ধরনের ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যা অতীতে অনাবিষ্কৃত ছিল না। প্লেটো ও এরিস্টটল ভাষার ভ্রান্তির ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং সবসময় সতর্ক বিশ্লেষণের জন্য চেষ্টা করতেন যেন উদ্দীষ্ট বিষয় ভুলভাবে, ভ্রান্ত যুক্তির মাধ্যমে বাতিল করা না যায়। অন্য দার্শনিকগণও প্লেটো ও এরিস্টটলকে অনুসরণ করে শব্দের প্রতারণার বিরুদ্ধে সতর্ক ছিলেন, কিন্তু তাঁরা ভাষাতাত্ত্বিক দার্শনিক ছিলেন না। ডেকার্টের সহজাত ধারণার সমালোচকদের তিনি বলেন, instinct এর একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। আমরা পাখিদের দেখি কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই, বিশেষত সচেতন মনোযোগ ছাড়াই তারা তাদের বাসা তৈরি করছে। তারা অন্য দেশে চলে যাচ্ছে এবং পরের বছর আবার নিজের বাসায় ফিরে আসছে। এটা বোঝা খুব কঠিন, কীভাবে এগুলো হচ্ছে। আরেকটি শব্দ telepathy- অর্থাৎ কোনো মাধ্যম ছাড়াই অন্যের মনকে অনেক দূর থেকে উপলব্ধি করা। কোনো কোনো মানুষের পক্ষে এটা হয়ে থাকে বলেই শব্দটির উদ্ভাবন হয়েছে। এসবের ক্ষেত্রে পরখনীতির প্রয়োগ সম্ভব নয়।[৩৩]

অধিকাংশ ভাষাতাত্ত্বিক মনে করেন, আমাদের যদি কোনো ব্যাপারে স্পষ্ট অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান না থাকে তাহলে সেটা ভাষায় ব্যবহারের অযোগ্য। কিন্তু লিউইসের মতে,অনেক ক্ষেত্রে সংশয়পূর্ণ হলেও সে সব ভাষার মাধ্যমে বুদ্ধির চর্চা হতে পারে। যেমন, কাউকে একটি বর্গাকার ক্ষেত্রের গল্প বলা যে, এটা কোনো এক সময় একজন ব্যক্তি কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়, যার সম্পর্কে অনেক কিছু বলা যায়। কারণ কেউ তার সম্পর্কে জানে না। এক্ষেত্রে তার প্রসঙ্গে বিভিন্ন কথামালা ছড়িয়ে পড়ে, এমনকি পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা যুদ্ধের দিকেও ধাবিত করতে পরে। ঐতিহাসিক তখন ইতিহাস খুঁজে এর শুরু জানতে চাইবেন; কেউ হয়ত অন্যদের চেয়ে আরো সঠিকভাবে গল্পটি বলবেন; কেউ আরো সুন্দর বাচনভঙ্গি এবং রঙ দিয়ে বর্ণনা করবেন এবং অন্যরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যের সাথে মিলিয়ে উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে যাচাই করবেন। কিন্তু এই কাজের জন্য যদি একটি সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া হয় তাহলে তাকে খুব যৌক্তিক কাজ বলা যায় না।[৩৪]এর মাধ্যমে মূলত লিউইস বলতে চেয়েছেন, যাঁরা পরখনীতির মত নিয়ম করে অধিবিদ্যাকে বর্জনের নামে ভাষার পরিধিকে ক্ষুদ্র করতে চান তাঁরা জ্ঞান চর্চার অনেক রাস্তাই বন্ধ করে দেবেন।

জুলিয়াস রুডলফ ভেনবার্গের *An Examination of Logical Positivism* গ্রন্থে প্রত্যক্ষবাদের চুলচেরা বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করা হয়।[৩৫] তিনি প্রত্যক্ষবাদীদের মতের আলোকেই অধিবিদ্যার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন। প্রত্যক্ষবাদীদের মতে,আধিবিদ্যক বৈশিষ্ট্যের কোনো বচনই অভিজ্ঞতামূলক নয় (All assertions of metaphysical character are non-empirical). প্রথমত এ ধরনের উক্তি পূর্বানুমান। তাঁর মতে, ডেকার্ট, স্পিনোজা, লাইবনিজ অধিবিদ্যার পক্ষে অবরোহমূলক যুক্তি দেন। আর অবরোহ অনুমান কিছু স্বতঃসিদ্ধ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়ে থাকে।

প্রথমত এই স্বতঃসিদ্ধগুলো আবেগ নির্ভর বা সাধারণ বিশ্বাস নয় বরং এগুলো নিশ্চিত ও প্রমাণিত সত্য। দ্বিতীয়ত যুক্তিবিদ্যার যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেই অবরোহের সিদ্ধান্ত অনুসৃত হয়। প্রত্যক্ষবাদীদের পরখনীতি, "কোনো বচন অর্থপূর্ণ মানেই হলো এর যাচাই" (The meaning of a proposition is its verification) এটাও পূর্বানুমান নির্ভর উক্তি। এই উক্তির মধ্যেই স্ববিরোধ বিদ্যমান। এর অর্থ একটি বচনকে যদি আদৌ যাচাইযোগ্য হতে হয় তাহলে অবশ্য এর যাচাইয়ের আগেই অর্থ থাকবে। এবং মিথ্যা বচনের কোনো অর্থই থাকবে না। ভেনবার্গ আরো বলেন, তাঁরা বচনকে অর্থপূর্ণ ও অর্থহীন নামে দু'ভাগ করেন; তাঁদের "কেবল অর্থপূর্ণ বচনই যাচাইযোগ্য"-এটা এক ধরনের পুনরুক্তি(tautotogy)। কারণ,এর মানেই হলো অর্থহীন বচন যাচাইযোগ্য নয়। তাহলে পরখনীতির ব্যর্থতা কেবল তাত্ত্বিক নয় ব্যবহারিকও বটে। যখন বলা হবে একটি বচন তাত্ত্বিকভাবে যাচাইযোগ্য নয় এর অর্থ প্রকৃতিতে কোনো যাচাই নীতি থাকতে পারে না। চাঁদের অপর পার্শ্বে কী আছে বা তারকার মধ্যভাগে কী আছে তা যাচাই করার কোনো উপকরণ আমাদের কাছে নেই। এটা প্রযুক্তিগত সমস্যা। তাছাড়া চাঁদের অন্ধকার পাশে একটি পাহাড় আছে প্রত্যক্ষবাদের পরবর্তী সংস্করণ অনুযায়ীও সেটা তাত্ত্বিকভাবে যাচাইযোগ্য হতে পারে। কিন্তু আধিবিদ্যক উক্তি সে রকম নয়।[৩৬] অর্থাৎ আধিবিদ্যক বচনকে প্রত্যক্ষবাদী মানদণ্ড অনুযায়ীও অর্থহীন বলা যায় না। জন পাসমোর সহ অনেক দার্শনিক প্রত্যক্ষবাদকে মৃত বলে বর্ণনা করেন যা কখনো ফিরে আসবে না।[৩৭]

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের বিভিন্ন চিন্তাধারা সমালোচকদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। এসব সমালোচনা থেকে এটা বলা যায়, প্রত্যক্ষবাদের যুক্তিগুলোতে বেশ কিছু ত্রুটি ছিল। বিশেষ করে তাঁদের মৌলিক ধারণাগুলোতে বারবার সংশোধনী সত্ত্বেও পূর্বের সমস্যা থেকে যায়। এই ত্রুটিপূর্ণ যুক্তির মাধ্যমেই তাঁরা অধিবিদ্যাকে খণ্ডন করেছেন। চাঁদের অপর পার্শ্বে পর্বত আছে কি না এমন বিষয়কে তাঁরা অনাগতকালের প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্রযুক্তিগত কিংবা অন্য যেভাবেই হোক আধিবিদ্যক বিষয়গুলোরও তো এভাবে চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষণ-নির্ভর প্রমাণ হতে পারে। তাহলে অধিবিদ্যার বচনকে তাত্ত্বিকভাবে স্বীকার করতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

আবার আধিবিদ্যক শব্দ ও বাক্যের সাথে তাঁরা যে মনোভাব দেখান তাতে মনে হয় এক ধরনের ছায়ার সাথে যুদ্ধ। মানুষের চিন্তা ভাবনা ও বুদ্ধির বাস্তব প্রকাশ ঘটে ভাষার মাধ্যমে। যদি সে সঠিকভাবে চিন্তা করতে না পারে তাহলে সে সঠিক ভাষা প্রয়োগ করতে পারবে না। এতে কারো সন্দেহ নেই, মানুষের কথা বলার বহু পরেই ভাষা-চিহ্নের উদ্ভব ঘটেছে। আর ভাষা চিহ্নের আগেই যদি মানুষ সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কাউকে কল্পনা করে তাহলে তাতে বরং চিন্তার সমস্যা, ভাষার সমস্যা নয়। আবার শব্দ ও

Dhaka University Institutional Repository

বাক্যকে যাচাই করতে তারা এক ধরনের মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন যার মাধ্যমে চিন্তাকে যাচাই করা সম্ভব হয় না। অথচ এটা আরো বেশি প্রয়োজন ছিল। তাঁদের সেই মানদণ্ডটিকে যুক্তিবিদ্যার আলোকে একটি স্বতঃসিদ্ধ বলা যায়, যেখান থেকে অবরোহ প্রক্রিয়ায় তাঁরা আধিবিদ্যক বচন ও শব্দকে বাতিল করেন। এটা সবারই জানা অবরোহ-প্রক্রিয়ায় কেবল আকারগত সত্যতা পাওয়া যায়, বস্তুগত সত্য থাকে না। অন্যদিকে অধিবিদ্যা এমন একটি বিজ্ঞান যার পক্ষে অবরোহ এবং আরোহ উভয় প্রকারের প্রমাণ রয়েছে। তাই বলা যায় যদি প্রত্যক্ষবাদীগণ আরো চিন্তা ভাবনা করে তাঁদের মতামত উপস্থাপন করতেন তাহলে হয়ত তা আরো উত্তম হতো।

তথ্য নির্দেশ

১. Passmore, John, *A Hundred Years of Philosophy*, London: Penguin Books, 1966, p.367

২. Shlick, M., "Positivism and Realism" in A.J. Ayer,(ed.), *Logical Positivism*, Illinois: The Free Press, 1959, pp.82-107.

৩. www.iep.utm.edu/logicalpositivism

৪. http://plato.stanford.edu/logicalpositivism

৫. Passmore, J.,"Logical Positivism" in P.Edwards (ed.) *The Encyclopedia of Philosophy* (Vol-5) New York: McMillan, 1967. p.377

৬. *Ibid*, pp.352-357

৭. Wittgenstein, *Tractatus Logico Philosophicus*, London: Routledge, 1922, p.3

৮. *Ibid*, p. (x). (Introduction by B. Russell)

৯. আমিনুল ইসলাম, *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮, পৃ.৩৭৭

১০. Ayer, A.J., *Language, Truth and Logic*, London: Penguin book, 1945, p.- 21.

১১. Moritz Schlick, "Meaning and Verification", *Philosophical review* XLV, Jul-1936, In Quoted from *Philosophy of Recent times* Vol.11, p. 385

১২. *Ibid* ,Ayer, A.J., 1945, p. 48

১৩. *Ibid*, p.50

১৪. *Ibid*, p. 17

১৫. *প্রাগুক্ত*, আমিনুল ইসলাম, ১৯৮৮,পৃ.৩৬১

১৬. Rudolf Carnap," The Elimination of Metaphysics Through Logical Analysis of Language" in A.J. Ayer (ed.) *Logical Positivism*, New York: The Free Man Press, 1966, p.61.

১৭. *Ibid*, pp. 61-64

Dhaka University Institutional Repository

১৮. *Ibid*, pp. 65-67

১৯. *Ibid*, p.67

২০. *Ibid*, pp. 69-73

২১. *Ibid*, p.69

২২. *Ibid* , Ayer, A.J, 1945, p.136

২৩. *Ibid*, p.137

২৪. *Ibid*, p.28

২৫. *www.encyclopedia.unbelief*

২৬. *Ibid* ,Wittgenstein, 1922, 6.41

২৭. *Ibid*,6.42

২৮. প্রাগুক্ত, আমিনুল ইসলাম, ১৯৮৮, পৃ. ৩৭০

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮

৩১. Radhakrishnan, (ed.), *History of Philosophy*, Queted by Muhammad Ruhul Amin, *Science, Philosophy and Religion*, Dhaka: Islamic Foundation, 1979, p. 111.

৩২. Lewis, H.D., *Our Experience of God*, pp.28-36

৩৩. *Ibid*,p.29

৩৪. *Ibid,pp.29-30*

৩৫. Rudolph Weinberg,J., *An Examination of Logical Positivism*,pp.173-199.

৩৬. *Ibid*,p.179

৩৭. *Ibid*,, *The Encyclopedia of Philosophy* 1967, p.357.

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ অধ্যায়

বর্তমান সময়ে অধিবিদ্যার প্রাসঙ্গিকতা

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে ডেকার্ট থেকে হেগেল পর্যন্ত সময়টিকে বলা হয় আধুনিক দর্শন। হেগেল পরবর্তী সময় থেকে চলমান সময়টি সমকালীন যুগ নামে পরিচিত। সমকালীন যুগে দর্শনের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এসবের যোগসূত্র পূর্ববর্তী দর্শনে থাকলেও যুগের প্রেক্ষাপটে এগুলো নতুনভাবে বিশ্বকে প্রভাবিত করে। দর্শনের আজন্ম সমস্যা ভাববাদ ও জড়বাদের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে কখনো ভাববাদকে বিজয়ী আবার কখনো জড়বাদকে বিজয়ী হতে দেখা যায়। তবে ভাববাদীগণ কখনোই তাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন না এবং জড়বাদীগণও তাদের আদর্শ বিসর্জন দেন না। সমকালীন ভাববাদের প্রধান প্রেরণা ছিলেন হেগেল। হেগেলের অনুসরণ করেই পরবর্তী বৃটিশ, ফরাসী, জার্মান ভাববাদ বিকশিত হয়। অন্যদিকে ভাববাদ বিরোধী ধারাটি বিবর্তনবাদ, প্রয়োগবাদ, অস্তিত্ববাদ, বিশ্লেষণী দর্শন, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ প্রভৃতি নামে প্রচারিত হয়। আমি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ে আমি অন্যান্য ধারাগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করার সাথে অধিবিদ্যার প্রেক্ষাপটকেও তুলে ধরার চেষ্টা করব। বর্তমান সময়টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। এখন ভাববাদ, অধিবিদ্যা, ধর্ম ইত্যদির প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু তবুও অধিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা ফুরায় না। কয়েকজন বিজ্ঞানীর এ সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক কিছু কথাও এখানে উল্লেখের চেষ্টা করা হবে।

বিবর্তনবাদ

বৃটিশ জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (১৮০৯-৮২) দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে সামুদ্রিক জাহাজে চড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে অসংখ্য জৈব উপাত্ত সংগ্রহ করে পঁচিশ বছর যাবত সেগুলির উপর গবেষণা চালিয়ে সিদ্ধান্ত নেন পৃথিবীর মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু বর্তমানে যে অবস্থায় আছে প্রারম্ভিক অবস্থায় সেটা ছিল না। তিনি সিদ্ধান্ত নেন মানুষ বানর থেকে এসেছে। তাঁর এই সিদ্ধান্ত ১৮৫৯ সালে তাঁর *Origin of Species* গ্রন্থে প্রকাশিত হওয়ার পর বৃটেন ও অন্যান্য দেশে এর বিরুদ্ধে তুমুল সমালোচনা ও বিতর্ক শুরু হয়। তবে ডারউইনের আগেও ফরাসি বিজ্ঞানী লা প্লাস (১৭৪৯-১৮২৭), লা মার্ক (১৭৪৪-১৮২৯)এর বিবর্তনবাদ সম্পর্কিত তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এগুলো ছিল যান্ত্রিক জৈবিক বিবর্তন সংক্রান্ত। বর্তমান সময়কালের জড়বাদীগণ এই বিবর্তনবাদ দ্বারা ব্যাপক প্রভাবিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

যান্ত্রিক বিবর্তনের মূল কথা হলো, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণি অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম (struggle for existence) করে। শীত, গ্রীষ্ম, তাপমাত্রা ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে অনেক প্রাণি পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায়, যারা টিকে আছে তাদের মধ্যেও বিভিন্ন পরিবর্তন সূচিত হয়। এই পরিবর্তনকে বলা হয় আকস্মিক বা স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন । এই পরিবর্তন অনুকূল হলে তা টিকে থাকবে এবং প্রতিকূল হলে তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এটাকে বলা হয় Survival of the fittest বা যোগ্যতমের বেঁচে থাকা। এখানে কোনো উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনার স্থান নেই। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ মানুষকে যন্ত্রের মত করে উপস্থাপন করে। পরবর্তী অনেক জীববিজ্ঞানী প্রমাণ করেন এই মতবাদে অনেক ত্রুটি ছিল। তবে এর বিপরীতে ধর্মবিশ্বাসী ও অধিবিদগণ উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনের কথা বলেন এবং তার সূচনা প্লেটো এরিস্টটল থেকেই। যান্ত্রিক বিবর্তন বা ডারউইন প্রভাবিত জড়বাদী দার্শনিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হার্বার্ট স্পেনসার (১৮২০-১৯০৩)।

স্পেনসারই বিবর্তনবাদী বৈজ্ঞানিক মতবাদকে দর্শনে নিয়ে আসেন। তবে স্পেনসার ডারউইনের গ্রন্থ প্রকাশের আগেই জৈবিক বিবর্তনবাদের ধারণা দেন। তাঁর মত ছিল অর্জিত বৈশিষ্ট্যের সংক্রমনের কারণেই বিবর্তন ঘটে যেখানে ডারউইনের মত ছিল প্রাকৃতিক নির্বাচন।অবশ্যই তিনি পরে ডারউইনের অনুসরণ করেন এবং যোগ্যতমের টিকে থাকা নীতির সমর্থন করেন।[১]

স্পেনসার একজন সমাজ-দার্শনিক হিসেবে অধিকতর পরিচিত ছিলেন এবং সামাজিক বিবর্তনকে তিনি বেশি গুরুত্ব দেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে কয়েকটি হলো- *The Synthetic Philosophy, The Principles of Psychology, The Principles of Sociology* প্রভৃতি। এসব রচনায় তাঁর বিবর্তনবাদী দর্শন প্রকাশ পায়। তিনি ছিলেন একজন অজ্ঞেয়বাদী। তাঁর মত ছিল, "আমরা অভিজ্ঞতার বাইরে কিছু জানতে পারি না, আমরা ঈশ্বর আছে কি না কিংবা তার কি চরিত্র থাকতে পারে তা জানি না। ... তাঁর ধর্ম সম্পর্কিত সার্বিক অবস্থান ছিল অজ্ঞেয়বাদী।"[২] অধিবিদ্যার গতানুগতিক মতাবলি সম্বন্ধে তাঁর মনে ছিল গভীর সংশয়। প্রাচীন পরম্পরাগত আধিবিদ্যক মতসমূহ তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলে প্রতীয়মান হয় এবং তিনি মনে করেন যে, স্বগত সত্তার ব্যাখ্যা নয় বরং অভিজ্ঞতার জগতের বস্তু ও ঘটনাবলিকে বোঝাই দার্শনিক পদ্ধতির লক্ষ্য।[৩]

তবে অধিবিদ্যা বিরোধী জড়বাদী বিবর্তনবাদের বিপরীত প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রাচীন উদ্দেশ্যবাদী বিবর্তনের আধুনিক সংস্করণ দেখা যায় লয়েড মর্গান ও স্যামুয়েল আলেকজান্ডার এর উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদে (emergent evolution)। লয়েড মর্গান (১৮২৫-১৯৩৬) গিফোর্ড বক্তৃতামালায় (১৯২২-২৩) সালে "*Emergent Evolution*" নামে যে ধারাবাহিক আলোচনা রাখেন তাই

Dhaka University Institutional Repository

উন্মেষমূলক বিবর্তনরূপে পরিচিতি পায়। গ্রন্থাকারে তা প্রকাশিত হয় ১৯২৩ (১ম সংস্করণ) এবং ১৯২৭ (২য় সংস্করণ) সালে। অন্য দিকে স্যামুয়েল আলেকজান্ডার (১৮৫৯-১৯৩৭) তাঁর *Space Time and Deity*, ১৯২০ গ্রন্থেও এই মতবাদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেন। তাঁদের উভয়ের প্রচেষ্টায় উন্মেষমূলক বিবর্তন যান্ত্রিকতা বিরোধী একটি সুশৃঙ্খল মতবাদে পরিণত হয়। এই মতবাদ অনুসারে বিবর্তন একটি ব্যাপক পরিকল্পনার নাম যেখানে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক স্তরে নতুন গুণ বিশিষ্ট বস্তুর আবির্ভাব ঘটে। মর্গানের ভাষায়,"ব্যাপক অর্থে বিবর্তন হচ্ছে প্রতিটি প্রাকৃতিক ঘটনায় একটি সমন্বিত ধারাবাহিক পরিকল্পনা।"[৪] অর্থাৎ তিনি যান্ত্রিক বা জৈবিক বিবর্তনের পরিবর্তে একটি সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ক্রমবিকাশর কথা বলেন। জড় থেকে প্রাণের, প্রাণ থেকে মনের এবং মন থেকে অনুধ্যানী চিন্তার উন্মেষ ঘটে বিবর্তনে। মর্গান আলেকজান্ডার অনুসারে বিবর্তনকে পিরামিডের সাথে তুলনা করেন।[৫]

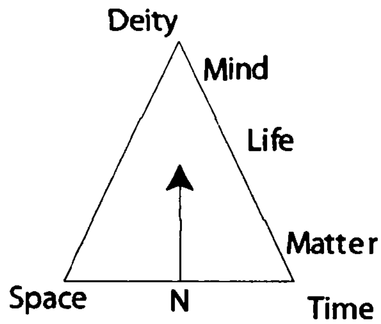

চিত্রে আলেকজান্ডার দেখিয়েছেন বিবর্তনের শুরু জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মনে। আর এই সমগ্র প্রক্রিয়ায় একটি প্রেরণামূলক তেজশক্তি রয়েছে। এই তেজশক্তির নাম তিনি দেন nisus.[৬] লয়েড মর্গান এই তেজশক্তিকেই ঈশ্বর নাম দেন। তাঁর ভাষায়-

> ভালমন্দ যাই হোক, আমি ঈশ্বরকেই এই 'তেজশক্তি' হিসেবে স্বীকার করি যার কার্যক্রম সব কিছুর উন্মেষ ঘটাচ্ছে, এবং উন্মেষমূলক বিবর্তনের সামগ্রিক বিষয়টি তাঁর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আমার দার্শনিক বিশ্বাস এটাই, কোনো কিছু ব্যাখ্যার জন্য এটাই আমার দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক নীতিমালার সম্পূরক।[৭]

অর্থাৎ তিনি বিবর্তন প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরকে নতুন করে প্রমাণ করেন। আলেকজান্ডারের মতে, অতীতের দার্শনিকেরা ঈশ্বরকে জগতের আদি কারণ বলে ভুল করেছেন। ঈশ্বর জগতের আদি কারণ নয়, বরং বিবর্তন প্রক্রিয়ায় উন্মেষিত সর্বশেষ সত্তা।[৮] প্রকৃতপক্ষে তাঁর এই মন্তব্যের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে অস্বীকৃতি নয় বরং ঈশ্বরকে সর্বোচ্চ সত্তা বলে স্বীকৃতি দেওয়া। তিনি বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক স্তম্ভ ধরেছেন জড়কে, শেষ প্রাণে আর সর্বোচ্চ প্রাণ হিসেবে ঈশ্বরকে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ

সমকালীন যুগে অধিবিদ্যা ও ধর্মের বিরুদ্ধে একটি বিপ্লবী নাম ছিল কার্ল মার্কসের (১৮১৮-৮৩) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। মার্কস জীবদ্দশায় তাঁর তত্ত্বের বাস্তবায়ন দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল এবং '৯০ এর দশকে সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের আগ পর্যন্ত তা সাড়ম্বরে পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করে চলে। তবে এখনো লাতিন আমেরিকা, চিন সহ বিভিন্ন দেশে মার্কসবাদের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। এই মতবাদ হেগেলের দ্বান্দ্বিকতা ও ফয়েরবাখের বস্তুবাদের মাধ্যমে রূপ লাভ করে। মার্কস- এঙ্গেলসের ভাষায়,

> আজ পর্যন্ত বিদ্যমান সকল সমাজের ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিশিয়ান এবং প্লিবিয়ান, জমিদার ও ভূমিদাস, গিল্ড কর্তা আর কারিগর, এক কথায় অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত শ্রেণি অবিরাম পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে থেকেছে, অব্যাহত লড়াই চালিয়েছে কখনো আড়ালে কখনো প্রকাশ্যে।[৯]

ফয়ের বাখ সম্পর্কে মার্কস ১১টি থিসিস লেখেন এবং ১১ নম্বর থিসিসটিই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা মার্কসীয় দর্শনের মূল কথা। সেটি হলো "দার্শনিকেরা কেবল নানাভাবে জগৎকে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু আসল কথা হল তাকে পরিবর্তন করা।"[১০] জগৎকে পরিবর্তনের জন্যই মার্কস রূপরেখা প্রণয়ন করেন। অর্থনৈতিক মুক্তিই ছিল তাঁর দর্শনের মূল বিষয়। পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের মাধ্যমে সর্বহারাগণ এক সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে যেখানে থাকবে না কোনো দ্বন্দ্ব, পার্থক্য, ভেদাভেদ। এই মুক্তির সংগ্রামের জন্য প্রতিবন্ধক ভাববাদী দর্শন, অধিবিদ্যা, ধর্ম ও প্রচলিত নৈতিকতা।

মার্কসবাদ অনুযায়ী, ধর্ম যেসব ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দিয়েছে তার কেন্দ্রীয় অবস্থানে রয়েছে ঈশ্বরের ধারণা। ঈশ্বর হল এক স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় সত্তার ধারণা, যা সমগ্র জগতের স্রষ্টা, যা সমগ্র জগৎকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। ঈশ্বর হলো এক অতীন্দ্রিয় সত্তা, যা সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের আদি কারণ। ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা ঈশ্বর নামক এই ভ্রান্ত ধারণা নাকচ করে দিয়েছে এই যুক্তিতে যে, আদিম পরিবেশে নানা ধরনের ভয়- যেমন, নিরাপত্তাহীনতা, অসহায়ত্ব, মৃত্যু ভয় ইত্যাদি থেকে ঈশ্বরের ধারণার উদ্ভব।[১১] মার্কসবাদ অনুযায়ী নৈতিকতারও কোনো চিরন্তন উৎস বা নিয়ম নেই। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এসব ধারণা স্থায়ী নয়, সমাজের বাস্তব অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে এগুলোও পরিবর্তিত হয়। এঙ্গেলস মার্কসবাদকে ডারউইনের তত্ত্বের সাথে তুলনা করেন।[১২]

প্রয়োগবাদ

১৮৭০ এর দিকে আমেরিকায় এক নতুন দার্শনিক চিন্তার আবির্ভাব ঘটে। এর আগে মার্কিনিদের নিজস্ব কোনো দার্শনিক মত আবিষ্কৃত হয় নি। মূলত বিজ্ঞানের নানান আবিষ্কার নিয়েই তাদের বেশি ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। তবুও সি.এস. পার্স (১৮৩৯-১৯১৪) ও উইলিয়াম জেমস (১৮৪২-১৯১০) এর নেতৃত্বে 'প্রয়োগবাদ' (Pragmatism) নামক একটি বাস্তববাদী জীবনমুখী দার্শনিক চিন্তার রূপায়ন ঘটে। পার্স ১৮৭৮ সালে *Popular Science Monthly* (January, 1878) তে "How to Make our Ideas Clear" শীর্ষক রচনায় প্রথম প্রয়োগবাদ সম্পর্কে ধারণা দেন। আমাদের ধারণাগুলোকে স্পষ্ট করার জন্য এই মতের উদ্ভব। তিনি তাঁর রচনার শুরুতেই বলেন,

> একটি স্পষ্ট ধারণাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় এমন একটি বিষয় রূপে যাকে সহজেই উপলব্ধি করা যায়, যেখানেই তা প্রয়োগ করা হবে তা স্বীকৃত হবে আর তাই এর জন্য অন্য কারো বিভ্রান্তি হবে না। যদি এই স্পষ্টীকরণে তা ব্যর্থ হয় তাহলে তা হবে অস্পষ্ট ধারণা।[১৩]

অর্থাৎ স্পষ্ট ধারণা মানেই হলো যেখানে এটাকে প্রয়োগ করা হবে সেখানেই এর অর্থ বোঝা যাবে। বোঝা না গেলে তাকে আর স্পষ্ট ধারণা বলা যাবে না। প্রয়োগবাদের নীতিমালা ও পদ্ধতি প্রথম পার্সই ব্যাখ্যা করেন। তাঁরই বন্ধু ও সহকর্মী উইলিয়াম জেমস পরবর্তীতে এর বিকাশ সাধন করেন। জেমস তাঁর *Pragmatism: A new Name for an Old Way of Thinking* (১৯০৭) বক্তৃতামালায় এবং *Essays in Radical Empiricism* রচনায়- প্রয়োগবাদকে ব্যাপক আকারে উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর *Pragmatism* বক্তৃতামালা জন স্টুয়ার্ট মিলকে উৎসর্গ করেন। জেমস মনে করেন, মানুষ অভিজ্ঞতাবাদের সমর্থক হয়েও ধর্মীয় বিশ্বাসের সন্ধান করেন দর্শনে। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন ধর্মীয় ভাবাপন্ন নয় এবং ধর্মীয় দর্শনও উদ্দেশ্য অর্জনে যথেষ্ট অভিজ্ঞতামূলক নয়। আর প্রয়োগবাদ এ দু'টির সমন্বয় করতে চায়।[১৪]

এই গ্রন্থে তাঁর তৃতীয় ভাষণ"Some Metaphysical Problems Pragmatically Considered"-এ তিনি অধিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেন; এবং অষ্টম ভাষণ "Pragmatism and Religion"- এ তিনি ধর্মের অবদানের কথাও স্বীকার করেন। তবে প্রয়োগবাদ অনুযায়ী যা কিছু মানুষের জীবনে কাজে লাগবে তাই প্রয়োজনীয়। জেমসের মতে, ধর্ম বিশ্বাস একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস যদি বাস্তব ক্ষেত্রে উপকারী হয় তাহলে, এ বিশ্বাস সত্য, এর সমর্থনে কোনো রকম যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন নেই। ধর্ম বিশ্বাসের স্বপক্ষে কোনো যুক্তি থাকুক বা নাই

Dhaka University Institutional Repository

থাকুক ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাক বা না যাক, ধর্মীয় বিশ্বাসের বাস্তব উপযোগিতা অনস্বীকার্য। যেমন, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করলে, আত্মার অমরত্বে আস্থা হারালে মানবজীবন নানারকম দ্বন্দ্ব ও অনৈক্যের ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত হয়ে উঠত। আর এজন্যই প্রয়োগবাদ ধর্মীয় বিশ্বাস বা ধর্মীয় মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করে না।[১৫]

মূলত প্রয়োগবাদের জন্ম হয়েছিল হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি কেন্দ্রিক "Metaphysical Club" এর আলোচনার মাধ্যমে। পার্স ও জেমস এসব আলোচনায় নিয়মিত বসতেন। ১৮৭০ এর দশক থেকেই এই আলোচনা চলতে থাকে।[১৬] উইলিয়াম জেমস প্রয়োগবাদী অভিজ্ঞতাবাদের নাম দেন "মৌলিক অভিজ্ঞতাবাদ"(Radical Empiricism)। মৌলিক অভিজ্ঞতাবাদের মূল কথা হলো ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই জ্ঞানের উৎপত্তি। জেমস ভাববাদীদের মন সংক্রান্ত ধারণার সমালোচনা করেন এবং অভিজ্ঞতাবাদকেও সম্পূর্ণ অনুসরণ করেন নি।

তাঁর মতের বিশেষত্ব হলো তথ্য বিষয়ক যে কোনো সিদ্ধান্তকে তিনি চূড়ান্ত মনে করেন না বরং ভবিষ্যতের নতুন অভিজ্ঞতার বিচারে তা পরিবর্তন বা সংশোধন হতে পারে বিধায় সব অভিজ্ঞতাকে তিনি সম্ভাব্য বলেন।[১৭] জেমস, জ্ঞানের উৎস হিসেবে দু'টি বিষয়কে উল্লেখ করেন তাঁর *The Meaning of Truth* গ্রন্থে। এই গ্রন্থের ২য় অধ্যায়ে "The Tigers in India" শিরোনামে তিনি বলেন, "কোনো জিনিস জানার দুটি উপায় আছে। তাৎক্ষনিক বা স্বজ্ঞামূলকভাবে তা জানা এবং ধারণামূলক বা প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে জানা।"[১৮] অর্থাৎ আমরা সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ও ধারণামূলক পদ্ধতিতে একটি বিষয় জানতে পারি। যেমন, ভারতের বাঘ সম্পর্কে আমাদের ধারণামূলক জ্ঞান চাক্ষুষভাবে না দেখেও আমরা অর্জন করতে পারি।

প্রয়োগবাদের সাথে আরেকটি নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি হলেন আমেরিকান শিক্ষা দার্শনিক জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২)। জন ডিউই প্রয়োগবাদী মত তাঁর শিক্ষাদর্শনে প্রয়োগ করেন। তিনি ডারউইন দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি ধর্মকে ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। তবে ধর্মীয় বিশ্বাসকে তিনি ব্যক্তিগত বিষয় বলেন। প্রয়োগবাদের একমাত্র বৃটিশসমর্থক এফ.সি.এস. শিলার (১৮৬৪-১৯৩৭) জেমসের অনুসরণ করেন। তাঁর মতে সত্য সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগধর্মী। অর্থাৎ আমার পক্ষে তা ততক্ষণই সত্য, যতক্ষণ তা আমার পক্ষে উপযোগী। যখনই তা আমার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ব্যর্থ হয়, তখনই তা আমার জন্য মিথ্যা হয়ে যায়। তবে তা যদি সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে তা প্রয়োজনীয়। তিনি প্রয়োগবাদকে বরং মানবতাবাদ (humanism) বলতে বেশি পছন্দ করতেন।[১৯]

প্রয়োগবাদ মানুষের বাস্তব প্রয়োজনের কথা বলে। কোনো ধারণার অর্থ নিহিত থাকে এর প্রয়োগের উপর, এভাবে যা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করা যায় তারই কেবল অর্থ আছে। প্রয়োগবাদ কোনো কিছুকে তখনই অস্বীকার করে যখন তা জীবনের জন্য অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রয়োজনীয় প্রয়োগবাদ অধিবিদ্যাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে নি। এই মতের বিভিন্ন সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও এটা আসলে সব কিছুকে সমন্বয় করে চলার পক্ষে। এখানে আমরা উপযোগবাদ, দৃষ্টবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, বুদ্ধিবাদ, ভাষাতাত্ত্বিকসহ সব মতবাদের একটি সমন্বয় দেখতে পাই।

অস্তিত্ববাদ

সমকালীন দর্শনে অস্তিত্ববাদ নামটি খুব পরিচিত। অস্তিত্ববাদের দু'টি ধারা, একটি আস্তিক্যবাদী অন্যটি নাস্তিক্যবাদী। তবে উভয় চিন্তার মূল কথা হলো ব্যক্তির স্বাধীনতা। "অস্তিত্ব সারসত্তার অগ্রবর্তী"(Existence precedes essence) এটাই অস্তিত্ববাদের মূল স্লোগান । বিশিষ্ট দার্শনিক সোরেন কিয়ের্কেগার্ড (১৮১৩-৫৫), ফ্রেডরিক নীটশে (১৮৪৪-১৯০০), মার্টিন হাইদেগার (১৮৮৯-১৯৭৬), জ্যাঁপল সাত্রে (১৯০৫-৮০), সিমন দ্য বুভয়ার (১৯০৮-৮৬) প্রমুখের বিস্তর রচনা ও সাহিত্যে অস্তিত্ববাদ একটি নব্য মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪০ ও '৫০ এর দশকে ইউরোপ জুড়ে অস্তিত্ববাদ একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রূপ নেয়।[২০]তবে অস্তিত্ববাদের সূচনা ডেনিশ দার্শনিক কিয়ের্কেগার্ডের মাধ্যমেই। তাঁকে আধুনিক অস্তিত্ববাদের জনক বলা হয়। ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের কথা বলে। মানুষের জীবনটা সংগ্রাম ও কষ্টে ভরপুর। কিন্তু মানুষকে এসব প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে জয়ী হতে হবে। এর জন্য প্রথম প্রয়োজন বিশুদ্ধ চিন্তা বর্জন। ভাববাদীদের কথা ছিল অস্তিত্ব ও সারসত্তা একই অর্থ বিশিষ্ট। কিন্তু অস্তিত্ববাদের যুক্তি অস্তিত্ব সারসত্তার পূর্বেই অবস্থান করে। এই অস্তিত্ব ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব। মানুষ নিজের অস্তিত্বের ব্যাপারে যখন সচেতন হবে তখন তার মধ্যে স্বাধীনতা, সাম্য সৃষ্টি হবে। ব্যক্তি যখন আদর্শ ব্যক্তিতে পরিণত হবে তখনই তা আদর্শ সমাজের দিক নির্দেশ করবে। এক্ষেত্রে মার্কসবাদী ধারণা ছিল বিপরীত। তবে কিয়ের্কেগাড খ্রিষ্টধর্মে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন বিধায় তাঁর ব্যক্তি- স্বাতন্ত্র্যকে খ্রিষ্টীয় ধর্মের সাথে সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। তাঁর মতে স্রষ্টা ও সৃষ্ট ব্যক্তির মধ্যে মিলন সম্ভব, এ মিলন মানে ঐশী সত্তায় বিলীন হয়ে যাওয়া নয় বরং এতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অটুট থাকবে।[২১] অস্তিত্ববাদের আস্তিক্যবাদী ধারায় জেসপার্স ও মার্সেলের নাম উল্লেখযোগ্য। জেসপার্স তিন প্রকার সত্তার কথা বলেন- তথাস্থ সত্তা (being there), আত্মস্থ সত্তা (being in-oneself) এবং স্বকীয় সত্তা (being-in-it self)। মানুষ যখন স্বকীয় সত্তায় উপনীত হবে তখনই তার পূর্ণতা আসবে। আবার মার্সেলের মতে, একজন অস্তিত্ববাদীর পক্ষে সবচেয়ে বড় বিশ্বতাত্ত্বিক রহস্য

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে আত্মসত্তার সাথে ঈশ্বর নামে এক অতিবর্তী সত্তার সংযোগ। অস্তিত্ববাদী এই ধারার সাথে অধিবিদ্যার মৌলিক বিরোধ নেই। কারণ অধিবিদ্যার উদ্দেশ্য পরমসত্তার সন্ধান আর অস্তিত্ববাদের উদ্দেশ্য ব্যক্তির পূর্ণতার মাধ্যমে ঈশ্বরের নৈকট্য অর্জন।

কিন্তু অস্তিত্ববাদের আরেকটি ধারা সম্পূর্ণরূপে অধিবিদ্যা রিরোধী। এই মতের প্রধান প্রবক্তা নীটশে। তিনি শোপেন হাওয়ারের বিপরীতে 'ইচ্ছা' কথাটিকে তাঁর দর্শনের মূলে নিয়ে আসেন। শোপেন হাওয়ারের কথা ছিল বেঁচে থাকার ইচ্ছাই জগতের সারধর্ম, আর নীটশে বলেন, ক্ষমতা লাভের ইচ্ছার মাধ্যমেই মানুষ বেঁচে থাকে। মানুষ মাত্রই অধিক ক্ষমতা লাভে ইচ্ছুক। আর যে সর্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করতে পারে তাকে তিনি বলেন অতি মানব। প্রতিটি মানুষকে অতি মানব হওয়ার জন্য সাধনা করতে হবে। এভাবে ব্যক্তি মানুষকে তিনি সব কিছুর উর্ধ্বে তুলে ধরেন। ধর্মের সমালোচনার মাধ্যমে তিনি মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের পথ দেখান। তাঁর মতে খ্রিষ্টীয় নৈতিকতা দাসসুলভ এবং মানবতাকে তা পঙ্গু করে দিয়েছে।

তাঁর *The Gay Science* গ্রন্থে "The Madman" নামক অধ্যায়ে একটি গল্পের অবতারণা করেন। একজন পাগল ব্যক্তি ভোর বেলায় একটি বাজারে গিয়ে বলতে থাকে- "আমি ঈশ্বরকে চাই! আমি ঈশ্বরকে চাই!"একপর্যায়ে উৎসুক জনতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে বলে,"কোনটি ঈশ্বর?" সে চিৎকার করে, "আমি তোমায় বলব। আমরা, আমি ও তুমি তাকে হত্যা করেছি। আমরা সবাই তার হত্যাকারী।"[২২] নীটশে এভাবে সব বন্ধনমুক্ত হয়ে মুক্ত মানুষের জয়গান গান। মানুষের অস্তিত্বকে সব কিছুর উর্ধ্বে তুলে ধরেন। তিনি ঈশ্বরকে এখানে মূলত একভাবে স্বীকার করেন। কারণ ঈশ্বর আছেন বলেই তাকে হত্যার প্রসঙ্গ আসে। নীটশেকে অনুসরণ করেন মার্টিন হাইদেগার (১৮৮৯-১৯৭৬)। তিনি *Being and Time* (১৯২৭) গ্রন্থে অস্তিত্ববাদের বিবরণ দেন। কিয়ের্কেগার্ডকে অনুসরণ করে তিনিও বলেন মানুষের জীবন সংগ্রামমুখর। তাকে অস্তিত্বের জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হচ্ছে। মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার জোর সমর্থক তিনি। উল্লেখ্য নীটশে ও হাইদেগার এদুজনই হিটলারের নাজিবাদের সমর্থক ছিলেন। নাস্তিক্যবাদী অস্তিত্ববাদের আরেকজন বিশিষ্ট সমর্থক জ্যাঁপল সাঁত্রে। তিনি আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের পক্ষ নেন । নীটশের মত তিনিও বলেন, ঈশ্বরের ধারণা অযৌক্তিক ও অলীক। সাঁত্রের মতে মানুষ শব্দটির সাথে অপরিহার্যভাবে যে জিনিসটি বিদ্যমান তা হলো তার অস্তিত্ব।[২৩]

অস্তিত্ববাদ মানুষকে স্বাধীনতা দিতে গিয়ে স্বেচ্ছাচারী বানিয়ে ফেলেছে বলে সমালোচকগণ অভিযোগ করেন। তবে এর আস্তিক্যবাদী ধারা অধিবিদ্যার পক্ষে বড় ভূমিকা রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

উপযোগবাদ

উপযোগবাদ একটি নৈতিক মত। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাসের মত ছিল যা সুখ দেয় তাই ভালো। সেখান থেকেই সুখবাদের (Hedonism) সূচনা। আধুনিক যুগে নৈতিক আদর্শ হিসেবে সুখবাদের নব্য সংস্করণ উপযোগবাদ উপস্থাপিত হয়। সর্বাধিক সংখ্যক লোকের জন্য সর্বাধিক সুখ-এটাই হচ্ছে উপযোগবাদের মূল কথা। বৃটিশ নীতিবিদ জেরোমি বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩২) সর্বপ্রথম এই ধারণাটির ব্যাখ্যা দেন। পরবর্তীকালে জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-৭৩) এই মতবাদটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। তাঁর *Utilitarianism* গ্রন্থের মাধ্যমে ১৮৬৩ সালে তা প্রকাশিত হয়। নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে বুদ্ধিবাদ, পূর্ণতাবাদ ও বিচারবাদের মত এটাও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদ। প্রয়োগবাদের আলোচনায় আমি বলেছি, সেখানে উপযোগবাদের একটা প্রভাব রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকানদের কাছে প্রয়োগবাদ যেমন, তেমনি বৃটিশদের কাছে উপযোগবাদ আদর্শ নৈতিক মত। উপযোগবাদ অধিবিদ্যাকে স্বীকার করে না। মিল একজন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। এজন্যই তাঁর কাছে আধিবিদ্যক প্রশ্নের ব্যাপারে বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিল না। আধ্যাত্মিক সত্তার ব্যাপারে আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই এবং কোনো কল্পনাও আমরা এ ক্ষেত্রে করতে পারি না। তবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারে তিনি বলেন এর পক্ষে এবং বিপক্ষেও যুক্তি দেওয়া যায়। তবে সম্পূর্ণ শুভ ও পরম ক্ষমতাধর ঈশ্বরের অস্তি ত্বের কোনো প্রমাণ নেই। জগতে যে দুঃখ কষ্ট ও অন্যায়-অপূর্ণতা লক্ষ করা যায়, তাতে প্রমাণিত হয় যে, ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি দয়ালু নন। আবার তিনি যদি দয়ালু ও নীতিপরায়ন হন তাহলে তাঁর ক্ষমতা অবশ্যই সীমিত।[২৪] তবে উপযোগবাদের ব্যাপারে অভিযোগ উঠলে তিনি বলেন, "ঈশ্বর সব কিছুর উপরে তাঁর সৃষ্ট জীবের আনন্দকেই যদি কামনা করেন তাহলে উপযোগবাদ অধিকতর সুস্পষ্টরূপে একটি ধর্মীয় নীতি।"[২৫] উপযোগবাদ সুখকেই একমাত্র কাম্য বস্তু বলে মনে করে। তবে সুখের গুণগত পার্থক্য রয়েছে।

বার্ট্রান্ড রাসেল

বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) বিগত শতকের সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিক। যুক্তিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব এবং গণিতের দর্শনের উপর তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। একজন সমাজ সংস্কারক ও যুদ্ধের বিপক্ষে শান্তির আন্দোলনের তিনি অগ্রপথিক ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ বর্ণাঢ্য জীবন দর্শনের এক অমূল্য গৌরব। ৭০ এর অধিক গ্রন্থ ও প্রায় ২ হাজার প্রবন্ধ রচনা করেন তিনি। ১৯৫০ সালে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ অর্জন করেন। তাঁর পূর্ণ নাম- বার্ট্রান্ড আর্থার উইলিয়াম রাসেল, জন্ম গ্রহণ করেন ওয়েলসে ১৮ মে, ১৮৭২। তাঁর পিতামহ লর্ড জন রাসেল রানী ভিক্টোরিয়ার সময় বৃটেনে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। পিতা লর্ড রাসেল ও

মাতা লেডি আম্বারলির ২য় সন্তান রাসেল। ৬ বছর বয়সে তিনি বোন, পিতামাতা ও পিতামহকে হারান। তাঁর ভাই ফ্রাংক (যিনি ১৯৩১ এর মারা যান) সহ মাতামহের আশ্রয়ে তিনি বড় হন। নিঃসঙ্গতা, দুঃখ নিয়ে বড় হন তিনি এবং গৃহ শিক্ষকের কাছে তাঁর ছাত্র জীবন শুরু হয়। ১১ বছর বয়সেই ইউক্লিডীয় জ্যামিতির উপর তাঁর প্রবল ভালোবাসা তৈরি হয়। ১৮৯০ সালে ক্যাম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে গণিত পড়ার জন্য ভর্তি হলে তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনের অবসান ঘটে। প্রথম জীবনে হেগেলিয় ভাববাদের প্রতি আকৃষ্ট হলেও অচিরেই তা বর্জন করেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে। রাসেলের উল্লেখযোগ্য রচনা *Principia Mathematica, Problems of Philosophy, Human Knowledge: Its Scope and Limits, My Philosophical Development* ইত্যাদি।[২৬]

বার্ট্রান্ড রাসেল বৃটিশ বিশ্লেষণী ও বাস্তববাদী দর্শনের মূল ব্যক্তি। দর্শনে তাঁর বর্ণনাতত্ত্ব (Theory of description), নিরপেক্ষ একত্ববাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁর বিশেষত্ব ছিল তিনি নিজেই তাঁর রচনার সংশোধন করতেন। এভাবে তাঁর মতের বিবর্তন দেখা যায়, তবে তাঁর মূল চিন্ত াধারা ভাববাদ বিরোধিতায় কোনো বিবর্তন হয় নি। তাঁর বর্ণনাতত্ত্ব প্রথম ১৯০৫ সালে "On Denoting" প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়, পরে *Principia Mathematica* গ্রন্থে আসে।

রাসেলের আধিবিদ্যক মত হলো "Neutral Monism" বা নিরপেক্ষ একত্ববাদ। এই মতবাদ অনুযায়ী, জগৎ কেবল এক ধরনের উপাদান দিয়ে গঠিত, যা মানসিক নয় এবং জড়ীয়ও নয়। ভাববাদ যেমন মন ছাড়া কোনো কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না এবং জড়বাদ জড় ছাড়া সব কিছুকে অস্বীকার করে - এই দুই পন্থার মধ্যবর্তী মত হলো নিরপেক্ষ একত্ববাদ যা মনও নয় জড়ও নয়। তাঁর ভাষায়-

> নিরপেক্ষ একত্ববাদ- ভাববাদী একত্ববাদ ও জড়বাদী একত্ববাদের বিপরীতে এমন একটি তত্ত্ব যেখানে সাধারণত মানসিক কাজ রূপে গণ্য এবং সাধারণভাবে দৈহিক বলে গণ্য জিনিসগুলোতে কোনো পার্থক্য নেই; এই অর্থে যে, কোনো অভ্যন্তরীণ গুণ একদিক থেকে যুক্ত থাকবে অন্যদিক থেকে থাকবে না এমন নয়, বরং পার্থক্য হলো ব্যবস্থাপনা ও প্রসংগের।[২৭]

এর ব্যাখ্যার জন্য রাসেল একটি ডাক নির্দেশিকার (Postal Directory) তুলনা দেন। যেখানে একই জিনিসের দুই পদ্ধতিতে নাম দেওয়া হয়- বর্ণানুক্রমিক (alphabetical) এবং অবস্থানগত (geographical)। রাসেল বর্ণানুক্রমিককে বলেন মানসিক এবং অবস্থানগতকে বলেন জড়ীয়। উভয়ই মূলত একই জিনিসের নির্দেশক। এভাবে তিনি প্রমাণ করেন দৈহিক ও মানসিক জিনিস পৃথক নয় বরং এক।

রাসেল সমকালীন দর্শনকে ৩ টি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করেন; প্রাচীন ধারা যা অধিবিদ্যার সাথে সম্পৃক্ত, বিবর্তনবাদী ধারা এবং যৌক্তিক পরমাণুবাদ (logical atomism) যা গণিতের বিচারমূলক সূক্ষ্ম পরীক্ষার মাধ্যমে দর্শনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[২৮] এই আলোচনায় তিনি অধিবিদ্যার কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, যুক্তিবিদ্যার অভ্যন্তরীণ বিপ্লবের মাধ্যমে "Traditional metaphysics" এর উচ্চাভিলাষী সংগঠনগুলো ভেসে গেছে।[২৯] ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারে তাঁর মত হলো, একজন দার্শনিক হিসেবে তাঁকে অজ্ঞেয়বাদী বলা উচিত, কারণ তিনি মনে করেন না একজন ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণে বিশেষ কোনো যুক্তি থাকতে পারে।[৩০] কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে নিজেকে তিনি একজন নাস্তি ক দাবি করেন; কারণ,ঈশ্বরের অস্তিত্ব তিনি প্রমাণ করতে পারেন না।[৩১] ১৮৯৮ সালে তিনি হেগেলিয় ভাববাদ ত্যাগ করে জি.ই.মূরের প্রেরণায় বাস্তববাদী মত গ্রহণ করেন, ১৮৯৭ সালের একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন,

> আমরা অধিবিদ্যাকে কাব্য ও সঙ্গীতের মত ব্যাবহার করতে পারি, যা কাব্য ও সঙ্গীতের মতই বিশ্বজগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটি মনোভাব সৃষ্টি করে; আর এর ফলে সৃষ্ট মানসিক অবস্থা বিশ্বাসের সত্যতার আলোকে না হয়ে বরং কাব্যিক আবেগ দ্বারাই মূল্যায়িত হয়।[৩২]

এখানে রাসেল যে আবেগের বর্ণনা দিলেন, একজন প্রাণি হিসেবে সেই আবেগে কম বেশি সবাই আমরা আক্রান্ত।অধিবিদ্যার বিপক্ষে যে সব বিখ্যাত দার্শনিক কথা বলেছেন সেখানেও একই আবেগের প্রমাণ দেওয়া সম্ভব। *Has Religion Made Useful Contributions to Civilization?* রচনায় তিনি সভ্যতার অগ্রগতিতে ধর্মের ভূমিকা অস্বীকার করেন নি। তবে এখানে খ্রিষ্টীয় নৈতিকতার সমালোচনা করেন। ব্যভিচারের চেয়ে ঘুষ গ্রহণকে তিনি বড় পাপ মনে করেন। এখানে, দুই কারণে তিনি ধর্মের ব্যাপারে আপত্তি তোলেন, একটি বুদ্ধিগত ও অন্যটি নৈতিক। বৌদ্ধিক আপত্তি হচ্ছে, যে কোনো ধর্মকে সত্য বলার পেছনে আসলে যুক্তি নেই। নৈতিকতার ব্যাপারে তিনি বলেন,"আমি বিশ্বাস করি না সমগ্র ইতিহাসে এমন একজন বিশপও আছেন,যার ধার্মিকতা জনকল্যাণে নিয়োজিত হয়েছে।"[৩৩] যে যুক্তি দিয়ে তিনি ধর্মকে খণ্ডন করেন একই যুক্তি অধিবিদ্যার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন। ঈশ্বরের অস্তি ত্বের ব্যাপারে design argument তুলে ধরে তিনি বলেন, এটা যথাযথ যুক্তি নয়। হিউমের মত তিনিও বলেন- জগৎ নানা অপূর্ণতায় ভরপুর, সুতরাং জগতের সৌন্দর্য ঈশ্বরকে প্রমাণ করে না। ব্যক্তিগত অমরতায় যে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, তাকে তিনি নৈতিকতার উপর বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বলে আখ্যায়িত করেন। একই কারণে তিনি দেহ ও মনের দ্বৈতবাদী নীতিকেও দর্শনের জন্য বিপর্যয়কর মনে করেন।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

বার্ট্রান্ড রাসেলের দর্শনে অনেক বিষয়ের আলোচনা এসেছে। কোনো কিছুই তিনি বাদ রাখেন নি। বর্তমান শতকে এবং আরো বহুকাল ধরে তাঁর দর্শন মানুষ গভীরভাবে অধ্যয়ন করবে। কিন্তু অধিবিদ্যা, ধর্ম, অমরতা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর মতামত কোনো অধিবিদকেই সন্তুষ্ট করতে পারে নি।

সমকালীন আধিবিদ্যক ধারা

আমি এতক্ষণ অধিবিদ্যা-বিরোধী ধারাগুলোর আলোচনা করেছি। এর বিপরীতে একটি শক্তিশালী আধিবিদ্যক ধারা ইউরোপ ও আমেরিকায় সৃষ্টি হয়েছে। বৃটিশদের মধ্যে গ্রীন, ব্রাডলি, বোসাংকে, ম্যাকটেগার্ট, প্রিঙ্গল প্যাটিসন; ফরাসিদের মধ্যে বার্গসোঁ, রিনোভিয়ার, রোটরক্স, ইতালিয়দের মধ্যে ক্রোচে, জেন্টিলে; আমেরিকান জনাথন এডওয়ার্ডস, এমার্সন, রয়েস, জার্মানির ফেখনার, লজ, উইলহেম, উল্ড প্রমুখ সমকালীন খ্যাতিমান অধিবিদ। বর্তমান সময়কার এইচ ডি লিউইস, সি.ই.এম.জোয়াড, আইটি রামজে, ম্যাক ইন্টায়ার, পিটার ভ্যান ইনওয়াগান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য অধিবিদ। তাঁদের আলোচনায় অধিবিদ্যা বিরোধী প্রতিটি ধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা ও জবাব রয়েছে। আমি এখানে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সম্পর্কে আলোচনা করব। বর্তমান সময়ের বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এরিস্টটল, অগাস্টিন, কান্টের সমালোচনা করে দেশ কাল সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তুলে ধরেন। যদিও বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্বই চূড়ান্ত নয়। মহাবিশ্বের বিস্ময়কর সৃষ্টির পেছনে আমাদের কল্পিত ঈশ্বরকে তিনি তুচ্ছ করেন। হকিং এর ভাষা, "...এর জন্য কি একজন স্রষ্টা দরকার? তাই যদি হয় তাহলে মহাবিশ্বের উপর তাঁর আর কি অভিক্রিয়া থাকতে পারে? তাছাড়া তাঁকে কে সৃষ্টি করেছিল?"[৩৫]এই প্রশ্ন শুধু তাঁর নয়। জড়বাদের সূচনা থেকে চলমান এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এতটুকু অস্বীকারের কী কারণ থাকতে পারে যে, আমাদের এবং এই বিশ্বজগতের উৎপত্তির পেছনে একজন জড়িত আছেন? আইনস্টাইনও একবার প্রশ্ন করেছিলেন- "মহাবিশ্ব গঠনে ঈশ্বরের কতটুকু স্বাধীনতা ছিল?"[৩৬] অন্যদিকে এপিজে আবদুল কালামসহ অনেক বিজ্ঞানী ঈশ্বরের অস্তিত্বের পেছনে বিজ্ঞানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপক কোনো যুক্তি খুঁজে পান না। কালাম বলেন, "আমি শিক্ষিত হয়ে ভাবি, অনেকে এ কথা কেন মনে করেন যে, বিজ্ঞান মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়? আমার যা মনে হয়, বিজ্ঞান সর্বদাই হৃদয়ের মধ্য দিয়ে পথ করে যেতে পারে। আমার দৃষ্টিতে বিজ্ঞান চিরকালই আধ্যাত্মিক সম্পদ এনে দেয় আর আত্মোপলব্ধি দান করে।"[৩৭] হকিং ভিটগেনস্টাইনকে গত শতাব্দীর সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিক হিসেবে উল্লেখ করে বলেছিলেন- "ভিটগেস্টাইনের মত ছিল, দর্শনের কর্মক্ষেত্রের ভিতর একমাত্র অবশিষ্ট ক্ষেত্র ভাষা বিশ্লেষণ। এরিস্টটল ও কান্টের বিরাট ঐতিহ্যের কি অধ:পতন!"[৩৮]হকিংএর এই মন্তব্য বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক নয়,বরং

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাসনির্ভর। সমকালীন দর্শনের বিচিত্র শাখা প্রশাখা এবং দর্শনের ক্রমোন্নতির দিকে না তাকিয়ে তিনি কেবলমাত্র জড়বাদ ভিত্তিক দর্শনকেই দর্শন হিসেবে বোঝাতে চেয়েছেন যার সর্বশেষ পন্থা ছিল ভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঈশ্বর ও আধিবিদ্যক মতবাদ ত্যাগ করে জড়বাদকে প্রতিষ্ঠিত করা। এটা ঠিক,দর্শনে দেশ কালের উৎপত্তি ও ব্যাখ্যায় অনেক আলোচনা এসেছে যার কোনোটাই পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়। হকিংসহ আধুনিক পদার্থবিদগণ মহাবিশ্বের উৎপত্তি,মহাকালের সূচনা প্রভৃতি বিষয়ে প্রচুর অধ্যাবসায় ও সাধনায় নিয়োজিত। যদি পদার্থবিদ্যা এক্ষেত্রে নিশ্চিত ও প্রামাণ্য কিছু দেখাতে পারে তাহলে দর্শনের বা অধিবিদ্যার সেটা মেনে না নেওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু যতদিন তা প্রমাণিতভাবে প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন এরিস্টটল ও কান্টের ঐতিহ্যের অধপতনের দাবিটিকে খুব যথার্থ বলে মেনে নেওয়া কঠিন। নিচে কয়েকজন অধিবিদের আলোচনা করা হলো।

হিল গ্রিন

টমাস হিল গ্রিন (১৮৩৬-৮২) উনিশ শতকের বিখ্যাত অধিবিদ, হেগেলের ভাববাদ প্রভাবিত বৃটিশদার্শনিক। তিনি হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ, মিলের উপযোগবাদ এবং স্পেনসারের বিবর্তনবাদের সমালোচনা করেন। হেগেলের objective idealism এর তিনি একজন অনুসারী ছিলেন। তিনি বিবর্তনবাদের পক্ষে ছিলেন এবং জীব দেহ থেকে মানব দেহের বিবর্তন হতে পারে বলে মনে করেন, কিন্তু এ সবের পেছনে আধ্যাত্মিক নীতির অনিবার্যতাও স্বীকার করেন। বৃটিশ ভাববাদী বেঞ্জামিন জোয়েটের প্রভাবে পড়ে তিনি হেগেলের ভাববাদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী এবং সেন্ট পলের মতবাদের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। নৈতকিতার ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদী মত গ্রহণ করতে তিনি অস্বীকৃতি জানান। গ্রিনের প্রভাব পড়ে জন কেয়ার্ড, ব্রাডলি, বোসাংকে সহ পরবর্তী বৃটিশ ভাববাদীদের উপর।

হিল গ্রিনের মতে, মানুষ একটি আধ্যাত্মিক সত্তা। প্রকৃতিতে সংঘটিত ঘটনা প্রবাহের মধ্যে মানুষকে একটি প্রাকৃতিক সত্তা বলা ঠিক হবে না। মানুষের মধ্যে এমন একটি নীতি বা শক্তি রয়েছে যা প্রাকৃতিক নয়। এই নীতি বা শক্তির বিশেষ কাজ হলো জ্ঞানকে সম্ভব করে তোলা। তাঁর মতে, দর্শন বা অধিবিদ্যা আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় সত্তা নিয়ে আলোচনা করে।[৩৯] তিনি অভিজ্ঞতাবাদ ও বিবর্তনবাদের সমালোচনা করে বলেন, এগুলো কেবল বাহ্যিক জগৎ নিয়ে কাজ করে। অথচ এগুলোর মাঝে এক আধ্যাত্মিক নিয়ম বিদ্যমান। প্রকৃতির শৃঙ্খলার দিকে তাকালে দেখা যায়, সব একই নীতির সৃষ্টি। এতে প্রমাণিত হয় সামগ্রিকভাবে প্রকৃতিও একটি আধ্যাত্মিক জগৎ আর এগুলো সৃষ্টি হয়েছে বুদ্ধিমান সত্তার মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

বোসাংকে

বার্নাড বোসাংকে (১৮৪৮-১৯২৩) ইংল্যান্ডে হেগেলিয় ভাববাদের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তাঁর নিকট কান্ট ও হেগেল ছিলেন অনুকরণীয় দার্শনিক। তবে প্লেটোর দর্শন দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হন। তিনি তাঁর *A Psychology of the Moral Self* গ্রন্থে দেহ ও মনের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। এখানে তিনি দ্বৈতবাদের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেন। তিনি মনকে দেহের পূর্ণতা রূপে ব্যাখ্যা করেন। বোসাংকে তাঁর ভাববাদের নাম দেন অনুধ্যানমূলক দর্শন (speculative philosophy)।[৪০] কাল সম্পর্কে তিনি গতানুগতিক দু'টি মতের উল্লেখ করেন; যার একটি, পরম সত্তা কালে অবস্থিত- এমতের অনুসারীদের তিনি বলেন, প্রগতিবাদী। তাঁরা পরম সত্তার বিবর্তন ও প্রগতিতে বিশ্বাসী। দ্বিতীয় প্রকার- যাঁরা মনে করেন কাল পরম সত্তায় অবস্থিত- এই চিন্তার অনুসারীদের তিনি নাম দেন পূর্ণতাবাদী। এই মত অনুসারে পরম সত্তায় কোনো পরিবর্তন নেই, থাকতে পারে না। তিনি নিজে ছিলেন এই মতের অনুসারী। ব্রাডলির মত তিনিও বলেন সব কিছুই অবভাস, একমাত্র পরমসত্তাই বাস্তব। বোসাংকে ব্রাডলিকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসরণ করেন। তিনি বলেন, "অবভাস বলতে আমি বুঝি আংশিক বাস্ত বতা: আমি মনে করি না যে, এমন কোনো অবভাস আছে যা বাস্তবতার বাইরে। আমি যতটুকু বুঝি,সমস্যাটা কালের বাস্তবতা নয়,বরং চূড়ান্ততা নিয়ে।"[৪১] ব্রাডলির মত তিনিও মনে করেন,পরমসত্তা বিরোধমুক্ত একটি সমগ্র এবং যেহেতু তা সর্বালিঙ্গনকারী ও স্বনির্ভর সেজন্য তাকে অবশ্যই অসীম একক হতে হবে।

তাঁর কল্পনায় পরমসত্তা এমন একজন শিল্পী যিনি তার কল্পিত ও রচিত সর্বজনীন নাটকের ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন। এখানে যেমন আছে নাটকীয় তাৎপর্য তেমনি আছে যৌক্তিক সামঞ্জস্য। এভাবেই তিনি পরমসত্তা বা অন্য কথায় ঈশ্বরকে শিল্পী হিসেবে ব্যক্ত করেন।

ম্যাকটেগার্ট

জন এলিস ম্যাকটেগার্ট (১৮৬৬-১৯২৫) বিংশ শতকের গোড়ার দিকের একজন গুরুত্বপূর্ণ বৃটিশ দার্শনিক ও অধিবিদ। তিনি বিখ্যাত ছিলেন তাঁর *The Nature of Existence (NE), The Unreality of Time* সহ বিভিন্ন গ্রন্থের কারণে। প্রথম জীবনে তিনি হেগেলকে পূর্ণ অনুসরণ করেন, কিন্তু পরবর্তীতে লাইবনিজ ও লজের মতের দিকে আকৃষ্ট হন, তবে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হন ব্রাডলির রচনার মাধ্যমে। তাঁর মতে, ব্রাডলি ছিলেন তাঁর সময়ের সবচেয়ে বড় জীবন্ত দার্শনিক। জি.ই.মূর তাঁর শিক্ষক ম্যাকটেগার্ট সম্পর্কে এ প্রসঙ্গে বলেন, "যখন ব্রাডলি তাঁর কাছে আসতেন তখন ম্যাকটেগার্ট

Dhaka University Institutional Repository

অনুভব করতেন, এক প্লেটোনিক প্রত্যয় যেন তাঁর কক্ষে প্রবেশ করছে।"[৪২] বার্ট্রান্ড রাসেল প্রথম জীবনে ম্যাকটেগার্ট কর্তৃক প্রভাবিত হন। তাঁর *Some Dogmas of Religion* গ্রন্থের শুরুতেই তিনি বলেন, অধিবিদ্যা হচ্ছে সত্তার পরম স্বরূপের পদ্ধতিগত বিদ্যা। পদার্থবিদ্যা কখনো অধিবিদ্যার স্থান দখল করতে পারে না। এক্ষেত্রে দ্বৈতবাদী, বার্কলিয়ান, হেগেলিয়ানসহ সব অধিবিদ একই পদ্ধতির অনুসরণ করেন। এই গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি God কে সংজ্ঞায়িত করেন একজন ব্যক্তি হিসেবে যিনি সর্বোচ্চ ও শুভ। তিনি ঈশ্বরকে সবচেয়ে দয়াময় বা সর্বশক্তিমান বলে স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে যে কোনো সৃষ্ট জিনিস থেকে God অধিকতর শক্তিশালী এবং মন্দের চেয়ে তিনি অধিকতর শুভ।[৪৩]

ম্যাকটেগার্ট তাঁর আধিবিদ্যক মতের নাম দেন Ontological Idialism। তাঁর NE গ্রন্থে তিনি এর বিবরণ দেন। গ্রন্থের শুরুতেই তিনি অস্তিত্বের স্বরূপ বর্ণনা করেন: "সর্বজনীনভাবে এটা স্বীকৃত যে, অস্তিত্বশীল জিনিস মাত্রই অবশ্য বাস্তব হবে অথচ বিষয়টা এমনভাবে পোষণ করা হয় যে, এমন এক বাস্তবসত্তা আছে যার কোনো অস্তিত্ব নেই।"[৪৪] তাঁর কথা ছিল অস্তিত্ব মাত্রই বাস্তব। একই গ্রন্থের ৬৬ পৃষ্ঠায় তিনি দ্রব্যের ধারণা দেন। তাঁর মতে, যা কিছুই অস্তিত্বশীল তার গুণ আছে। এসব গুণ নিজেই অস্তিত্বশীল হবে এবং এগুলোরও গুণ থাকবে এবং এভাবে সামাহীন প্রক্রিয়ায় তা চলবে। কিন্তু এই ক্রমের শীর্ষে এমন কিছুর অস্তিত্ব থাকবে যার নিজস্ব গুণ ছাড়াও গুণ থাকবে (which has qualities without being itself a quality)। এরই মৌলিক নাম এবং তিনি মনে করেন এর সবচেয়ে উপযুক্ত নাম হলো দ্রব্য।[৪৫] তাঁর এই দ্রব্যের ধারণাই ব্রাডলির Reality. এখানে লক্ষ্য করা যায় তিনি ব্রাডলির সম্বন্ধ নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি সময়ের বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন, কিন্তু আত্মার অমরতার কথা অস্বীকার করেন নি। অধিবিদ্যার জ্ঞানের জন্য তিনি আরোহ প্রক্রিয়াকে অনুপযুক্ত মনে করেন। কারণ আরোহে সব সময় সংশয় বিদ্যমান থাকে।[৪৬]

প্রিঙ্গল প্যাটিসন

এন্ড্রুসেথ প্রিঙ্গল প্যাটিসন (১৮৫৬-১৯৩১) বৃটিশ ভাববাদের আরেকজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি। তিনি ছিলেন স্কটল্যান্ডের অধিবাসী এবং এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যার প্রফেসর। তাঁর *The Idea of God in the Light of Recent Philosophy* (১৯২০) এবং *The Idea of Immortality* নামক দুটি গ্রন্থে অধিবিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনা পাওয়া যায়। *The Idea of God* ছিল Gifford এ প্রদত্ত ২০টি ভাষণের সমন্বয়। এখানে শুরুতেই তিনি তাঁর পূর্বসূরি হিউমের *Dialogues* এর সমালোচনা করেন। হিউম ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রচলিত যুক্তি খণ্ডন করেন। কিন্তু প্যাটিসন বলেন- তাঁর এই সিদ্ধান্ত তাৎপর্যহীন। এই গ্রন্থে মিল, ব্রাডলি, জেমস, বার্গসোঁ, বোসাংকে,

Dhaka University Institutional Repository

ম্যাকটেগার্টের আলোচনার সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে, "সত্য, সুন্দর, মঙ্গল, ভালোবাসা এগুলোই ঈশ্বরের সত্তাকে তৈরি করে।"[৪৭]

The Idea of Immortality গ্রন্থে তিনি অমরতার ধারণা ব্যাখ্যা করেন। প্লেটো এরিস্টটল থেকে শুরু করে খ্রিস্টীয়, ইহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি মতের আলোকে আত্মার ব্যাখ্যা করেন। হিউমের এই সংক্রান্ত মতকে তিনি আবেগ নির্ভর বলে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে হিউমের যুক্তি মানুষকে খেকশিয়াল ও খরগোশের সাথে তুলনা করে।[৪৮]

আই.টি. রামজে

রামজে (১৯১৫-৭২)সমকালীন অধিবিদ্যা,ধর্মতত্ত্ব ও নীতিবিদ্যার পক্ষে একজন বলিষ্ঠ সমর্থক।১৯৫১ সালে তিনি অক্সফোর্ডের খ্রিষ্টীয় ধর্ম দর্শনের প্রধান নিযুক্ত হন।১৯৭০এ তাকে বিবিসি'র সেন্ট্রাল রিলিজিয়াস এডভাইজরি কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তিনি অনেক বক্তৃতা করেন। পরবর্তীতে সেগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *Freedom and Immortality*; *Religion and Science*; *On Being Sure in Religion*; *Models and Mystery*; *Christian Discourse* । তাঁর মতে, পরিবর্তন ও স্থানান্তরের এই বিশ্বজগতে মানুষ কোথায় ভ্রমন করে চলছে-এমন বিষয় জানার আকাঙ্ক্ষা থেকেই অধিবিদ্যার উদ্ভব হয়েছে;মানুষ যখনই বিশ্বজগতের চিত্র আঁকতে চায় এবং এর ভিতর তার অবস্থান নির্ণয় করতে চায় অধিবিদ্যা তখনই সাড়া দেয়।[৪৯] কান্টের তিনটি প্রশ্নের আলোকে তিনি মানুষের আধিবিদ্যক চেতনার ব্যাখ্যা করেন। প্রশ্নগুলো ছিল,১."আমি কী জানতে পারি?" ২."আমার কী করা উচিত?"৩."আমি কী আশা করতে পারি?" তিনি মনে করেন মানুষের মধ্যে সহজেই এসব প্রশ্ন আসে ,আর এই প্রশ্নই তাকে অধিবিদ্যার কাছে নিয়ে যায়।[৫০]

প্রত্যক্ষবাদী ও ভাষাতাত্ত্বিক আক্রমন থেকে অধিবিদ্যা ও ধর্মকে রক্ষার চেষ্টা করেন তিনি। ধর্মীয় ভাষার বিকাশ সাধনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত প্রকাশকে তিনি ভিত্তি হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "এও তো সম্ভব যে, আমাদের অত্যাবশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলির জন্য অদ্ভূততম ভাষাই অপরিহার্য। আর অদ্ভুত হওয়া সত্ত্বেও যদি এ ভাষা তার আলোচ্য বিষয় বা লক্ষ্য- বস্তুর সার্থক বর্ণনা ও ভাষ্য হয়ে থাকে তাহলে এর ব্যবহারের যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে লাভ কি?"[৫১]

Dhaka University Institutional Repository

বার্গসোঁ

হেনরি লুই বার্গসোঁ (১৮৫৯-১৯৪১) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফরাসি দার্শনিক। ১৯২৭ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর সময় কালটা ছিল ডারউইনের বির্তনবাদ দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু তিনি তাঁর যান্ত্রিক বা জৈবিক বিবর্তনের পরিবর্তে "Creative Evolution" এর ধারণা দেন। অধিবিদ্যার উপর তাঁর মৌলিক ধারণা "Intuition"। ধর্মের দিক থেকে ইহুদী হলেও তিনি খ্রিষ্টীয় মর্মীবাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। ডারউইনের সমালোচনা করে তিনি বলেন, মানুষ ইতর প্রাণীর অংশ বিশেষ হতে পারে না। তাঁর *Introduction to Metaphysics* গ্রন্থে স্বজ্ঞার পরিচয় ও গুরুত্ব বর্ণনা করেন এবং ঈশ্বরকে পেতে স্বজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন। তাঁর ভাষায়- কমপক্ষে একটি মাত্র বাস্তব সত্তার অস্তিত্ব আছে, যাকে আমরা সবাই ভিতর থেকেই জানি, কোনো সাধারণ বিশ্লেষণ না করেই সজ্ঞার মাধ্যমে জানি।"[৫২]এই গ্রন্থে তিনি অধিবিদ্যাকে বিজ্ঞানের সমর্থক মনে করেন এবং Reality সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ মত প্রকাশ করেন।[৫৩]

তাঁর দর্শনের আরেকটি স্বতন্ত্র পরিভাষা elan vital বা the vital impetus (জীবনীশক্তি)। *Creative Evolution* গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ের শেষ পরিচ্ছেদে এই সংক্রান্ত আলোচনা করেন। তবে কেন্দ্রীয় ধারণা হিসেবে বিভিন্ন স্থানেই তিনি একে ব্যবহার করেন। তাঁর মতে এখান থেকেই সব কিছুর সূচনা,

> সুতরাং আমরা সেই ধারণার দিকেই আবার ফিরে আসছি যেখান থেকে শুরু করেছিলাম। অর্থাৎ জীবনের মৌলিক প্রাণশক্তি যা বিভিন্ন প্রজন্মের মাঝে আন্ত-সেতুবন্ধনের মত ক্রম বিকাশের মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম অতিক্রম করে চলেছে।[৫৪]

বিবর্তন প্রক্রিয়ায় এই জীবনী শক্তি প্রবহমান। কখনো কখনো এই প্রাণশক্তিকে তিনি বিবর্তনশীল ঈশ্বর বলে উল্লেখ করেন।[৫৫] যান্ত্রিক বিবর্তনের সমালোচনা করে তিনি বলেন, একটি চক্ষুর মধ্যে যে জটিল ক্রিয়াপরতা (Mechanism) তা একটি অসীম সমস্যার সৃষ্টি করে। এর অর্থ নিশ্চয় এটা একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে ধাবমান।[৫৬]

তাঁর *The Two Sources of Morality and Religion* গ্রন্থে তিনি ধর্মের উপকারিতার কথা বর্ণনা করে বলেন, সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে এর ভূমিকা অনেক। তিনি নিশ্চল ধর্ম বিশ্বাস (Static Religion) এবং সচল ধর্ম বিশ্বাস (Dynamic Religion) নামে ধর্মের মধ্যে দুটি ভাগ করেন। তাঁর মতে সাধারণ মানুষ নিশ্চল ধর্মে বিশ্বাসী, কিন্তু মর্মীবাদীগণ সচল ধর্মে বিশ্বাসী।[৫৭] তিনি

Dhaka University Institutional Repository

Mysticismকে Vital impetus এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করেন। এরিস্টটলের ঈশ্বরের ধারণার তিনি সমালোচনা করেন এবং বলেন আধুনিক যুগে তাঁর ধারণার অনুসরণের কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না।[৫৮] তিনি স্বজ্ঞার মাধ্যমের ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়ার পরামর্শ দেন।

যোসিয়া রয়েস

আমেরিকার বিখ্যাত অধিবিদ ও ভাববাদী দার্শনিক যোসিয়া রয়েস (১৮৫৫-১৯১৬) হেগেলের অনুসরণে যে ভাববাদ প্রচার করেন তা ছিল প্রয়োগবাদ প্রভাবিত ভাববাদ। তাঁর আধিবিদ্যক মত প্রকাশিত হয়েছে *The World and the Individual* নামক 'Gifford Lecture' সমগ্রে ১৯০১ সালে। ১৯০১ ও ১৯০২ সালে উইলিয়াম জেমস গিফোর্ড বক্তৃতায় রয়েসের মতবাদের সমালোচনা করেন। আর রয়েস ১৯১২ সালে প্রকাশিত তাঁর *The Sources of Religious Insight* গ্রন্থে এর জবাব দেন।[৫৯] *World and Individual* গ্রন্থের ১ম সিরিজে তিনি ১০ টি ভাষণ দেন। সত্তা সম্পর্কিত মত, বাস্তববাদের সমালোচনা, মর্মীবাদের ব্যাখ্যা এবং সবশেষে ব্রাডলির মতের পর্যালোচনা রয়েছে এসব বক্তৃতায়। তিনি প্রয়োগবাদী নীতিবিদ্যার সমর্থন করলেও জেমসের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন করেন নি। তবে তিনি মর্মীবাদের উপরই বেশি আগ্রহী ছিলেন। তাঁর মতে, মর্মীবাদের সুচনা হয়েছিল উপনিষদে, এরপর প্লেটো, এরিস্টটলের দর্শনে এবং পরে বিভিন্ন ধর্মীয় চিন্তায় তার প্রকাশ পায়।[৬০]

এতক্ষণের আলোচনায় আমির সমকালীন অধিবিদ্যার পক্ষ ও বিপক্ষ দু'টি ধারার আলোচনা করেছি। বর্তমান সময়ে অধিবিদ্যার প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু তার কিছু উত্তর হয়ত এসেছে। এ প্রসঙ্গে আরো দু'একটি কথা যোগ করে এই অধ্যায় শেষ করতে চাই।

গিলবার্ট রাইল বলেন,"আমি এ যাবত হাজারের উপর দার্শনিক সভায় যোগ দিয়েছি এবং হাজারের উপর প্রবন্ধ পড়েছি। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় ২০ টি আলোচনাও আমি এমনকি ধর্মতত্ত্বের উপর পেয়েছি কি না।"[৬১] প্রকৃতপক্ষে বর্তমান যুগে অধিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বের আলোচনা অনেক সীমিত এতে সন্দেহ নেই। রাইল হয়ত সে কারণেই বলেন, "ধর্মতাত্ত্বিক কয়লা যখন উত্তপ্ত ছিল তখন ধর্মতাত্ত্বিক দর্শন টগবগিয়ে ফুটছিল। যদি এখন ধর্মতাত্ত্বিকের কেতলি থেকে এমনকি বাষ্পও বের না হয় তাহলে বুঝতে হবে আগুন নিভে গেছে।"[৬২] তিনি আরো বলেন, তিনি চরম পন্থা অবলম্বন করতে চান না। তাঁর মতে,হয়ত আগুন নিভে গেছে কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ বরফ হয়ে যায় নি। রাইলের এই বক্তব্য অধিবিদ্যার প্রতি তাচ্ছিল্য এতে সন্দেহ নেই। তিনি নিজেও পরে ভালজিনিস গ্রহণ করতে এবং সমস্ত খারাপ জিনিস বর্জনের আহবান জানান। অধিবিদ্যার বিপক্ষে যারা যুক্তি দেন এবং যারা আবেগ তাড়িত হয়ে বক্তব্য দেন তারা উভয়েই বর্তমান সময়ের বিখ্যাত দার্শনিক। কিন্তু এই বিরোধিতা কেন?

একটা জিনিস সম্পর্কে সবাই যদি খারাপ বলে তাহলে হয়ত উপযোগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সেটাকে খারাপ বলা যাবে।

ভিটগেনস্টাইন ও উইজডমের মতে,

> আধিবিদ্যক তত্ত্ব ও যুক্তিগুলো এক ধরনের বৌদ্ধিক বৈকল্য কিংবা মানসিক খিঁচুনি রোগের লক্ষণ বিশেষ। অধিবিদ এমন একজন মানুষ যিনি উচ্চাভিলাসী ও বিকৃত তত্ত্ব দিয়ে বিশ্ব জগৎকে ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে ভালযুক্তি দেওয়া যেতে পারে না। একজন অধিবিদের সাথে ভালবিতর্কও করা যায় না। এজন্য প্রথমেই প্রয়োজন তাদের চিকিৎসা। দার্শনিকদের উচিত মনোবিশেষজ্ঞদের ভূমিকায় তত্ত্বে বিভোর অধিবিদদের চিকিৎসা করা।[৬৩]

বি এ ও উইলিয়ামস এর জবাবে বলেন, এটা এক চরম পন্থার দৃষ্টান্ত। অধিবিদদের যদি চিকিৎসা দিতে হয় তাদেরকে স্নায়ুবৈকল্যের অনুরূপ না বলে এক ধরনের স্নায়ু বৈকল্য বলা উচিত। আর যদি তাই হয় তাহলে দর্শন বা দার্শনিক বিশ্লেষণের কাজ হবে মনোরোগের চিকিৎসা। কিন্তু প্রকৃত মনোরোগ চিকিৎসক যা করেন তা যদি দার্শনিক করতে যান তাহলে তা হবে খুব তুচ্ছ একটি কাজ। কেউই বিশ্বাস করবেন না অধিবিদ্যা একটা অযৌক্তিক বিষয়, কিংবা দার্শনিকদের চিকিৎসকদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। প্রকৃত পক্ষে অধিবিদ্যার বিষয়টি দার্শনিক বিষয়,মনস্তাত্ত্বিক বিষয় নয়।[৬৪]

অধিবিদ্যার ব্যাপারে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের পর বিশেষত দ্বিতীয় মহা যুদ্ধের পর কেমব্রিজে উইজডম, ভাইসম্যান প্রমুখ ছিলেন এই চিন্তাধারার অনুসারী। এই চিন্তাধারা অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে অত্যন্ত চরমপন্থা অবলম্বন করে যা আমরা উপরের বক্তব্যে লক্ষ করেছি। ভিটগেনস্টাইনের মতে দর্শন থেকে অধিবিদ্যাকে বিসর্জন দেওয়াই দার্শনিকের অন্যতম প্রধান কাজ। সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাঁদের এই বিরোধিতার ভিত্তি ভাষা বিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রত্যক্ষবাদীগণ যেমন পরখনীতি নামক একটি মানদণ্ড তৈরি করেছিলেন এঁদেরকে এমন কোনো বিকল্প মানদণ্ডও উপস্থাপন করতে দেখা যায় না। তাঁরা দর্শনের আলোচ্য বিষয় হিসেবে একমাত্র ভাষার বিশ্লেষণকেই নির্ধারণ করেন। *ট্রাকটেটাসে* ভিটগেনস্টাইন এমন একটি আদর্শ ভাষার প্রস্তাব করেন যাতে কোনো সংশয় ও দুর্বোধ্যতা থাকবে না। কিন্তু পরবর্তীতে *ইনভেস্টিগেশনস* গ্রন্থে এই পথ ছেড়ে দিয়ে তিনি বলেন, "বিচিত্র কাজে আমরা ভাষার ব্যাবহার করি,তাই বিশেষ ভাষার ব্যাবহারের দাবি যুক্তিসংগত নয়।"[৬৫] তাঁর এই মতের বিবর্তন প্রশংসনীয়। আরো কিছু দিন বেঁচে থাকলে তাঁর মতের আরো পরিবর্তন হত সন্দেহ নেই। যদি দর্শনের একমাত্র কাজ হয় ভাষা বিশ্লেষণ তাহলে মনে হয় তিনি দর্শনকে অত্যন্ত সংকোচিত অর্থে দেখেছেন। প্রচণ্ড মেধাশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজের এই ভুলটুকু তিনি ধরতে পারলেন না। তিনি যে ভাষা বিশ্লেষণের প্রস্তাব করেন তা কোন ধরনের ভাষার বিশ্লেষণ তা স্পষ্ট করেন নি- দর্শনের,

বিজ্ঞানের না দৈনন্দিন ভাষার? অধিবিদ্যার ভাষাকে বাদ দিতে পারলেই হয়তো তিনি অন্য সব আপত্তি থেকে সরে আসতেন। তাঁর অনুসারী উইজডম ও ভাইসম্যান অধিবিদ্যা বর্জনের জন্য কিছু যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেন। উইজডম মনে করতেন, "যে কোনো দার্শনিক মতবাদই অর্ধসত্যের বেশি কিছু নয়।"[৬৬] এর মাধ্যমে তিনি ভিটগেনস্টাইনের কঠোরতা লাঘবের একটা চেষ্টা করেন।

রাসেলের সেই উদ্ধৃতি আবার দিচ্ছি, "কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যুক্তি অনুসন্ধানে যদি সিদ্ধান্তটি পূর্বেই প্রদান করা হয় তবে তা দর্শন হয় না। বরং সেই বিষয়ের পক্ষে সনির্বন্ধ আবেদন জানানো হয়।"[৬৭] ভিটগেনস্টাইন এমনকি রাসেল নিজেও অধিবিদ্যা বর্জনের একটা সিদ্ধান্ত হয়ত পূর্বেই নিয়ে ফেলেছেন। পরবর্তীতে যা বললেন তা আসলে একটি আবেদন ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই আমরা কি বলব ভিটগেন্টস্টাইন কিংবা রাসেলের দর্শন আদৌ দর্শন নয়? এমন চরমপন্থা অবলম্বন হয়ত কোনো অধিবিদ সমর্থন করবেন না। আমরা দর্শনকে জীবন ও জগতের জন্য প্রাসঙ্গিক মনে করি। একজন ক্রিকেটারের কাছে হয়ত ফুটবল খেলা অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হবে। তাই বলে তিনি যদি কখনো দেশের শাসক হয়ে সমস্ত ফুটবল খেলা বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব করেন তা কেমন হবে? আমরা এটাকে জীবন দর্শন বলতে পারি না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্লেষণী দর্শনের হাত ধরে অক্সফোর্ড ভাষাতাত্ত্বিক দর্শনের নেতৃত্ব দেন গিলবার্ট রাইল (১৯০০-১৯৭৭), অস্টিন (১৯১১-১৯৬০), স্ট্রসন (১৯১৯-২০০৬) প্রমুখ। প্রকৃতপক্ষে সত্তাকে প্রকাশ করার জন্যই ভাষার ব্যবহার। ভাষার বিশ্লেষণ দ্বারা সত্তাকে পাওয়া যাবে না। তাছাড়া আমরা যে বিজ্ঞানের ভাষার কথা প্রায় শুনি তা জীবনে কতটুকু কাজে লাগে? গণিতের এমন অনেক প্রত্যয় আছে যা আমাদের জীবনে আদৌ কোনো কাজে লাগে না।একই ভাবে পদার্থ, রসায়ন, জীববিদ্যায় অনেক পরিভাষা আছে যা অন্যদের কাছে একেবারেই অর্থহীন। তাছাড়া অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা মহাজাগতিক বিষয় কতটুকু জানতে পারছি? 'আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার' কথা বললে আবার এটাকে আধিবিদ্যক শব্দ বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়। কিন্তু এই বাস্তবতা আমরা কেমন করে অস্বীকার করব? রাসেল স্বীকার করেন, 'বিজ্ঞান ও রহস্যবাদের সমন্বয়েই উৎকৃষ্ট দর্শন হতে পারে'।[৬৮] তাহলে যে রহস্যের সমাধান আমাদের কাছে নেই তা অস্বীকার করা কিছুতেই যুক্তিসংগত হবে বলে মনে হয় না। স্ট্রসনের আলোচনায় 'Descriptive Metaphysics' নামে অধিবিদ্যার একটি ব্যাখ্যা আসে যার মাধ্যমে তিনি বলার চেষ্টা করেন, এরিস্টটল হেগেলের অধিবিদ্যা অযৌক্তিক নয়। এভাবে ভাষা দর্শনের মধ্যেও আত্মসমালোচনা লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. http:// www.britannica.com/Herbert-spencer/2012
২. http:// www.iep.utm.edu/spencer/#H4.22/10/2014
৩. আমিনুল ইসলাম, *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২, পৃ. ১৪৫
৪. Morgan. C.L., *Emergent Evolution*, London: Williams and Norgaie, 1927, p.1
৫. *Ibid*, pp. 9-11
৬. *Ibid*, p.11
৭. *Ibid*, p.36
৮. *প্রাগুক্ত*, আমিনুল ইসলাম, ১৯৮২,পৃ. ২৭০
৯. মার্কস- এঙ্গেলস, *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার*, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০০২,পৃ.৩০
১০. হারুন রশীদ, *মার্কসীয় দর্শন*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ৩২
১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০
১২. *প্রাগুক্ত*, মার্কস- এঙ্গেলস,২০০২, পৃ.৯
১৩. www.peirce.org/ *How to Make Our Ideas Clear*
14. James,William, *Pragmatism: A New Name for an Old Way of Thinking* in www.gutenberg.org/ebooks/5116
১৫. *প্রাগুক্ত*, আমিনুল ইসলাম, ১৯৮২,পৃ. ২৩৯
১৬. www. plato.*Stanford.edu/Pragmatism.16/8/2008*
১৭. James, William, *Essays in Radical Empiricsm*, NewYork: Longmans, Green, and Co, 1912, p.42
18. James,William. *The Meaning Of Truth* in www.gutenberg.org/ebooks/5117
১৯. *প্রাগুক্ত*, আমিনুল ইসলাম, ১৯৮২, পৃ. ২৪২
২০. www.plato.stanford.edu/Existentialism.11/10/2010
২১. *প্রাগুক্ত*, আমিনুল ইসলাম, ১৯৮২, পৃ. ৩২৯-৩৫
২২. Roth, J.K & Sontag, F.(Ed.), *The Questions of Philosophy*, California: Wodsworth Publishing Company, 1988, pp. 410-13
২৩. *প্রাগুক্ত*, আমিনুল ইসলাম, ১৯৮২,পৃ. ৩৪৭-৪৮
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-২৮
২৫. জন স্টুয়ার্ট মিল, উপযোগবাদ (অনু. হাসনা বেগম), ঢাকা:বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮, পৃ. ২৯
২৬. http:// www.britannica.com/ **Bertrand Russell**
27. www.Plato.stanford.edu/ Bertrand Russell
২৮. বার্ট্রান্ড রাসেল, *বহির্জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান* (অনু. আব্দুল বারী), ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ২
২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭
30. Bertrand Russell, *Am I An Atheist Or An Agnostic?* 1947 in http://www.positiveatheism.org/hist/russell8.html
৩১. *Ibid*
৩২. Stephen Mumford (ed.), *Russell on Metaphysics*, London: Routledge,2003,p.57
33. http://www.positiveatheism.org/hist/russell2.htm
34. Why I Am Not A Christian,/http://www.users.drew.edu/~jlenz/whynot.html
৩৫. স্টিফেন ডব্লু.হকিং, *কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, (অনু.শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত),১৯৯৩, কলকাতা: বাউলমন প্রকাশন,পৃ.১৮০
৩৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮০
৩৭. এ.পি.জে আব্দুল কালাম,*(অগ্নিপক্ষ) উইংস অব ফায়ার*, (অনু. শেখ সেলিম) ঢাকা: তাজিন বই ঘর,২০০৩, পৃ. ৩১
৩৮. *প্রাগুক্ত*, স্টিফেন ডব্লু.হকিং, ১৯৯৩, পৃ. ১৮০
৩৯. *প্রাগুক্ত*, আমিনুল ইসলাম,১৯৮২,পৃ. ১৫৫-৫৬
৪০. *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৪
৪১. *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৪

৪২. **www.Plato.stanford.edu/** John McTaggart
43. *Ibid*
44. McTaggart,John, M.E. *The Nature of Existence,* Vol.1, Cambridge, 1921, p.1
৪৫. *Ibid*, P.66
৪৬. *Ibid*, P.38
47. Pringle Pattison, A.S., *The Idea Of God in The Light of Recent Philosophy,* (2nd Edition,) London: Oxford University press, 1920,p.435
48. Pringle Pattison, A.S., *The Idea of Immortality*,Oxford,1922,p.199
49. Ramsey I. A. N. (ed.), " On the Possibility and Purpose of a Metaphysical Theology " in *Prospect for Metaphysics*, London: George Allen & Unwin Ltd. *1961.p.153*
৫০. *Ibid*, p.153
৫১. *প্রাগুক্ত*, আমিনুল ইসলাম, ১৯৮২, পৃ. ৪২৫
52. Henri Bergson, *An introduction to metaphysics,*p.9 in http://archive.org/details/anintroductiont00berggoog
53. *Ibid*,p.65-75
৫৪. Henri Bergson, *Creative Evolution*,(tr.ArthurMitchell),London: Macmillan and Co.1922,p.92
৫৫. *প্রাগুক্ত*, আমিনুল ইসলাম, ১৯৮২, পৃ. ২২৬
56. Henri Bergson,1922 ,pp.93-94
57. Henri Bergson, *The Two Sources of Morality and Religion*, London: Macmillan and Co.1935,*pp.181-83.*
58. *Ibid*, pp.209-12.
59. www.plato.stanford.edu/ Josiah Royce
60. http://www.iep.utm.edu/roycejos
61. D.F. Pears, (ed.)*The Nature of Metaphysics*, London: Macmillan ,1957,pp.159-60.
62. *Ibid*,p.160
63. *Ibid*,p.41
64. *Ibid*,p.40
৬৫. *প্রাগুক্ত*, আমিনুল ইসলাম, ১৯৮২, পৃ. ৩৮৫
৬৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৯৩
৬৭. বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস [প্রাচীন ও ক্যাথলিক দর্শন: নির্বাচিত অংশ],* (অনু. প্রদীপ রায়), ঢাকা:নিউ এজ পাবলিকেশন,২০০০, পৃ. ২২৭
৬৮. বার্ট্রান্ড রাসেল, *রহস্যবাদ ও যুক্তিবিদ্যা এবং অন্যান্য প্রবন্ধ*, (অনু: আবু সাঈদ মিঞা) ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭, পৃ.১

Dhaka University Institutional Repository

৫ম অধ্যায়
উপসংহার

এতক্ষণের আলোচানায় আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি অধিবিদ্যা বর্তমান সময়েও তার প্রভাব অক্ষুণ্ন রেখেছে। আশা করি এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, সমকালীন যুগে অসংখ্য শক্তিশালী বিপরীত স্রোত থাকা সত্ত্বেও অধিবিদ্যা নিজস্ব হাল ধরে আপন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সামনের দিকে অগ্রসরমান। আমি শুরুতেই অধিবিদ্যার একটি পরিচয় তুলে ধরেছি। প্রকৃতপক্ষে অধিবিদ্যা দর্শনের অবিচ্ছেদ্য ও মৌলিক শাখা। প্রাচীন গ্রিক-আইওনিয়-মাইলেশিয় দার্শনিকগণ দর্শনের যে পরিচয় উপস্থাপন করেন তা বর্তমান সময়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এরিস্টটলের *অধিবিদ্যা* গ্রন্থে দেখা যায়, তখন দর্শন বলতে একটি বিজ্ঞানকে বোঝানো হত এবং এই বিজ্ঞানের মধ্যে সর্বোচ্চ বিজ্ঞান হিসেবে তিনি স্থান দিয়েছেন অধিবিদ্যাকে। অধিবিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন মৌল সত্তাকে। এই সত্তার সন্ধানেই তিনি কালোত্তীর্ণ ও অমূল্য গ্রন্থখানি (*অধিবিদ্যা*) রচনা করেন। অবশ্য তাঁর এই সত্তানুসন্ধানের কাজ দর্শনে প্রথম নয়। তিনি নিজেও তা স্বীকার করেছেন, পারমেনাইডিস ছিলেন এক অপরিবর্তনশীল সত্তার ধারণার প্রবর্তক। অপরিবর্তনশীল পরম সত্তাকে আরো খুঁজে পেয়েছেন পিথাগোরাস, হিরাক্লিটাস, এনাক্সাগোরাসসহ অনেকে যাঁরা বিভিন্ন নামে তা প্রকাশ করেন। সক্রেটিস যদিও নৈতিকতা ও জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনাকে অধিকতর গুরুত্ব দেন তথাপি ঈশ্বরকে তিনি অস্বীকার করেন নি। এরিস্টটলের গুরু প্লেটোর দর্শনে আধিবিদ্যক ধারণা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, প্রকৃতপক্ষে তাঁর অধিবিদ্যা এরিস্টটলের তত্ত্বের চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তবে এরিস্টটলই একটি সুসংবদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও পৃথক বিদ্যা হিসেবে অধিবিদ্যার উপস্থাপন করতে সক্ষম হন।

অধিবিদ্যার ভিত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য এরিস্টটল যুক্তিবিদ্যার বিরোধ নীতি ও মধ্যপদ বর্জন নীতির আশ্রয় নেন। তাঁর আলোচনায় কিছু স্ববিরোধ ও পুনরুক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি যুক্তি ও তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেন আদি কারণ হিসেবে এমন একটি কারণ থাকবে যার আর কোনো কারণ থাকবে না। এই আদি কারণের পরিচয় হিসেবে তিনি অচালিত চালক বা ঈশ্বরের ধারণা দেন। চার প্রকার কারণের মধ্যে ঈশ্বরকে তিনি আকারগত কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। আর ঈশ্বরের গুণ হিসেবে পরম শুভকে নিয়ে আসেন। তাঁর রচিত *Nicomachean Ethics, On the Soul* প্রভৃতি গ্রন্থে আত্মা প্রসঙ্গে আলোচনা আসে। তাঁর মতে, একমাত্র প্রজ্ঞাবান আত্মাই অমর ; জীবাত্মা ও কামনার আত্মা মরণশীল।

অধিবিদ্যার সাথে খ্রিষ্টীয় ধারণার সমন্বয়ের প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ করি সেন্ট অগাস্টিন, আনসেল্‌ম, একুইনাস প্রমুখের রচনায়। ধর্মের সাথে অধিবিদ্যার মিলনের এই প্রয়াস পাশ্চাত্যের ইহুদি ও মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

দার্শনিকদের মধ্যেও ছিল। আমি এখানে কেবল একুইনাসের অধিবিদ্যাকেই উপস্থাপন করেছি। একুইনাস অত্যন্ত মেধাবী ও অসাধারণ চিন্তা শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর দু'টি *summa* গ্রন্থসহ অন্যান্য গ্রন্থে দর্শন ও ধর্মকে এক সাথে উপস্থাপন করা হয়। *Summa Theologica* গ্রন্থে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে পাঁচটি যুক্তি দেন-গতির যুক্তি,কার্যকারণ, বিশ্বতাত্ত্বিক, নৈতিক ও উদ্দেশ্য বিষয়ক যুক্তি। *Contragentiles* গ্রন্থে সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল আলোচনার মাধ্যমে তিনি অখ্রিষ্টানদের খ্রিস্টধর্মের দিকে আহ্বান করেন। তাঁর এই আলোচনা ধর্মের উদ্দেশ্যে হলেও পদ্ধতি ছিল দার্শনিক। এজন্যই দর্শন ও অধিবিদ্যার ইতিহাসে তাঁর অবদান বিরাট। জ্ঞানীর পরিচয়, মর্যাদা, ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ, ঈশ্বরের গুণাবলিসহ ধর্মীয় অনেক বিষয় তিনি এখানে আলোচনা করেন। তাঁর মতে ঈশ্বর কেমন আমরা তা জানতে পারি না। তাই ঈশ্বর কী নয় তা জানার মাধ্যমে ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা ধারণা নিতে পারি। এরিস্টটলের অধিবিদ্যায় ঈশ্বর কেবল সার্বিক সম্পর্কে জানেন, বিশেষ জানেন না। কিন্তু একুইনাসের মত হলো, তিনি সার্বিক ও বিশেষ সব জানেন, যা এখানো সৃষ্টি হয় নি তাও তিনি জানেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা শক্তি সবচেয়ে বড় শক্তি। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন। তাঁর ইচ্ছার জন্য যুক্তি প্রয়োগ করা যায় কিন্তু কারণ দর্শানো যায় না। তবে তিনি অসম্ভব জিনিসের ইচ্ছা করেন না, যেমন আত্মা বিহীন মানুষ ইত্যাদি। *Contragentiles* গ্রন্থের শেষ অংশে ঈশ্বরের সৃষ্টি, ঐশ্বরিক আদেশ, আত্মার মুক্তি, নৈতিকতা, খ্রিষ্টীয় তত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা করেন।

এর পর আমি ব্রাডলির অধিবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ব্রাডলি বিংশ শতকের গোড়ার দিকে তাঁর মতবাদের পূর্ণ স্বীকৃতি পান, যদিও উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই তাঁর আধিবিদ্যক আলোচনার বিস্তার ঘটে। তিনি ছিলেন হেগেলপন্থী ভাববাদী দার্শনিক। হেগেলের দর্শন উনিশ শতকের ভাববাদী দার্শনিকদের প্রবলভাবে আলোড়িত করে। হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে আদি thesis ছিল পরম ধারণা বা পরম সত্তা। এই পরম সত্তা সব কিছুর মূল ভিত্তি। তাঁর মাধ্যমেই জগতের সৃষ্টি ও তিনি জগতেই মিশে আছেন। হেগেলের এসব আধিবিদ্যক আলোচনা বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মান তথা ইউরোপ ও আমেরিকার ভাববাদী দার্শনিকদের এখনো প্রেরণা যুগিয়ে আসছে। হেগেলের মতকে ব্রিটেনে নিজের মতের আলোকে উপস্থাপন করেন ব্রাডলি।

ব্রাডলি সব কিছুকে অবভাস বলে ব্যাখ্যা করেন। এই অবভাসের পেছনেই রয়েছে পরম বাস্তবসত্তা (Absolute Reality)। তাঁর দর্শন মূলত সম্বন্ধের দর্শন। তাঁর মতে, মুখ্য ও গৌনগুণ, দেশ-কাল, আত্মা, কার্যকারণ ইত্যাদি সবই সম্বন্ধযুক্ত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির ব্যাখ্যা করা যায় না তাই এগুলোর স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। আর একারণেই এগুলো বাস্তব নয় বরং বাস্তবের প্রতিচ্ছবি। তবে

Dhaka University Institutional Repository

সব কিছুকে অবাস্তব বললেও আমরা এগুলোকে অস্বীকার করতে পারি না। বরং বাস্তবসত্তার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যেই এগুলো স্বীকার করতে হবে। কারণ কোনো অবভাস মানেই এর পেছনে অনিবার্য বাস্তবসত্তা বিদ্যমান। তাঁর এই পরম বাস্তবসত্তা সব সম্বন্ধের উর্ধ্বে, এমনকি ঈশ্বরকেও তিনি বাস্তবসত্তার অবভাস বলেন। তবে তিনি অন্যসব অবভাসের মত নন। ব্রাডলির সাথে হেগেলের পার্থক্য হলো, বাস্তব সত্তাকে হেগেল আধ্যাত্মিক বলেছেন আর তিনি বলেছেন অভিজ্ঞতালব্ধ।

অধিবিদ্যার পক্ষে বর্তমান সময়কার আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এইচ ডি লিউইস। বৃটিশ দর্শনের ইতিহাসে তাঁর অবদান বিরাট। তিনি জড়বাদ ও বাস্তববাদীদের বিপক্ষে জোরালো যুক্তি দেন। সমকালীন অধিবিদ্যা বিরোধী ধারা-বিশ্লেষণী দর্শন, ভাষাতাত্ত্বিক দর্শন, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ, অস্তিত্ববাদ প্রভৃতির সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করে তিনি প্রমাণ করেন এসব চিন্তা এক ধরনের ভাবাবেগের উপর নির্মিত। রাসেল ভাববাদ বিসর্জন দিয়ে বাস্তববাদ গ্রহণ করেন ধর্ম ও অধিবিদ্যার সমালোচনার মাধ্যমে, অন্যদিকে লিউইস দর্শনের মাধ্যমে ভাববাদে আগমন করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রচলিত তত্ত্ববিষয়ক, বিশ্বতাত্ত্বিক ও নৈতিক যুক্তিসমূহ তিনি গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করে বলেন, এগুলোর ক্রটি থাকলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিজ্ঞতাপূর্ব ও সহজাত ধারণার যুক্তি দেন তিনি পক্ষীকুলের বাসা নির্মাণ, বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদির মাধ্যমে। তাঁর অধিবিদ্যা মূলত আধুনিক অধিবিদ্যার নতুন রূপ। তিনি স্বজ্ঞাকে ঈশ্বর অনুসন্ধানের পক্ষে বড় হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করেন।

চারজন বিশিষ্ট অধিবিদের অবদান আলেচনার পর আমি যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের সমালোচনাসহ একটি বিবরণ তুলে ধরেছি। আমার এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের অবস্থান বিচার। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে এক চরমপন্থা। তাঁরা প্রতিপাদন নীতির মাধ্যমে অধিবিদ্যাকে বর্জনের ঘোষণা দেন। অভিজ্ঞতায় যা প্রমাণ করা যায় না তা তাঁরা মানতে না-রাজ। যেহেতু ঈশ্বর, নৈতিকতা অধিবিদ্যা ও ধর্ম সম্পর্কিত বচনগুলো তাঁদের পরখনীতির মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পারে না তাই এগুলো অর্থহীন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের এই মতের আত্মসমালোচনা তাঁরা নিজেরাও করেছেন। এই মতের আবির্ভাবের পর থেকেই এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন আপত্তি শুরু হয়। এসব আপত্তির মধ্যে কিছু আবেগ-নির্ভর, কিছু যুক্তি-নির্ভর। আমি যুক্তি-নির্ভর কিছু সমালোচনা এখানে উপস্থাপন করেছি। প্রত্যক্ষবাদ অধিবিদ্যার বিপক্ষে যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল সেই চেতনা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। তবে জড়বাদী, অভিজ্ঞতাবাদী এবং অধিবিদ্যা-বিরোধীদের জন্য তা প্রেরণা সৃষ্টি করে আসছে। ঈশ্বরকে যাঁরা অস্বীকার করেন কিংবা যাঁরা বিশ্বজগতের আদিকারণ রূপে কোনো কিছু মানতে না-রাজ তাঁরা প্রত্যক্ষবাদের ত্রুটি সংশোধান করে জড়বাদকে বিকশিত করার চেষ্টাও অব্যাহত রাখেন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ে আমি সমকালীন অধিবিদ্যা-বিরোধী ধারাগুলোর আলোচনার সাথে সাথে অধিবিদ্যার পক্ষাবলম্বনকারীদের মন্তব্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। বিবর্তনবাদ থেকে শুরু করে অস্তিত্ববাদ পর্যন্ত বিভিন্ন ধারা অধিবিদ্যার কঠোর সমালোচনা করে। হার্বার্ট স্পেনসার বিবর্তনবাদকে দর্শনে নিয়ে আসেন এবং এর জড়বাদী ব্যাখ্যা দেন। তাঁর এই চিন্তা প্রয়োগবাদী ও বাস্তববাদী দর্শনকে এমনকি রাসেলের মত দার্শনিককেও প্রভাবিত করে। রাসেলেরর মতে, "বানর থেকে মানুষের জন্ম বলায় মানুষের অহমিকায় হয়ত আঘাত লেগেছে, কিন্তু মানুষ যে ক্রমবিবর্তনের ফল তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই।"[১] বিবর্তনবাদের আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা এসেছে লয়েড মর্গান ও আলেকজান্ডারের উন্মেষমূলক ও হেনরি বার্গসোঁর সৃজনমূলক বিবর্তনবাদে। তাঁরা বিবর্তন প্রক্রিয়ার পেছনে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও একজন কর্তার অনিবার্যতা ব্যাখ্যা করেন। অস্তিত্ববাদেরও আমরা দু'টি ধারা দেখেছি, একটি আধিবিদ্যক আরেকটি অধিবিদ্যা বিরোধী। সাঁত্রে, নীটশে, হাইদেগার ছিলেন জড়বাদী আর কিয়েরকেগার্ড, জেসপার্স, মার্সেল ছিলেন ভাববাদী এবং অধিবিদ্যার সমর্থক। প্রয়োগবাদেও দুটি ধারা, একটি ঈশ্বরকে নিয়ে আরেকটি ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে। তবে ঈশ্বরকে তারা আধিবিদ্যক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে বরং বাস্তব প্রয়োজনে স্বীকার করেন। এজন্য ঈশ্বরকে তারা অসীম না ভেবে সসীম রূপে কল্পনা করেন। তবে সমকালীন ভাবধারায় অধিবিদ্যা বিরোধী আরেকটি শক্তিশালী ধারা আ মার্কসবাদ। মার্কসবাদ যদিও একটি রাজনৈতিক ও সমাজ দর্শন, তথাপি মার্কসের দার্শনিক চিন্তাধারায় অধিবিদ্যাকে প্রতিপক্ষরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। ধর্মকে তাঁরা বলেন এক ধরনের মোহাচ্ছন্নতা, যা আফিম জাতীয় নেশাদ্রব্য সেবনে ব্যবহারকারীর মধ্যে লক্ষ করা যায়। অধিবিদ্যা ও নৈতিকতা বিষয়েও তাঁদের মন্তব্য অনুরূপ। এই ধরনের বক্তব্য অধিবিদগণ সমর্থন করেন নি।

নৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় আধিবিদ্যক নৈতিকতার বিপরীতে এক ধরনের প্রায়োগিক নীতিবিদ্যাার সূচনা ঘটে। এর প্রকাশ ঘটেছে প্রয়োগবাদ, উপযোগবাদ, ব্যাবহারিক নীতিবিদ্যা প্রভৃতিতে। এখানে বলা হয়েছে নৈতিকতার সুনির্দিষ্ট কোনো আদর্শ থাকতে পারে না। মানুষের সুখের জন্য, আনন্দের জন্য যা প্রয়োজন তাই শুভ আর যা মানুষকে কষ্ট দেয় তাই অশুভ। এই জন্য মিথ্যা বলা বা সত্য বর্জনে সমস্যা নেই, যৌন জীবনের জন্যেও সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম প্রয়োজন নেই ইত্যাদি।

সমকালীন দর্শনের ইতিহাসে বার্ট্রান্ড রাসেল নামটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নিজেই একটা দর্শন। ৯৮ বছরের দীর্ঘ জীবনে তিনি প্রথম দিকে হেগেল, ম্যাকটেগার্টকে অনুসরণ করলেও পরবর্তীতে হিউমের আদর্শ গ্রহণ করেন। তিনি বিজ্ঞান ও গণিত এবং যৌক্তিক পরমাণুবাদকে কেন্দ্র করে তাঁর আলোচনা করেন। বিজ্ঞানের মানদণ্ডে তিনি ধর্ম, অধিবিদ্যা, ঈশ্বর ও নৈতিকতার যাচাই করেন এবং

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞতাবাদীদের অনুসরণ করে তিনি সিদ্ধান্ত নেন, যেহেতু অভিজ্ঞতায় এগুলো প্রমাণিত নয়, তাই এগুলো সংশয়মূলক। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদকে তিনি অন্ধভাবে সমর্থন করেন নি, কিন্তু প্রত্যক্ষবাদীগণ তাঁর রচনাতেই বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছেন। নব্য বাস্তববাদের প্রধান সমর্থক মূরের দ্বারা রাসেল বেশি প্রভাবিত হন।

এতদসত্ত্বেও অধিবিদ্যার পক্ষে সমকালীন ধারাটি কম শক্তিশালী নয়। হেগেলকে অনুসরণ করে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে ভাববাদের যে বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায় তা অধিবিদ্যার পক্ষে অত্যন্ত জোরালো ভূমিকা রাখে। উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতকের শুরু থেকেই বৃটিশ ভাববাদী ছিল গ্রিন, ব্রাডলি, বোসাংকে, ম্যাকটেগার্ট, প্রিঙ্গল প্যাটিসন, ফ্রান্সের বার্গসোঁ, ইতালির ক্রোচে, আমেরিকার রয়েস, বাউন প্রমুখ অধিবিদ্যার পক্ষে যে ভূমিকা রাখেন তা জড়বাদীদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল। এছাড়া পরবর্তীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সি.ই.এম. জোয়াড, ম্যাক ইন্টায়ার, এইচ.ডি. লিউইস, পিটার ভ্যান ইনওয়াগান প্রমুখ বর্তমান সময় পর্যন্ত অধিবিদ্যার পক্ষে লিখে যান। এই ছিল পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সার। আমি এখন বিষয়টির আরো একটু পর্যালোচনা করতে চাই।

অধিবিদ্যার অন্যতম প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য এর জ্ঞান অভিজ্ঞতা-পূর্ব। আর এটাই সমালোচকদের প্রধান আপত্তির বস্তু। অধিবিদ্যা পরম সত্তা, আত্মার অমরতা, ইচ্ছার স্বাধীনতা, দেশ-কালের রহস্য, নৈতিকতা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে। এসব বিষয়ের জ্ঞান পেতে অভিজ্ঞতার আশ্রয় সম্ভব নয়। আত্মা কি অমর না মরনশীল তা অভিজ্ঞতায় যাচাই করা আদৌ সম্ভব নয়। এই ধরনের বিষয়গুলো আমরা ইন্দ্রিয়-নির্ভর বিষয়ের মত উপলব্ধি করতে পারি না বলেই এত আপত্তি। কিন্তু এটাও তো বাস্তব আমরা অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান সব সময় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাই না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আমরা অভিজ্ঞতার জগতের বাইরে প্রায়শ আসা যাওয়া করি। আমরা বাজরে কেনা কাটা করতে গেলে কোনো জিনিস ব্যবহারের অভিজ্ঞতার আগেই সেটি কিনে ফেলি এবং পরবর্তীতে কখনো কখনো তা খারাপ হিসেবেও প্রমাণিত হয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের ভিত্তি থাকে বিশ্বাস ও আশা। এটাও এক ধরনের অভিজ্ঞতা-পূর্ব কাজ। কেউ ঋণ চাইলে ঋণ দিয়ে থাকি-সেটাও বিশ্বাসের কারণে। এর পরিধিকে আরো বিস্তৃত করলে আমরা অধিবিদ্যাকেও অভিজ্ঞতা-পূর্ব বচনের মাধ্যমে বাস্তব প্রয়োজনে মেনে নিতে পারি। রাসেল কারণ তত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আগামী কাল সূর্য উঠবে কী কারণে আমরা বিশ্বাস করব? অতীতের মত আগামী কালও ঘটবে তার নিশ্চিত কোনো জ্ঞান আমাদের কাছে নেই। অত্যন্ত জটিল ব্যাখ্যার পর অবশেষে তিনি কার্যকারণ নীতি স্বীকার করলেন এবং এভাবে একটি অভিজ্ঞতা পূর্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন।[২] প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্বাভাবিক জীবন

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞতাপূর্ব বিষয়কে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করে থাকি। আধিবিদ্যক প্রশ্নের ক্ষেত্রেও তা সমস্যার কারণ হতে পারে না।

অভিজ্ঞতাবাদী এবং অধিবিদ্যা বিরোধীদের সবচেয়ে বড় প্রেরণা ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) তাঁর *Dialogues Cocerning Natural Religion* গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রচলিত যুক্তিগুলোকে তিনি খণ্ডন করেন। তাঁর মতে, ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা যত কথা বলি, তা সব জগৎ কেন্দ্রিক। জগৎ যেহেতু সীমিত সুতরাং ঈশ্বরও সসীম। আবার যেহেতু জগৎ অসংখ্য অপূর্ণতায় ভরপুর তাই ঈশ্বরও অপূর্ণ। এভাবে সর্বশক্তিমান, পূর্ণতম ঈশ্বরের ধারণা তিনি নাকচ করেন। কিন্তু হিউম বিশ্বজগতের শৃঙ্খলার পেছনে একজন বুদ্ধিমান সত্তাকে (intellegent being) অস্বীকার করতে পারেন নি। তাঁর এই সংলাপে ফিলো ছিলেন হিউমের মুখপাত্র, ক্লিনথিস Design argument উপস্থাপন করেন আর ডেমিয়া ও পামফিলাস ছিলেন ধর্মভীরু অংশগ্রহণকারী। হিউম পামফিলাসের কথার মাধ্যমে সংলাপ শেষ করেন এভাবে,

> *আমি ফিলোর নীতিকে ডেমিয়ার নীতির চেয়ে বেশি সম্ভাব্য বলে মনে না করে পারি না, কিন্তু সব কিছুর উপরে ক্লিনথিসের দৃষ্টিভঙ্গি সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী।*[৩]

এখানে তিনি ফিলোর অভিজ্ঞতাবাদী বক্তব্যকে ধার্মিক ডেমিয়ার কথার চেয়ে কম গ্রহণযোগ্য বলে বোঝাতে চেয়েছেন আর যে যুক্তি খণ্ডনে এত বিশদ আলোচনা সেই যুক্তিটিকেই আবার ঘোষণা দিলেন সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী বলে। কেন তিনি নিজ মুখপাত্র ফিলোর মাধ্যমে কথা শেষ না করে ধার্মিক পামফিলাসের মাধ্যমে শেষ কথাটি উপস্থাপন করলেন-এটা একটা প্রশ্ন। কিন্তু এটাই ছিল সংলাপের শেষ কথা। এ কথার মাধ্যমে তিনি মূলত যে কারণেই হোক "Design argument" কে সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী বলে উল্লেখ করেন। এর কারণ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে এখনো বিতর্ক চলছে।[৪] হিউমের এই বক্তব্য অধিবিদ্যার পক্ষে চলে আসলেও অধিবিদ্যা বিরোধীগণ হিউমকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসরণ করেন।

অধিবিদ্যার ইতিহাসে কান্টের নামটিও গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারে তত্ত্ববিষয়ক, বিশ্বতাত্ত্বিক ও উদ্দেশ্য বিষয়ক যুক্তি খণ্ডন করে তিনি বলেন, মানুষের প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাঁর মতে, ঈশ্বরের ধারণা থেকে ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যায় না, যুক্তিবিদ্যার কার্যকারণ নীতি আমাদের অভিজ্ঞতার জগতের জন্য। অতীন্দ্রিয় জগতে কার্যকারণ নিয়ম আছে কি না আমরা জানি না সুতরাং আদিকারণের যুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে অযৌক্তিক। উদ্দেশ্য বিষয়ক যুক্তিতে বুদ্ধিমান

Dhaka University Institutional Repository

সত্তার কথা বলা হলেও এই বিষয়ে আদিকারণের দ্বারস্থ হতে হয়। সুতরাং তাঁর মতে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ সম্ভব নয়। তাঁর এই যুক্তি অধিবিদ্যা বিরোধীদের উৎসাহিত করে। এই জন্য কান্ট এক সময় অজ্ঞেয়বাদকে প্রাধান্য দিতে শুরু করেন। কিন্তু পরে তিনি দেখলেন, যদি ঈশ্বরের, অমরতার ধারণাকে ব্যবহারিক জীবন থেকে বাদ দেওয়া হয় তাহলে নৈতিকতার ধারণা শূন্য হয়ে পড়ে। তাই তিনি নৈতিকতার প্রয়োজনে ঈশ্বরকে আবার মেনে নিলেন।

বর্তমান সময়ের নব্য বাস্তববাদ, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ, ভাষাদর্শন প্রভৃতি বিশ্লেষণী দর্শনের শাখা প্রশাখা। এই ধারণাগুলো অধিবিদ্যাকে দর্শন থেকে বের করে দিতে চেয়েছে। এডওয়ার্ড ম্যুর, রাসেল, ফ্রেগে প্রমুখের মাধ্যমে বিশ্লেষণী দর্শনের বিকাশ ঘটে। তাঁরা মূলত ভাষা বিশ্লেষণকেই দর্শনের প্রধান কাজ হিসেবে নির্ধারণ করেন। রাসেলের ভাষায়, "একজন ক্যাথলিক একুইনাসের যুক্তিকে বৈধ মনে না করলেও ঈশ্বরে বিশ্বাস ত্যাগ করবেন না। এমন কি কোনো যুক্তি না থাকলেও তিনি প্রত্যাদেশের উপর নির্ভর করবেন।"[৫] বিজ্ঞানের কথাই তাঁরা সবচেয়ে বেশি বলেন। কিন্তু বিজ্ঞানের কাজ তো বিশ্বাস নয়, এখানে কাজ তথ্য প্রমাণের এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ঈশ্বরের পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি প্রদান সংক্রান্ত কোনো অধ্যায় নেই এবং ভবিষ্যতেও হবে না, হলে তা অবশ্য দর্শনে পরিণত হবে, বিজ্ঞান থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের সাথে অধিবিদ্যার কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। এমনকি নিউটন ও বয়েল যখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করলেন তাঁরা তখন একে "ঐশ্বরিক বিধি" বলে আখ্যা দেন।[৬]কোপার্নিকাসের পৃথিবী সংক্রান্ত মতবাদের পর ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এর একটা সমাধান হয়েছে। তবে ডারউইনের বিবর্তনবাদ এবং ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব অধিবিদ্যা ও ধর্মের উপর চরম আঘাত হানে। এসব মতবাদ প্রমাণিত সত্য হিসেবে এখনো স্বীকৃত হয় নি, যেমনটি মাধ্যাকর্ষণ,গতি, পরমাণু সংক্রান্ত সূত্র স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং আনুমানিক প্রকল্পকে চূড়ান্ত সত্য বলাটা যুক্তির পথ হতে পারে না।

নীটশে ঈশ্বরকে হত্যা করেন। ঈশ্বরকে হত্যার মানেই হলো ঈশ্বর এক সময় ছিলেন। যদি থেকেই থাকেন তাহলে কেন ছিলেন? আবার বর্তমানে কোন হাতিয়ার দিয়ে নীটশে তাকে হত্যা করেন? যদি যুক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরকে হত্যা করা যায় তাহলে যুক্তির মাধ্যমে তাকে প্রতিষ্ঠা করা কঠিন কাজ নয়। ১৮৮৯ সাল থেকে ১৯০০ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। যাঁরা অধিবিদদেরকে মানসিক খিঁচুনি (mental cramp) রোগে আক্রান্ত বলে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন তাঁদের মন্তব্যের যুক্তিসঙ্গত জবাব দেওয়া আমাদের জন্য কঠিন।

Dhaka University Institutional Repository

সাঁত্রে বলেন, "ঈশ্বর যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করেন, তখন তিনি স্বাভাবিক ভাবেই জানেন তিনি কী সৃষ্টি করছেন। একজন কারিগরের কাগজ কাটা চাকু তৈরির প্রক্রিয়ার মত।"[৭] অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা নন, বড়জোর একজন কারিগর। এর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেতে চেয়েছেন ঈশ্বর নয় বরং মানুষের অস্তিত্বই সবার আগে। ঈশ্বর অস্তিত্ববান না হলে একটি সত্তার অস্তিত্ব সাধারণ সত্তার পূর্বেই বিদ্যমান- সেটা মানুষ বা হাইদেগারের মতে 'মানবিক সত্তা'।[৮] মূলত ঈশ্বরকে একজন মামুলি কারিগর বা মিস্ত্রীর সাথে তুলনা করে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আদিকারণ বা পরম সত্তার অস্তিত্বকে তাঁরা অস্বীকার করেন। তাঁদের বক্তব্যে বোঝা যায়, মানুষের অস্তিত্বের আগে কিছুই নেই। ঈশ্বর নামক কেউ যদি মানুষ সৃষ্টি করেই থাকেন তা বড় জোর একজন কারিগর বা মিস্ত্রীর মত যারা বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা ইত্যাদি তৈরি করেন। এ ধরনের সসীম ঈশ্বরের আগেই মানবসত্তার আবির্ভাব, যার অনুরূপ কপিই কেবল তিনি তৈরি করেন। তাঁরা অত্যন্ত জোর দিয়েই নিজেদেরকে নাস্তিক্যবাদী অস্তিত্ববাদের সমর্থক দাবি করেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, একজন মানুষ নির্মাণের জন্য মামুলি হলেও যদি একজন কারিগরের প্রয়োজন হয়, তাহলে মহাবিশ্বের ও মহাকালের নির্মাণের ব্যাপারে কেন তাঁদের মনে কোনো প্রশ্ন জাগে না? তাছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য জীব-জন্তু কীভাবে তৈরি হল সেটাওতো একটি বিষয়। এভাবে যদি আরোহমূলক দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা বলি এসব কিছু একজন বুদ্ধিমান কারিগরের উপস্থিতি প্রমাণ করে তাহলে তা যুক্তি-বিরোধী হতে পারে না।

দেরিদার বিনির্মাণবাদ (Deconstruction) ছিল অধিবিদ্যার বিপক্ষের উত্তর-আধুনিক মতবাদ। উত্তর-আধুনিকতা অধিবিদ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে। উত্তর-আধুনিকতার অন্যতম প্রধান সমর্থক দেরিদা Postmodernism এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, "এটা পাশ্চাত্যের আধিবিদ্যক ধারণার বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ। কারণ অধিবিদ্যা অযৌক্তিক ও কুসংস্কারমূলক।"[৯] উত্তর-আধুনিকতা সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করে এবং পুঁজিবাদের বিরোধিতা করে; সমাজতন্ত্রে তাত্ত্বিক চিন্তার অবকাশ কম। আধুনিকতার হতাশা থেকেই উত্তর-আধুনিকতার উদ্ভব, বিশ্বকে একটা নতুন কিছু দেওয়ার জন্য। কিন্তু এর অনুসারীগণ এ ক্ষেত্রে অধিবিদ্যাকে প্রতিপক্ষের কাতারে স্থাপন করেন, যা আমরা দেরিদার বক্তব্যে লক্ষ করেছি। দেরিদা ভাষা দার্শনিকদের মত ভাষা চিহ্নের গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে, "সত্তার ব্যাখ্যা ভাষার দুর্বোধ্যতা ছাড়া কিছু নয়।"[১০] প্রকৃতপক্ষে তাঁরা যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী মত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। দেরিদার কাছে তা কুসংস্কারমূলক হলেও অনেক জ্ঞানী-দার্শনিকের দৃষ্টিতে তা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। প্রয়োগবাদের প্রধান সমর্থক উইলিয়াম জেমস বলেন, ঈশ্বর যদি থেকেও থাকেন তাহলে তিনি আমাদের মতই সসীম, তবে তার ক্ষমতা কিছুটা বেশি। কারণ ঈশ্বর যদি সর্বজান্তা হন তাহলে আমরা তার হাতের পুতুল হয়ে পড়ি।[১১] অর্থাৎ,আমি আগামী কাল কী করব তা যদি ঈশ্বর সত্যিই জানেন তাহলে আমার

Dhaka University Institutional Repository

অন্যায় কাজ করতে কোনো দোষ নেই। এই যুক্তি একজন সাধারণ মানুষের মুখে শোনা যায়। মানুষকে ঈশ্বর ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন। যে অন্যায় করে সে চাইলে ভালহয়ে যেতে পারে। তাকে ঈশ্বর ধরে রাখবেন না যে, তাকে অন্যায় করতেই হবে। ঈশ্বরের জানার অর্থ হলো তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। যে কেউ তার সীমার মধ্যে থেকে ইচ্ছামত কাজ করতে পারে। সীমা অতিক্রম করলে তাকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন।

আধুনিক ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার প্রবর্তক পিটার সিঙ্গারের মতে, ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে নৈতিকভাবে উত্তম জীবন যাপন করা সম্ভব। তিনি বলেন, সামগ্রিক ভাবে জীবনের কোনো অর্থ নেই। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মতবাদ অনুসারে জীবনের শুরু হয়েছিল হঠাৎ করে নানা প্রকার গ্যাসের সংমিশ্রণে। পরবর্তীতে উদ্দেশ্যহীন পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জীবন বিবর্তিত হয়েছে।[১২] এই বক্তব্যের পেছনে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই এবং এ সম্পর্কে কোনো বিজ্ঞানই চূড়ান্ত কিছু দাবি করে না। দাবি করলেও সেটার অভিজ্ঞতামূলক পরীক্ষণ সম্ভব নয়। অন্যদিকে অধিবিদ্যা অনুযায়ী জীবনের সূচনা,গ্যাসের সংমিশ্রন ইত্যাদি ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটে যাওয়ার জিনিস নয়। এর পেছনে অবশ্যই একটি আদিকারণের প্রয়োজন আছে যেখান থেকে সুশৃংখল ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় জীবনের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। তিনি আরো বলেন,"কেন নৈতিকভাবে আমরা কাজ করব?- প্রশ্নটির এমন কোনো উত্তর দেওয়া যায় না যা সকলকে নৈতিকভাবে কাজ করার জন্য প্রেরণাদায়ক যুক্তি প্রদান করবে।"[১৩] অর্থাৎ আমরা কেন নৈতিকভাবে কাজ করব তার কোনো সদুত্তর আমরা জানি না। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে মানুষের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন এবং পারস্পরিক দায়িত্বের কথা বর্ণনা করেছেন যা প্রশংসনীয়। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন নি এই গ্যাসীয় পদার্থগুলো কোনো এক নির্মাতা ছাড়া এমনিতেই অস্তিত্বশীল হতে পারে না।

বর্তমান সময়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আধিবিদ্যক প্রশ্ন হলো দেহ ও মনের সম্পর্ক নিয়ে। প্রশ্নটির সাথে আত্মার অমরতার ধারণাটিও যুক্ত। আমি এইচ ডি লিউইসের অধিবিদ্যার আলোচনার সময় এ প্রসঙ্গে কিছুটা বলেছি। সমকালীন জড়বাদী বা অধিবিদ্যাবিরেধী খ্যাতিমান দার্শনিক গিলবার্ট রাইল তাঁর *The Concept of Mind* গ্রন্থে মনকে দেহ থেকে পৃথক না করে বরং দেহেরই ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর এই মত মেনে নিলে আত্মার অমরতার ধারণাটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। ডেভিড হিউম মানুষের আত্মাকে বলেছেন সংবেদনের সমষ্টি, অর্থাৎ এর পৃথকীকরণ অসম্ভব। কিন্তু মানসিক প্রক্রিয়াগুলোকে জড়বস্তুর মত এক জায়গায় জড় করা সম্ভব নয়। একজন ব্যক্তির সুখ-দু:খ,হাসি কান্না সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা,সচেতনতা অন্য আরেকজন ব্যক্তির মত সব সময় একই ভাবে থাকতে পারে না। দু'জন মানুষের দেহ একই রকম দেখা গেলেও দু'জন মানুষের মানসিক কাজ সম্পূর্ণ ভিন্নতর হতে

পারে। তাহলে মন বা আত্মাকে দেহ থেকে পৃথক না ভেবে কী উপায় আছে? রাইলের মতে,"আমরা যাকে আত্মজ্ঞান বলি,তা কোনো অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়। আমাদের নিজেদের কথা শোনা এবং নিজেদের আচরণ প্রত্যক্ষ করা থেকেই এর উৎপত্তি।"[১৪] অর্থাৎ, আমাদের মানসিক কাজগুলো দৈহিক কাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। ড. আমিনুল ইসলামের মতে, রাইলের এই গোটা ধারণাটি একটি উদ্ভট ধারণা। রাইল ও তাঁর সমমনা দার্শনিকগণ দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন।[১৫]

প্রকৃতপক্ষে অমরতার ধারণাটি অধিবিদ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক প্রশ্ন। মানুষ তার মনের কারণেই স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অধিকারী। তাই বলে সে যেকোনো সময় যেকোনো কাজের ইচ্ছা করতে পারে না, তাকে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিবিধ নিয়ম মেনে চলতে হয় এবং সেভাবেই তার স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিকে প্রয়োগ করতে হয়। মনের চেতনাটি আমাদের ইচ্ছা,অনুভূতি প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এখন মনকেই যদি অস্বীকার করা হয় অথবা জড়বস্তু বা দেহের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা হয়, তাহলে মানসিক কাজের মূল্যায়ন অর্থহীন হয়ে পড়ে। সহজ কথায়, অমরতার চিন্তাই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি করে আর আধিবিদ্যক দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই তাকে অন্যান্য প্রাণির উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে।

মানুষের উৎপত্তি বানর থেকে হয়েছে এর পক্ষে কোনো সুস্পষ্ট ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক প্রমাণ ডারউইন বা বিবর্তনবাদীগণ উপস্থাপন করতে পারেন নি। এটা তাঁদের অনুমান। এমনকি যারা বিবর্তনবাদের অনুসারী দার্শনিক তাঁরাও এমন নিশ্চিত কিছু দাবি করেন নি। অন্যদিকে অধিবিদগণ উদ্দেশ্যহীন ও পরিকল্পনা বিহীন বিবর্তনের বিপক্ষে যুক্তি দেন। কারণ সৃষ্টিজগতের মধ্যে যে সুনিপুন শৃঙ্খলা বিদ্যমান তাতে পরিকল্পনাবিহীন মানুষের চিন্তা করা স্বাভাবিক মনে হয় না। যেভাবেই হোক, মানুষের জন্ম পৃথিবীতে হয়েছে এবং অন্য সব প্রাণি থেকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সবাই নিঃসন্দেহে স্বীকার করেন। কীভাবে হয়েছে তাতে কারো সন্দেহ থাকলেও মানুষ যে শ্রেষ্ঠ জীব, অন্তত (বিবর্তিত রূপে হলেও) এতে কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের ধারণা এলো কী করে? বার্ট্রান্ড রাসেল এ ক্ষেত্রে বলেন, ভয় থেকে।[১৬] হার্বার্ট স্পেনসার বলেন, মৃত ব্যক্তির স্মরণ থেকে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বললে, ঈশ্বর আছেন কি নেই তাতে চাক্ষুষ কোনো প্রমাণ কারো কাছে নেই। কিন্তু ভয়ের সময় আমরা এক অতি প্রাকৃতিক শক্তিকে মনের অজান্তে স্মরণ করতে থাকি। রাসেল ভয়ের কথা স্বীকার করেন। এটা ছিল তাঁর একটি ধারণা বা বিশ্বাস। তা ছাড়া মৃত মা বাবা স্বজনদের ব্যাপারে প্রায় সবাইকেই এক অদৃশ্য ভয় বেষ্টন করে রাখে, না জানি তাদের আত্মা কেমন আছে। সুতরাং এখানেও ভয়ের প্রসঙ্গটা চলে আসে। এভাবে সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলেও স্বীকার করতে হয়, ঈশ্বরের

Dhaka University Institutional Repository

ধারণা যেভাবেই হোক মানুষের মনে স্থান করে নেয় এবং তা পরবর্তীতে স্থায়ী ধারণায় রূপ নেয়। মানুষ তখন বিচার করতে শুরু করে একজন অধীশ্বর যদি নাই থাকেন তাহলে কীভাবে সব কিছু সুশৃঙ্খল ভাবে চলছে? সুতরাং ঈশ্বরের ধারণার প্রয়োজন রয়েছে।

ঈশ্বরের ধারণা নৈতিকতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অধিবিদ্যার গুরুত্ব এখানে সবচেয়ে বেশি। নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করার জন্য সমস্ত বস্তুতান্ত্রিক উপায় ফলপ্রসু হবে না। কোনো লোভনীয় জিনিস থেকে মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে খুব কম, হয়ত কিছু সময়ের জন্য। এর প্রমাণ বিভিন্ন চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিশ্বে অপরাধপ্রবনতা ক্রমহেই বেড়ে চলছে। কিন্তু কেন? জ্ঞান-বিজ্ঞানের অত্যুন্নতি,নতুন নতুন মতবাদের বিকাশ এমনকি নতুন নৈতিক মতবাদের উদ্ভাবনও ঘটছে প্রচুর, কিন্তু অপরাধ থামানো যাচ্ছে না। এর মৌলিক কারণ, মৃত্যুকেই শেষ মনে করা, আত্মা বা মনের ধারণাকে বিসর্জন দেওয়া; সহজ কথায় বললে, আধিবিদ্যক জ্ঞানের উপর অনাস্থা ও অবিশ্বাস। যদি সে মহাবিশ্বের অধীশ্বর পরম বাস্তব সত্তার কাছে জবাবদিহিতার চিন্তা করে তাহলে সে নৈতিকতার দিক থেকে চূড়ান্ত ভাবে সফল হতে পারবে । যদি আত্মার অমরতায় বিশ্বাস রাখে তাহলে সে সবচেয়ে বেশি সংযমী হতে পারবে। কারণ সে বিশ্বাস করবে, অপরাধ করলে পার্থিব শাস্তির পরও তার শাস্তি শেষ হবে না। সুতরাং সে অধিকতর দায়িত্বশীল ও সচেতন হতে সক্ষম হবে। বর্তমান পৃথিবীর এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন নৈতিকতার অনুভূতি জাগ্রত করা। তা সম্ভব বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়, কিন্তু সবচেয়ে উত্তম প্রক্রিয়া হচ্ছে আধিবিদ্যক জ্ঞান ও তার চর্চা। তাহলেই মানুষ সত্যিকারের মানুষ হতে পারবে।

আমি আলোচনা শুরু করেছিলাম সমকালীন দর্শন ও অধিবিদ্যাকে নিয়ে। আর এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান সময়কালে অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে উত্থাপিত আক্রমন বিশেষত যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের আপত্তির পর্যালোচনা। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছি। প্রকৃতপক্ষে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ বিচ্ছিন্ন কোনো দার্শনিক তত্ত্ব নয়,বরং দুই হাজার বছরের জড়বাদী দার্শনিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জড়বাদী দর্শন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ও নাম নিয়ে ইতিহাসে আবির্ভূত হয়েছে।

অভিজ্ঞতাবাদ,সংশয়বাদ,অজ্ঞেয়বাদ,বিবর্তনবাদ,দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ,অস্তিত্ববাদ,রূপবাদ,প্রত্যক্ষবাদ, উত্তর-আধুনিকতা, কিংবা বিশ্লেষণী দর্শন-এসবের আবির্ভাব মূলত বিশ্বজগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের জড়ীয় ব্যাখ্যা দানের জন্যে যেখানে মনে করা হয়,এ জগতের পেছনে ভাববাদী চিন্তা তথা মন বা আত্মা কিংবা আধ্যাত্মিক সত্তার কোনো ভূমিকা নেই। এরই ধারাবাহিকতায় যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের আগমন ঘটেছে। ভাববাদ ও অধিবিদ্যা বর্জনের কঠোর প্রচেষ্টার বিপরীতে অধিবিদ্যার পক্ষে আমি এখানে কিছু যুক্তি উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

সমকালীন দর্শনের বিভিন্ন ধারা ও অধিবিদ্যার মাঝে এখানে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এরিস্টটল অনুসারে অধিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় পরম সত্তা ও আদি কারণ। দর্শনের প্রাচীন ও মধ্যযুগ পর্যন্ত এর পরিবর্তন হয় নি। আধুনিক যুগে ডেকার্ট,লাইবনিজ,বার্কলি প্রমুখের চেষ্টায় এতে আলোচ্য বিষয় হিসেবে আরো যুক্ত হয়েছে দেহ ও মনের সম্পর্ক,আত্মার অমরতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতা। সমকালীন যুগে এর আওতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন দেশ কালের সমস্যা,পদার্থের মূল উপাদান সংক্রান্ত সমস্যা (problems of material constitution) ও নিশ্চিত বচন সংক্রান্ত সমস্যা (problems of modality)। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানসমুদ্রের যেসব বিষয়ের মীমাংসা ও ব্যাখ্যা করা কোনোভাবেই সম্ভব হয় না সে সব বিষয় নিয়েই অধিবিদ্যার আলোচনা। তাই ভবিষ্যতে অধিবিদ্যার পরিধি আরো বাড়তে পারে। কিন্তু এ কথা ঠিক এসব বিষয়ের ব্যাখ্যায় আমরা যদি একজন পরম সত্তার ধারণা নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমরা একটা সমাধানে পৌঁছতে পারি। এই পরম সত্তাকেই সাধারণ মানুষ ঈশ্বর বলে ডাকেন। তাই এক কথায় বলা যায় অধিবিদ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ঈশ্বর। কেউ ঈশ্বরকে অবরোহ প্রক্রিয়ায় আগেই স্বীকার করে অ-সমাধানযোগ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা দেন আবার কেউ আরোহ প্রক্রিয়ায় অ-সমাধানযোগ্য বিষয়ের ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরের কাছে যান। এজন্যই আমি অভিসন্দর্ভের শেষ পর্যায়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে অধিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তাকে পুনরায় ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছি।

********** সমাপ্ত **********

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. বার্ট্রান্ড রাসেল, *বহির্জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান* (অনু. আব্দুল বারী) ঢাকা: বাংলা একাডেমি ১৯৭৮, পৃ. ১১

২. বার্ট্রান্ড রাসেল,*রহস্যবাদ ও যুক্তিবিদ্যা এবং অন্যান্য প্রবন্ধ* (অনু. আবু সাঈদ মিঞা) ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭, পৃ. ২০৩-২০৫

৩. Hume. D. , *Dialogues Concerning Natural Religion and the Posthumous Essays,* (ed. Pichard H. Popkin), Cambridge: Hackett Publishing Company, p . 89

4. *Ibid,* p. XIV

৫. বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস* (অনু. প্রদীপ রায়) ঢাকা, (প্রাচীন ক্যাথলিক দর্শন) পৃ: ২২৭

৬. John Losee, *A Historical Introduction to the Philosophy of Science*,4th edition,Oxford University Press,2001,p.76

৭. জ্যাঁ পল সাত্রে, *অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদ* (অনু. শরীফ হারুন) ঢাকা: বাংলা একাডেমি ১৯৯২, পৃ: ৫৪

৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪

৯. Jacob Gabriel Hale, *Derrida, Van Til and the Metaphysics of Postmodernism*, in www.reformedperspectives.org.

১০. Delanty, *Modernity and Postmodernity*, London: SAGE Publication, 2000, p.140.

১১. আমিনুল ইসলাম, *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন, ঢাকা*, ১৯৮২, পৃ. ২৪০

১২. পিটার সিঙ্গার, *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা* (অনু: প্রদীপ রায়) ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২০৮

১৩. *প্রাগুক্ত*, প. ২১১

১৪. আমিনুল ইসলাম, *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন, ঢাকা*, ১৯৮২, পৃ. ৪২৮

১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৮

১৬. Russell. B., *Am I an Atheist or an Agnostic*? (1947) www.positiveatheism.org

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি (ইংরেজি)

1. Ayer, A.J. : *Language Truth and Logic*, London:Penguin Books Ltd. 1971

2. Abdul Jalil Mia : *A Contemporary Philosophy of Religion*, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1982.

3. Ayer, A.J. (ed.) : *Logical Positivism*, New York: The Free Press, 1966.

4. Bradley, F. H. : *Appearance and Reality (A Metaphysical Essay)*, London:George Allen & Unwin Ltd. 1961, 6th Impression.

5. Bergson, H. : *Creative Evolution*, London: Macmillan & co. Ltd. 1922, (tr. Arthur Mitchell).

6. ____________________ : *The Two Sources of Morality and Religion*, London: Macmillan and Co.1935

7.____________________ : *An Introduction to Metaphysics* in http://archive.org/details/anintroductiont00berg goog

6. D.A.Drennen, (ed.) : *A Modern Introduction to Metaphysical Reading and Contemporary Sources,*London:George Allen & Unwin Ltd, ,1950

7. Eddington, A.E: : *The Nature of The Physical World*, New york:The macmillan Company,1929

8. Edwards, P. (ed.) : *The Encyclopedia of Philosophy* (Vol-5), New York: MacMillan,1967.

9.Fredrick Copleston, S.J. : *A History of Philosphy* (voll-iii)Maryland:The Newman press,1953

10. Harry,J.Gensler,(ed.) : *Ethics, Contemporary Readings*, London: Routledge, 2004.

11. Hirschberger, J. : *The History of Philosophy*, Vol.1.tr. RT.Rev. Anthony N. Furest, Germany, 1958.

12. James,William, : *Pragmatism: A New Name for an Old Way of Thinking* in www.gutenberg.org/ebooks/5116.

13. James,William :*The Meaning Of Truth* in www.gutenberg.org/ebooks/5117.

14. Lewis, H.D. : *Our Experience of God*, London: George Allen & Unwin Ltd, 1959.

15. ____________________ : *The Elusive Mind*, http://www.giffordlectures.org/bruyarp

16. Mc Taggart, J. : *The Nature of Existence*,Vol.-1,London:Cambridge University Press, 1921.

17. Morgan. C.L., : *Emergent Evolution*, London: Williams and Norgaie, 1927

18. Pears, D. F. (ed.) : *The Nature of Metaphysics*, London: Macmillan, 1957.

19. Ramsey I. A. N.(ed.) : *Prospect for Metaphysic*, London: George Allen & Unwin Ltd. 1961.

20. Ruhul Amin, M. : *Science, Philosophy and Religion*, Dhaka: Islamic Foundation, 1979.

21. Rashdall, H. : *The Metaphysics of Mr. F.H. Bradley*, London:The British Academy, 1912.

22. Russell, B. : *History of Western Philosophy*, 2nd Impression, London: George Allen & Unwin Ltd.1947.

19.________________ : *An Outline of Philosophy*, London: Routledge,1927/1996

20. Ryle, Gilbert :*The Concept of Mind*, London:Hutchinson's University Library,1959.

6. St. Thomas Aquinas : *Summa Contra Gentiles*, (tr. Anton C. Pegis), http://dhspriory.org/thomas/contragentiles.

7. ____________________ : *Summa Theologica*. In http://dhspriory.org/thomas/summa/.

21. Taylor, A. E. : *Elements of Metaphysics*, (2nd edition) New York:Macmillan, 1909.

22. Weber, A. : *History of Philosophy*, (tr. F. Thilly), New York: 1905.

23. Weinberg, J.R. : *An Examination of Logical Positivism*. New York:Harcourt, Brace and Company,1936.

26. Wittgenstein, L. : *Tractatus Logico- Philosophicus*, trn. D.F. Pears & B.F. McGuinness, London, New York: Rout ledge, Classics, 1922.

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জিঃ বাংলা

১. আব্দুর রহীম : ইসলামের ইতিহাস দর্শন, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩।

২. আমিনুল ইসলাম : আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৮০।

৩. --------------- : সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৮২।

৪. উইল ডুরান্ট : দর্শনের ইতিকাহিনী (অনু. আবুল ফজল) ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৮০।

৫. এপি জে আব্দুল কালাম : উইংস অব ফায়ার (অনু. শেখ সেলিম) ঢাকাঃ তাজিন বাইঘর ২০০৩।

৬. এরিস্টটলের অধিবিদ্যা :(অনু. আব্দুল জলিল মিয়া) ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮।

৭. *গালিব আহসান খান* *: বিজ্ঞানের দর্শন, ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০২।*

৮. জর্জ বার্কলি : মানুষের জ্ঞানসূত্র, (অনু. ড. আব্দুল মতীন) ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪।

৯. জন স্টুয়ার্ট মিল : উপযোগবাদ, (অনু. হাসনা বেগম) ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮।

১০. জেরোম এ. শেফার : মনোদর্শন, (অনু. মুহম্মদ জহুরুল হক) ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩।

১১. জ্যাঁ পল সার্ত্রে : অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদ (অনু.শরীফ হারুন) ঢাকাঃবাংলাএকাডেমি, ১৯৯২।

১২. পিটার সিঙ্গার :ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা (অনু.ড.প্রদীপ কুমার রায়) *ঢাকাঃবাংলা একাডেমি, ১৯৯৬।*

১৩. বার্ট্রান্ড রাসেল : বহির্জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান, (অনু. মুহম্মদ আব্দুল বারী) ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৭৮।

১৪. -------------- : রহস্যবাদ ও যুক্তিবিদ্যা এবং অন্যান্য প্রবন্ধ, (অনু. আবু সাঈদ মিঞা),ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি,১৯৭৭

১৫. -------------- : পাশ্চাত্য দশর্নের ইতিহাস, (প্রাচীন ও ক্যাথলিক দর্শন) (অনুঃ ড. প্রদীপ রায়), ঢাকাঃ নিউ এজ পাবলিকেশন, ১৯৯৮।

১৬. মার্কস-এঙ্গেলস : কমিউনিস্ট পার্টির ইশতিহার, কলকাতাঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৮৪৮/অনুঃ ২০০২।

১৭. মুহম্মদ ইকবাল : *ইসলামের ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন, (সম্পাদনায় ইবরাহীম খাঁ)* ঢাকাঃ আল্লামা ইকবাল সংসদ, ২০০৫, (পঞ্চম প্রকাশ)।

১৮. স্টিফেন ডবু হকিং : কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, (অনু. শত্রুজিৎদাস গুপ্ত) কলিকাতাঃ বাউলমন প্রকাশন, ১৯৯৩।

১৯. সৈয়দ কমরুদ্দীন হোসেইন : কান্টের দর্শন, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৮৬।

২০. হারুন রশীদ : মার্কসীয় দর্শন, ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭।

২১. হাসনা বেগম : মূওরের নীতিতত্ত্ব, (অনুঃ কালী প্রসন্ন দাস) ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

Online Sources

1. http://www.phorrigan.fcpages.com/metaphysics2and3.htm
2. http://Plato. Stanford.edu/entries/Aquinas
3. http://www.giffordlectures.org/bruyarp
4. http://www.routledge Internet Encyclopedia of Philosophy
5. http:// www.muslimphilosophy.com
6. http://wbo.llgc.org.uk/H.D. Lewis
7. http://philpapers.org/
8. http://www.iep.utm.edu/logicalpositivism
9. http://*www.encyclopedia.unbelief*
10. http:// www.britannica.com/Herbert-spencer.
11. http://www.peirce.org/ *How to Make Our Ideas Clear*
12. http://www.positiveatheism.org
13. http://www.users.drew.edu/~jlenz/whynot.html
14. http://www.reformedperspectives.org.
15. http://www.luminary.us.russell